প্রান্তরের গান

নবেন্দু ঘোষ

মডার্ন পাবলিশার্স

প্রকাশক

শরৎ দাস

মডার্ণ পাবলিশার্স

৬, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা।

মুদ্রাকর

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ

শ্রীলক্ষ্মী প্রেস

৮১, সিমলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা

প্রচ্ছদ পট

মণীন্দ্র মিত্র

ব্লক নির্ম্মাণ ও মুদ্রণ

ইণ্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং লিঃ কোং

২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

কার্ত্তিক, ১৩৫৩

দাম—চার টাকা

ভূমিকা

এই উপন্যাসের পিছনে একটা ছোট ইতিহাস আছে। ভেবেছিলাম যে ইংরাজী ১৯৩৯ সালের প্রথম থেকে শুরু করে ১৯৪৩ সালের শেষভাগ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে তথা বাংলাদেশে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল তাকে পটভূমি করে একটি উপন্যাস রচনা করব। ঠিক করেছিলাম যে উপন্যাসটিকে দুইখণ্ডে সমাপ্ত করব—প্রথম খণ্ডে থাকবে ১৯৩৯ সাল থেকে আগষ্ট আন্দোলন পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে তৎপরবর্ত্তী সময় বা ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত-র এই দুই খণ্ড 'রাত্রির তপস্যা' ১ম ও ২য় খণ্ড নামে বেরোবে। কিন্তু ঐ নামে অন্যত্র আর একটি উপন্যাস বেরোচ্ছে দেখে বাধ্য হয়ে আমায় নাম পরিবর্ত্তন করতে হল এবং পূর্ব্বে যা স্থির করেছিলাম তার অদল বদল করতে হল। ১ম খণ্ড 'প্রান্তরের গান' নামে প্রকাশিত হল এবং ২য় খণ্ড 'ভস্মলিপি' নামে প্রকাশিত হবে। এই দুই খণ্ডে পরিবেশ ও চরিত্র এক থাকিলেও প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ—সুতরাং কোনো এক খণ্ড না পড়লেও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

এই গ্রন্থের প্রকাশ নানা কারণে বিলম্বিত হয়েছে। হয়ত আরো দেরী হত—তা না হওয়ার মূলে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে নবীন যুগের শক্তিশালী কথাশিল্পী ও বন্ধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বন্ধুবর অজিত মিত্র বহুলাংশে দায়ী। বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো'র রীতি বড় পুরোনো—তাই ও বিষয়ে নিরস্ত হচ্ছি। সর্ব্বশেষে একজনের উল্লেখ করতে হয়—যাঁর জন্য নানা দুর্বিপাকের মধ্যেও এই উপন্যাসকে লিখতে পেরেছি। তিনি আমার সহধর্ম্মিনী কনক ঘোষ।

কলিকাতা, ইতি—

১লা মাঘ, ১৩৫২

কনকলতাকে

প্রান্তরের গান

—— ০:*:০ ——

কোকিলের ডাক ভেসে এলো।

ফাল্গুনের অপরাহ্ণে দক্ষিণ বায়ুর বসন্ত রাগিণীর আলাপ এবার ক্ষীণ ও বিলম্বিত হয়ে এসেছে। ধলেশ্বরীর রূপালী জলে নেমেছে খানিকটা প্রশান্তি, মধ্যাহ্নে রৌদ্ররসে মত্ত হয়ে বাতাসের উদ্দামতার সঙ্গে তাল রেখে তার যে ভৈরবীর মত চেহারা হয়েছিল তার রূপান্তর ঘটেছে। মাতাল করিশুর মত তার বড় বড় ঢেউগুলি যেন কায়াবদল করে এক চঞ্চল মৃগশাবকের মত নিরীহ হয়ে উঠেছে আর একটানা কল্লোল-ধ্বনি তুলে অস্তোন্মুখ ফাল্গুনী সূর্য্যের স্বর্ণ আলোক-মদিরা পান করে, নবযৌবনা রূপসীর মত সে যেন এবার অভিসারে চলেছে।

নিমতলার হাটে বিশ মণ দুধসর ধান বিক্রী করে হরিচরণ দাসের ছেলে নন্দলাল নিজেদের নৌকোয় চড়ে বাড়ী ফিরছিল। হঠাৎ টাকার দরকার পড়েছিল, কলাতিয়ার হাটবার রবিবার তাই নন্দকে যেতে হয়েছিল নিমতলা—না তো বরাবরই গাঁয়ের হাটেই ধান বিক্রী করে [illegible] হাটই এ তল্লাটে সবচেয়ে বড়। স্রোতের মুখে [illegible] ছেড়ে দিয়ে বৈঠা ধরে চুপ করে বসেছিল নন্দলাল। তন্ময়

করে বয়ে চলেছে নৌকো, তায় আবার পাল তুলে দিয়েছে [illegible] দক্ষিণের বাতাসে সাদা রংয়ের পালটা ফুলে উঠে থরথর করে কাঁপছে—যেন উড়ন্ত বুনোহাঁসের দুরন্ত ডানা। খুশীমনে চুপ্ করে বসে আছে নন্দলাল, আর অনুভব করছে কেমন করে তার নৌকোটা জ্যামুক্ত তীরের মত সব কিছুকে পেছনে ফেলে সজোরে ছুটে চলেছে। আরামে চোখ বুজে আসে তার।

কু-হু।

অনেক দূর থেকে ভেসে এল কোকিলের ডাক।

নন্দলাল সচকিত হয়ে নড়ে উঠল। বসন্ত এসেছে। [illegible] রঙীন বাসনার আবেশে থরথর করে কাঁপছে সব কিছু। সাদা পালটা কাঁপছে, নৌকোটা কাঁপছে। নদীর জল কাঁপছে, গন্ধমাদ [illegible] দক্ষিণ বায়ু কাঁপছে, অনন্ত অম্বর-পথের দিক্‌ভ্রান্ত রঙীন মেঘেরা কাঁপছে। নদীতীরের বৃক্ষলতার মর্মর-মুখরিত নব-পল্লবের মত নন্দলালের হৃদয়টাও থরথর করে কেঁপে উঠলো। কি যেন চায় তার পঁচিশ বৎসরের যৌবন। বসন্তের বেণুরবে অনেক অ-নে-ক দূরে চলে যায় তার মন। ধলেশ্বরীর জল যেখানে দিগন্তে একাকার হয়ে গেছে তারও অনেক পরে, অনন্ত আকাশের নীল শূন্যতারও পরে, মর্ত্ত্যের সমস্ত নাগালের বাইরে কোথায় যেন উৎসব চলেছে। নৃত্যরত [illegible] কন্যাদের তনুদেহের বিভ্রমে সেখানকার বাতাস যেন [illegible]—মৃদঙ্গের তালে তালে, তাদের আসবাবিষ্ট পদক্ষেপে, [illegible] দিক্‌দিগন্তরে। অনন্ত যৌবনের সুবিপুল বন্যায় সেখানেও সব যেন কাঁপছে। নন্দলাল যেন দেখতে পাচ্ছে সেই সব দিব্যাঙ্গনাদের [illegible] [illegible] খসে পড়েছে, কটিতটের বসন গিয়েছে খুলে—[illegible] [illegible] মোহময় স্মৃতি নিয়ে, তাদের দেহসৌরভ [illegible]

ছড়াতে ছড়াতে এই বাতাস যেন ছুটে আসছে সেই অনেক দূরের অমর্ত্যলোক থেকে। নন্দলালের সুন্দর চোখে স্বপ্ন ঘনায়।

"এ্যাই নন্দ"—

নন্দ চম্‌কে উঠ্‌লো। তাদের গ্রামের অর্জ্জুন আর ছিদেম চলেছে উজান বেয়ে।

"কি রে?" নন্দ উত্তর দিল।

"কত করে ধান গেল রে আজ?" অর্জ্জুন প্রশ্ন করল।

"এক টাকা দশ আনা করে—"

"ও:—"

"হাট করেছিস নাকি কিছু?"

"হ্যাঁ—তিন জোড়া শাড়ী কিনলাম বাড়ীর জন্যে—"

"কত করে জোড়া পড়ল রে?" ছিদেম জিজ্ঞেস করল।

"আড়াই টাকা করে—হ্যাঁরে, তোরা যাচ্ছিস কোথায়?"

"যাচ্ছি সোনাপুর—"

"কেন?"—

উত্তরে ছিদেম কি বলল তা আর বোঝা গেল না, ওদের নৌকো তখন অনেক পেছনে পড়ে গেছে।

তেতুলখোরা গ্রামের পাশ দিয়ে নন্দলালের নৌকো চলল। এর পরেই তাদের কলাতিয়া।

গুণগুণ করে গান গাইছে নন্দ। পকেটের রঙীন রুমালটায় বাইশটা টাকা বাঁধা আছে, অস্তাচূড়াবলম্বী সূর্য্যের রঙীন আলোয় ধলেশ্বরীর জল এবার গলিত সোনার মত চিক্‌চিক্ করছে, ফুরফুর করে বইছে দক্ষিণের বাতাস আর তর্‌তর্ করে বয়ে যাচ্ছে তার নৌকো। এমন পারিপার্শ্বিকে নন্দলাল গান গাইবে না ত কে গাইবে? গ্রামের সুদর্শন যুবক সে,

কবিগানের, যাত্রাগানের আসরে তার গান শোনবার জন্য গ্রামান্তর থেকে লোকেরা ছুটে আসে, মুগ্ধ আনন্দে দুরুদুরু করে কত রূপসীদের বুক—সে কি কেউ জানে না ? নন্দ গান গাইবে বৈকি।

এমনি সময় হঠাৎ অঘটন ঘটলো। মীনকেতনের অদৃশ্য শায়ক এসে নন্দলালের বুকে বিদ্ধ হল।

নদীর ধারে এক জায়গায় আম, জাম, আর মান্দার গাছের ঘন জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে একটা সরু পথ নেমে এসে জল পর্য্যন্ত পৌঁছেচে। সেইখানে, দুটো নারকেল গাছের গুঁড়ি ফেলে একটা ঘাট তৈরী হয়েছে. তার গায়ে জমেছে শ্যাওলার ঘন আস্তরণ। ওপরের সেই পথ বেয়ে একটি মেয়ে এল। তার কাঁখে রয়েছে কলসী। সে এসে দাঁড়াল সেই ঘাটের কিনারায়।

নন্দ মেয়েটিকে দেখল। তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুহূর্ত্তে তার মাথায় চড়ে গেল আর অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তার হৃদপিণ্ডটা করতে লাগল ধুক্-ধুক্ ধুক্-ধুক্। নন্দ প্রেমে পড়ল।

মেয়েটির বয়স বোধ হয় সতের হবে। খানিক আগেই নন্দলালের মানস চক্ষে যে সব অপ্সর-কন্যাদের লীলায়িত দেহ জেগে উঠেছিল তাদেরই মত রোমাঞ্চকর যেন মেয়েটির রূপ। সে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট নব-মালতীর লতা। দেহে তার উৎফুল্ল যৌবনরাশি জোয়ারের জলের মত টলমল করছে। তার ভ্রমর-কৃষ্ণ চোখ,খাড়া নাক, কচি কিশলয়ের মত সুকোমল অধরোষ্ঠ, পূর্ণ-প্রস্ফুটিত বক্ষ-পদ্মযুগল, মৃণালের মত বাহুদ্বয় আর আলতা-রাঙানো পা—মেয়েটির সব কিছুই নন্দর কাছে অপরূপ মনে হল।

নন্দ দুঃসাহসী হয়ে উঠলো। কি ভেবে হঠাৎ সে ঘাটের কিনারায় নৌকো ভিড়াল। লগিটা পাঁকে পুতে দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে, পালের দড়িটা খুলে লাফ দিয়ে সে তীরে নাম্‌ল।

প্রান্তরের গান

মেয়েটি একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। কলসী দিয়ে জল পরিষ্কার করে নিয়ে তাতে সে জল ভরল। সেই কলসী কাঁখে তুলতে তুলতে হঠাৎ কি ভেবে সে আবার নন্দ'র মুখের দিকে তাকাল। তার চোখে কৌতূহল।

নন্দ একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মেয়েটি হঠাৎ যেন লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি সে ঘাটের ঢালু জমিটা পার হল, ওপরে উঠে ডান দিকের রাস্তা ধরল।

নন্দ মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেও তাড়াতাড়ি মেয়েটির পেছনে পেছনে চলতে লাগল সংকীর্ণ পথটাকে ধরে। পথের দুপাশে স্থানে স্থানে থলো থলো ভাঁট ফুলের বাহার—তাদের তীব্র গন্ধে বাতাস ভারী হ'য়ে উঠেছে। পায়ের নীচে ঝরা পাতার রাশি মর্ম্মর-ধ্বনি তুলল।

মাত্র হাত দশেকের তফাৎ। মেয়েটির বেণী নেমেছে কোমর ছাড়িয়ে। কালো রাতের মত কালো তার অজস্র চুল।

মেয়েটি পেছনের দিকে তাকাল। নন্দকে সে দেখ্‌তে পেল। বিদ্যুতের মত তার ভ্রূ দুটো একবার কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই আবার সে চলতে লাগল। এবার একটু তাড়াতাড়ি।

নন্দও চলার বেগ বাড়ালো। একটা অব্যক্ত উত্তেজনায় তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

মেয়েটি আবার পেছন ফিরে তাকাল। চোখে মুখে তার এবার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। চোখের তারা দুটো [illegible]র মত জ্বলজ্বল্ করছে। সে এবার থমকে দাঁড়াল।

নন্দলালও দাঁড়াল।

মেয়েটি কথা বলল, "তুমি আমার পেছু নিয়েছ কেন বলতো ?" তার কণ্ঠে রোষ কিন্তু তবুও কি মিষ্টি মেয়েটার গলা ! বসন্তের কোকিলও যেন হার মানবে।

নন্দলাল হাসল, "কই—না তো—পেছু নেব কেন ?"

"নিয়েছই ত'—তখন থেকে আমার পেছু নিয়েছ। আমায় দেখে ঘাটে নৌকো ভিড়োলে—সেই ঘাট থেকে আমার পেছন পেছন আসছ—কেন ?"

"বাঃ রে—তুমি ত অদ্ভুত মেয়ে! আমি যাচ্ছি আমার কাজে"—

"কাজে—কি কাজে ?"

"তা বল্‌ব কেন ?

"কার কাছে যাচ্ছ তুমি শুনি ?—"

"কার কাছে ?—কেন—ইয়ে—কালু সার কাছে—"

মেয়েটি রুখে উঠল, "মিথ্যেবাদী কোথাকার—এ গাঁয়ে কালু সা বলে কেউ নেই—"

"নেই! বাঃ রে—"

"খবরদার"—মেয়েটি তাকে বাধা দিয়ে শাসিয়ে বলল—"আমার পেছন পেছন আর আসবে না কিন্তু—"

নন্দলালের নেশা ধরেছে। নেশা না তো ভূত।

সেও রুখে বলল—"নিশ্চয়ই আসব—কেন আসব না ? একি তোমার কেনা সড়ক নাকি ? আমি তোমার কি মন্দটা করেছি শুনি—আমি তোমায় ডাকাতী করছি নাকি ?"

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—"তাই ত' মনে হচ্ছে—সেই তখন থেকে যেরকম ড্যাব্‌ড্যাব্ করে চেয়ে আছ—বদ্‌মায়েসের মত—বাপ রে!"

নন্দলাল আবার হাসল, "গাল দিচ্ছ!"

মেয়েটি মাথা নাড়ল—"দেবই ত।"

"বেশ দাও তুমি গাল—আমিও এই আসছি—"

"এস না—দেখাচ্ছি মজা"—বলিয়া মেয়েটি এবার দ্রুতপদে চলতে

আরম্ভ করল। তার দ্রুতগতিতে ভরা কলসী থেকে জল উপ্‌চে উপ্‌চে মাটীতে পড়তে লাগল।

নন্দলাল পেছনে পেছনে চলতে চলতে একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কি গা ?"

"বলব না"—মেয়েটি ফোঁস করে উঠল।

"না বললে—আচ্ছা তোমার বাপের নামটাই বল না শুনি—

"বলব না।—ফের তুমি আমার পেছু নিয়েছ যে ?"

"এই যে আসতে বল্লে—"

"আমি কোথায় বল্লাম !"

"বল্লে না যে কি মজা দেখাবে ?"

মেয়েটি এবার রাগের চোটে ফেটে পড়ল, "মজা দেখাবই তো—পাজী, ছুঁচো, বদমায়েস—"

নন্দ কপট রোষ দেখিয়ে বলল—"এই—গাল দিও না কিন্তু—"

মেয়েটির চোখ মুখ দিয়ে রক্ত যেন ফেটে বেরুচ্ছে, সুন্দর নাকটা ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে, ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে—"দেবই তো। তোমায় আমি চিনি না ভেবেছ ?"

"তুমি আমায় চেন ?"—সোল্লাসে নন্দ প্রশ্ন করল।

"চিনিই তো—কলাতিয়ার হরিচরণ দাসের বকাটে ছেলে তুমি—দিন-রাত্তির খালি কবিগান আর যাত্রাগান করে বেড়াও"—

"আমায় তুমি চেন ! তুমি আমার গান শুনেছ ?" আনন্দে নন্দর হৃদ্‌পিণ্ডটা গলার কাছে যেন ঠেলে উঠেছে।

মেয়েটি ঠোঁট উল্টে বলল—"ইল্লো—যে ষাড়ের মত হেঁড়ে গলা—তার আবার গান শুনতে যাব—"

নন্দ হো হো করে হেসে উঠল।

মেয়েটি তার হাসিতে আরও জ্বলে উঠল—"আবার হাসি হচ্ছে? দাঁড়াও না, বলে দিচ্ছি সব বাড়ীতে গিয়ে—"

"কি বলবে?"

"যা বলবার বলব, সে পরে টের পাবে। খবরদার, আমার পেছনে পেছনে এসো না তুমি—"

"আমার খুশী আসব"—নন্দ বেপরোয়া হয়ে বলল। যতই মেয়েটিকে সে দেখছে ততই যেন সে মুগ্ধতার গভীরতায় তলিয়ে যাচ্ছে—ততই যেন সে দুঃসাহসী হয়ে উঠছে। দুরন্ত যৌবনের অশান্ত আত্মার আমন্ত্রণ-লিপি দুপাশের গাছপালায় ছড়ানো রয়েছে। আগের দিন রাত্রে একটু বৃষ্টি পড়েছিল—জলে ধোওয়া আমের মঞ্জরীগুলো তাই ঝক্‌ঝক্ করছে। কোথায় একটা বাতাবী লেবুর গাছে হয়ত অজস্র ফুল ফুটেছে—তারই উগ্র গন্ধ আমের মুকুল আর ভাঁটফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এই রূপসী মেয়েটির রূপমুগ্ধ নন্দলালের চেতনাকে অবশ করে তোলে।

মেয়েটি চীৎকার করে উঠল—"আমি চেঁচাব কিন্তু আসলে পর—"

নন্দলাল মৃদু মৃদু হাসতে লাগল—"চেঁচাও—"

হঠাৎ মেয়েটি অসহ্য ক্রোধে ভেঙ্গে পড়ে কাঁখের কলসীটাকে ধপ্ করে মাটীতে আছড়ে ভেঙ্গে ফেলল।

"আহা-হা কি করলে?"—নন্দ হেসেই যেতে লাগল।

মেয়েটির চোখ রাগে সজল হয়ে উঠেছে—"নচ্ছার, ড্যাক্‌রা, হনুমান কোথাকার—" মেয়েটি আবার চলতে আরম্ভ করল।

নন্দ একটু গম্ভীর হয়ে বলল—"তুমি দেখতে সুন্দর কিন্তু রাগলে তোমায় আরও সুন্দর দেখায়—"

"উঃ মাগো"—মেয়েটি এবার ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। মুহূর্ত্তে সে বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে বেত ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

নন্দ এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। মেয়েটি কে তা ত' জানা হল না। সেও তাড়াতাতাড়ি সেইদিকে পা বাড়াল। মেয়েটি কে তা জানতেই হবে—না জানলে নন্দলালের দিনরাত্রি যে সুধু দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত মরুভূমি হয়ে উঠবে।

সেই বাঁ দিকের রাস্তাতে একজন বুড়ীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

বুড়ী বিড়বিড় করে বল্‌তে বল্‌তে আসছিল—"কি হল আবার ছুঁড়ীটার। অমন দৌড়াচ্ছিল কেন?"

নন্দ থমকে দাঁড়াল—"ও ঠান্‌দি—শুনছ?"

"এ্যা"—বুড়ী দৃষ্টি প্রসারিত করে কুঞ্চিত ললাটকে আরও কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করল—"কি বলছ গা?"

"ঐ মেয়েটির কি হয়েছে গো—ঐ যে দৌড়ে গেল?"—

"কি জানি বাপু—আমিও ত' তাই ভাবছি—জিজ্ঞেস করনু—জবাবই দিলে না—"

"মেয়েটি যেন চেনা চেনা মনে হল—কে ঠান্‌দি?"

বুড়ী একটু সন্দেহের চোখে নন্দলালকে নিরীক্ষণ করল, পরে বলল, "ওর নাম কাজললতা—গৌরদাসের মেয়ে।"

"ওঃ"—এমনভাবে নন্দ কথাটা উচ্চারণ করল যেন বুড়ীর কথায় সে একটি পরম রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে।

নন্দ চলতে আরম্ভ করেছিল এমন সময়ে সেই বুড়ী তাকে ডাকল, "হ্যাঁ বাছা, ইদিকে একটা ছাগল দেখেছ—সাদা রঙের?"

"ছাগল?"—নন্দ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ—সাদা রঙের—"

"না ঠান্‌দি"—নন্দ পালাতে পারলে বাঁচে, ওর মন পড়ে রয়েছে সেই মেয়েটির গমন-পথের দিকে, ছাগলের কথা কি ওর ভাল লাগে।

প্রান্তরের গাম

"কোথায় গেল তবে?", বুড়ী বিড়বিড় করে আপন মনে, পরে হাঁক ছাড়ে—"ফুরকুনী—ও ফুরকুনী—"

ফুরকুনী বুড়ীর ছাগলের নাম।

নন্দ একটু হেসে তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করল। কোথায় গেল মেয়েটা? কাজললতা? নামটা ত' ভারী মিষ্টি। লতাই বটে। অজস্র পুষ্পশোভিত অপরূপ লতা।

খানিকদূর গিয়েই চার পাঁচটা বাড়ী। এর মধ্যে কোন্‌টা কাজললতাদের বাড়ী? মহামুস্কিলে পড়ল নন্দ। কাউকে জিজ্ঞেস করাটা সে যুক্তিসঙ্গত মনে করল না। রাস্তাটা ধরে সে এগিয়েই চলল, পরে শেষের বাড়ীটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ কেন যেন তার মনে হল যে এইটেই গৌরদাসের বাড়ী। গৌরদাসের নাম তার অপরিচিত নয়; সে তাদের স্বজাতি। বাপের মুখে সে শুনেছে যে গৌরদাসের পিতৃ-পুরুষেরা খুব অবস্থাপন্ন লোক ছিল। বর্ত্তমানে সে অবস্থা আর নেই—পাঁচটা লাঙ্গল এসে ঠেকেছে একটায়। এই বাড়ীটাকে দেখে নন্দ নিজের অনুমানের স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পায়। বাড়ীটা ভগ্নদশায় এসে পৌঁছেচে। চণ্ডীমণ্ডপ ও একটা ঘর একেবারে ঝুলে পড়েছে—শুধু মাঝে একটা অংশ টিনের চালা দিয়ে তৈরী। তাতেও অনেক দিন ধরে যে সংস্কার হয়নি তা বেশ বোঝা যায়। বাড়ীটার প্রাঙ্গন আগাছায় ভরে উঠেছে, পেছনে বেতবন, আর বাঁশঝাড়। বেড়াচিতা দিয়ে সামনের দিকটা ঘেরাও করা, তা পেরোলেই একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তার অজস্র রক্তবর্ণ ফুলের সমারোহে আশেপাশের সব কিছুই যেন রক্তিম হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ সামনের দাওয়ার উপরে কে যেন দাঁড়াল। তার পায়ের আওয়াজ নন্দ শুনতে পেল। সে একটু সামনের দিকে এগিয়ে এসে

থমকে দাঁড়াল। নূতন একটা মহাদেশকে যেন আবিষ্কার করেছে নন্দ, আনন্দে তার চোখের তারা দুটো খঞ্জনপাখীর চোখের মত নেচে উঠল। দাওয়ার উপরে যে এসে দাঁড়িয়েছে সে আর কেউ নয়, কাজললতা— কলাতিয়ার নন্দলাল দাসের জন্ম-জন্মান্তরের হারিয়ে যাওয়া প্রেয়সী। দৃঢ়সঙ্কল্পে নন্দর চোখমুখ যেন থমথম করতে লাগল। জয় করতে হবে এই রূপসীকে। এই রাজকন্যার মত রূপসীকে। ছেলেবেলায় শোনা কাঞ্চনমালা আর মধুমালার মত অপরূপ সুন্দরী এই কাজললতাকে তাকে জয় করতেই হবে।

কাজললতা নন্দকে দেখতে পায়নি। দাওয়ার এককোণে একরাশ জঞ্জাল, সেখানে দাঁড়িয়ে কি যেন সে খুঁজছিল।

নন্দ কম্পিতবক্ষে, মৃদুকণ্ঠে সুর করে গাইল—

"হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি,
তাহার অধিক হিম কন্যে, তোমার বুকের ছাতি॥"

ভারী মিষ্টি গলা নন্দলালের।

চমকে উঠে কাজললতা ঘুরে দাঁড়াল, তার চোখে বিস্ময়।

নন্দলাল মৃদু হেসে বলল, "তোমায় খুঁজে বের করেছি কিন্তু"—

হঠাৎ কাজলের চোখের বিস্ময় অন্তর্হিত হল, ঘনিয়ে এল রোষ আর একটা অনর্থের সংকেত, চোখ ঘুরিয়ে সে বলল—"বেশ করেছ, এখন দাঁড়াও দিকি ওখানে, আমি বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি। দেখতে চেয়েছিলে, মনে আছে ত?"

দ্রুতপদে সে ভিতরে চলে গেল।

নন্দ এতক্ষণে ভয় পেল। সত্যি যদি কাজল তার বাপকে ডেকে নিয়ে আসে? এখন অবস্থা হীন হয়ে পড়লেও মানুষ হিসাবে গৌরদাস

লোকটা নাকি ভারী কড়া আর দেমাকী। শেষে কি অন্য গাঁয়ে এসে পরের হাতে মার খাবে সে। মা, আজ এই পর্য্যন্তই থাক।

নন্দ বড় বড় পা ফেলে চলতে আরম্ভ করল।

কিছুদূর গিয়ে কি ভেবে সে একবার পেছন ফিরে দাঁড়াল। সে যা দেখল তাতে তার মন আবার আনন্দে অধীর হয়ে উঠ্ল।

দরজার পাশে হেলান দিয়ে কাজললতা তার গমন-পথের দিকে চেয়ে আছে।

নন্দ একটু হেসে, হাত নেড়ে, সেখান থেকেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—"কাল আবার আসব, এমনি সময়ে"—

আকাশকে উদ্দেশ করে বললেও অভীষ্ট সিদ্ধ হল। কাজললতা তা শুনল, শুনে তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে দড়াম করে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আবছা অন্ধকারের ধুলো এসে গাছপালার পাতায় পাতায় যেন গাঢ় হয়ে জমে উঠ্ছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের ডাক আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চেনা অচেনা ফুলের গন্ধে দক্ষিণের বাতাস ভরপুর—তার ছোঁওয়ায় গাছপালা, লতাপাতা আর বাঁশের ঝাড় যেন গুঞ্জনধ্বনি তুলেছে। পায়ের নীচে শুকনো বাঁশপাতা আর অন্যান্য গাছের ঝরাপাতা মর্ম্মরধ্বনি তুলে বিলাপ করে ওঠে।

ঘাটে এসে নন্দ পাল তুলে নৌকা ছেড়ে দিল।

আকাশের রঙীন মেঘগুলোর এক টুকরো পুরাতন স্মৃতির মত ধীরে-ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পুব আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে। ধলেশ্বরীর জল আবার রূপোর পাতের মত চক্‌চক্‌ করছে।

বাঁকের মোড়ে তেতুলঝোরা গ্রাম মিলিয়ে গেল।

কাজললতা তার গান শুনেছে, সে তাকে চেনে! নন্দ ভাবে : তা সম্ভবপর বৈকি। তাদের গাঁয়ের কবির দল যখন লক্ষ্মীপূজোর সময় মালতীপুরের জমিদার বাড়ী গান গাইতে গিয়েছিল তখন আশেপাশের অনেক গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা সেখানে দল বেঁধে গিয়েছিল। কাজললতাও সে সময়ে গিয়েছিল। তেতুলঝোরা থেকে মালতীপুর ত' মাত্র ক্রোশ-খানিকের পথ।

আচ্ছা, কাজললতা তার বাপকে ডেকে আনল না কেন? দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, আসবার সময়ে আবার তাকে তাকিয়ে দেখলই বা কেন? কেন?

নন্দ হাসল। উত্তর সে পেয়েছে। নিজের অন্তর্দেবতার কাছ থেকে।

দু'একটা পাখীর কাকলি ভেসে এল তীর থেকে। ক্ষীণ শব্দ। ফুর-ফুর করে বইছে দক্ষিণের বাতাস। ধলেশ্বরীর রূপালী জলকে ভেদ করে তরতর করে বইছে নৌকোটা। উড়ন্ত বুনো হাঁসের দুরন্ত ডানার মত নৌকোর সাদা পালটা কাঁপছে আর বসন্তের মদির সন্ধ্যা চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে।

নন্দ একটা বিড়ি ধরিয়ে মৃদুকণ্ঠে গান ধরল, দৃষ্টি তার অনেক দূরে —অ-নে-ক দূরে—

"কুঁচবরণ কন্যারে তার মেঘবরণ কেশ
আমারে লইয়া যাওরে নদী
সেই সে কন্যার দ্যাশ—"

সেই কুঁচবরণ কন্যা মণিদ্যুতিময় স্ফটিকপ্রাসাদে বাস করে, নীলপদ্মের পালঙ্কে শয়ন করে, চন্দ্রকান্তমণির মুকুরে নিজের দুর্লভ ইন্দুমুখখানি দেখে। সেই কুঁচবরণ কন্যার সঙ্গে কাজললতার কোনো প্রভেদ নেই।

নন্দদের গ্রামের নাম কলাতিয়া। ধলেশ্বরী থেকে যে খালটা বুড়ীগঙ্গার মধ্যে গিয়ে পড়েছে তা এই গ্রামের মাঝখান দিয়ে গেছে। গ্রামের পুব দিকে বুড়ীগঙ্গা, পশ্চিমদিকে ধলেশ্বরী। খালটায় তাই সারা বছরই জল থাকে।

বাড়ীর ঘাটে পৌঁছে নন্দ নৌকোটাকে সবে একটা জাম গাছের সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধছে, এমনি সময়ে ছপ্ ছপ্ শব্দ করে চার দাঁড়ের একটা গয়নার নৌকো এসে ভিড়ল। সহরে, স্থলেতে যেমন বাস, ট্রাম, পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে, জলেতে তেমনি গয়নার নৌকো। রোজ দু'বার করে এই গয়নার নৌকো হাঁক দিয়ে যাত্রীদের ঢাকায় নিয়ে যায়। খালতীরবর্ত্তী ও বুড়ীগঙ্গার তীরস্থিত গ্রামের মধ্যে পৌঁছে দেয়। আবার রোজ একবার করে সকাল বেলায়, বুড়ীগঙ্গার যেখান থেকে মোটরলঞ্চ যাত্রা করে সাভার, মীরপুর আর ধামরাই গ্রামের দিকে, সেখানেও যাত্রীদের এই নৌকোই পৌঁছে দেয়।

গয়নার নৌকোতে চড়ে প্রায়ই নূতন নূতন লোকের আমদানী হয় এই গ্রামে। নন্দ তাই পালটা ভাঁজ করে কাঁধে ফেলে, বৈঠা হাতে কৌতূহলের সঙ্গে এই নৌকোর দিকে এগিয়ে গেল।

তিনজন যাত্রী এই ঘাটটায় নামল। দুজন মুসলমান, বোধ হয় তাঁতি। তৃতীয়জন একজন যুবক।

যুবকটির সঙ্গে বিশেষ কিছুই নাই কেবল হাতে একটি মাঝারি

আকারের চামড়ার স্যুটকেশ। খদ্দরধারী, শ্যামবর্ণ ও সুদর্শন যুবক, দোহারা গড়ন। বয়স বোধ হয় পঁচিশ ছাব্বিশ।

নন্দ তাকে চিনতে পারল। তাদের বাড়ীর সামনের তারিণী কাকার ছেলে প্রবীর চৌধুরী। ছোটবেলায় গাঁয়ের মাইনর স্কুলে ওরা দুজনে একসঙ্গে পড়ত। নন্দ ছোট বেলা থেকেই গানের ভক্ত। ইস্কুলের পড়ার চেয়ে কবি আর যাত্রার আসরে বসে থাকতেই নন্দর ভাল লাগত। তাই প্রবীর যখন প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকার কলেজে পড়তে গেল, নন্দ তখন সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা ক... লেখাপড়ার পাট সাঙ্গ করে দিয়ে বেশ ভাল করে গানের মওড়া সুরু করে দিল। অনেকদিন থেকেই প্রবীর সহরে থাকে। মাঝে মাঝে ছুটিতে বাড়ী আসে। কিছুদিন থেকে তারপর আবার ফিরে যায়। ছোট বেলা থেকেই ও স্বদেশী দলে যোগ দিয়েছে, ছুটির দিনে গাঁয়ে এসেও ও বসে থাকে না, জমিদারবাবুদের পাটের কলের মজুরদের সঙ্গে মেলামেশা করে, সভাসমিতি করে। পাশাপাশি বাড়ী তাই প্রবীরের সঙ্গে নন্দর বন্ধুত্ব আছে, তাদের বাড়ীর ভিতরেও তার আসাযাওয়া আছে। এবার প্রায় বছর খানিক পরে প্রবীর দেশে এল।

প্রবীর কোন দিকে তাকায়নি, সোজা সে দু'পাশের ঘন কচুবনের মধ্যবর্ত্তী রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। মাথার উপরে ... চাঁদের আলো এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, রাস্তা বেশ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

নন্দ প্রবীরের পেছনে গিয়ে ডাক দিল—"শুনছেন বাবুমশায়—ও বাবু"—প্রবীর ফিরে দাঁড়াল, হেসে বলল —"নন্দ !"

"হুঁ —কিন্তু একেবারে কোনদিকে না তাকিয়ে যে হন্ হন্ করে চলেছিস বড় ?"—

"আবার কোন্‌দিকে তাকাব? ক্ষিদে তেষ্টা দুই-ই পেয়েছে ভাই"—

"তা ত' পাবারই কথা। ঢাকা থেকে আসছিস বুঝি?"

"হ্যাঁ"—

"এখনও পড়ছিস, নয়? শুনলাম বি-এ পাশ করেছিস?"

"বি-এ পাশ করেছি বটে কিন্তু আর পড়ব না"—

"কেন রে? তারিণীকাকা বলছিলেন তুই নাকি আইন পড়বি?"

"বাবার যা ভাল মনে হয়েছে বলেছেন, আমার যা ভাল মনে হচ্ছে তাই করছি"—প্রবীর হাসল।

"কেন? আইন পড়া তো ভালই রে"—

"আইনের দিন থাকলে আইন পড়া যেত"—প্রবীর গম্ভীর মুখে বলল। নন্দ কথাটা ভাল করে বুঝল না, একটু চুপ করে থেকে বলল, "তাহলে এখন চাকরী-বাকরী করবি, না?"—

প্রবীর মাথা নাড়ল, "উহুঁ—চাকরী করার লোকের অভাব নেই দেশে"—

নন্দ ব্যাপারটা বুঝতে পারল, "দেশের সেবা করবি তাহলে, কিন্তু সংসার?"

প্রবীর হাসল, "সংসার মানে তো আমরা তিনটি প্রাণী, বাবা, পিসীমা আর আমি। বাবার যা জমিজমা অল্পবিস্তর আছে তাতে ওর আর পিসীমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে—আমার চিন্তা আমি করিনা, আর কারোরও কিছু নেই।"

নন্দর মনটা আজ ভারি হাল্কা মনে হচ্ছে, পাখীর পালকের মত হাল্কা। কাজললতার মুখটা জোনাকির মত বারংবার তার চোখের সামনে জ্বলে জ্বলে উঠছে।

"কেন, বিয়ে থা করবি নে ?"—নন্দ কৌতুকের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

প্রবীর খুব জোরে হেসে উঠল—"বিয়ে ! না বাবা—সোনার শেকলে আমার দরকার নেই, লোভও নেই—বেশ আছি আমি"—

নন্দ উত্তর দিল না, মনে মনে একটু হাসল শুধু। আচ্ছা, দেখা যাবে। কোনো এক ফাল্গুনী সন্ধ্যার বসন্তমদির রঙীন আলোতে যদি কাজললতার মত রূপসী মেয়েকে হঠাৎ প্রবীর আবিষ্কার করে আর প্রেমের দেবতার পুষ্পধনু থেকে নিক্ষিপ্ত একটা তীর এসে যদি তার বুককে রাঙিয়ে তোলে তখন এই প্রবীর চৌধুরী হয়ত সোনার শিকল পরার জন্যই বায়না ধরবে। আচ্ছা দেখা যাবে। কালচক্র ঘুরুক।

"নন্দ"—প্রবীর ডাকল।

"এ্যা ?"

"আচ্ছা—মিলের মজুরদের ওখানে আমাদের দলের এখন কে আছে জানিস ?"

"না ভাই, বলতে পারবো না—ওসব খোঁজ খবর বেশী রাখি না"—

প্রবীর হাসল—"তবে কিসের খোঁজ রাখিস ? কোথায় কোন্ পাড়ায় কবির গান হচ্ছে—কোথায় কি পালা যাত্রা হচ্ছে—এই সব, না ?"

"হ্যাঁ, যে যা পারে"—নন্দ হেসে বলল।

প্রবীর মাথা নাড়ল, "তাই কি ? ভেবে দেখ তো নন্দ—মানুষের সেবা আর দেশের সেবা কি সবাই পারে না বা সকলের কি তা পারা উচিত নয় ?"

নন্দ সায় দিল—"তা বটে—তা মানি"—কথা বলতে বলতে নন্দ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কাজললতা। কি করে সে কাল কাজললতার দেখা পাবে ?

"এই যে এসে পড়েছি রে"—প্রবীর বলল।

নন্দর চমক ভাঙ্গল। হ্যাঁ, তারা বড় রাস্তায় এসে পড়েছে। ডান দিকের কয়েকটা বাড়ীর পরেই গোপীনাথের আখড়া, তারপরেই একটা আম-কাঠালের ছোট বাগান। সেটার পঁর এবং রাস্তার ধারেই নন্দদের বাড়ী। ওদের বাড়ীর পেছনেই অর্জ্জুন, ছিদেম—এদের বাড়ী। নন্দদের বাড়ীর সামনেকার রাস্তার বাঁ ধারে একটা বাঁশ ঝোপ, তার পাশ দিয়ে যে সরু ফালির মত রাস্তাটা গিয়ে একটা টিনের চালওয়ালা পাকা বাড়ীতে গিয়ে শেষ হয়েছে সেইটেই প্রবীরদের বাড়ী।

নন্দ বলল—"আমাদের বাড়ী চ"—

প্রবীর মাথা নাড়ল—"না দেরী হয়ে যাবে"—

"না—না চল্। জলতেষ্টা পেয়েছে বললি—চল্ জল খাবি। তাছাড়া কতদিন পরে এলি, বাড়ীর সবাই তোকে দেখলে খুসী হবে।"

প্রবীর হাসল—"আচ্ছা চল্"—

নন্দদের বাড়ীও টিনের চাল দিয়ে তৈরী। বাড়ীর দেওয়াল কাঠ আর বাঁশ দিয়ে তৈরী। চালের উপর পবন-নন্দনের একটি টিনের প্রতিকৃতি রয়েছে। ১৩১৭ সনে একবার ভয়ঙ্কর ঝড় হয়েছিল এই অঞ্চলে—সেই ঝড়ে পাঁচ মাইল দূরের ধলেশ্বরী তিন মাইল সরে এসেছিল গাঁয়ের দিকে, গাঁয়ের যত সব বড় বড় গাছপালা আর গৃহস্থদের বাড়ীর চাল উড়ে গিয়েছিল সেই ঝড়ের তাণ্ডবে। নন্দর প্রপিতামহ বিশ্বম্ভর রায় টিনের চাল দিয়ে তখনি বাড়ীটাকে নূতন করে তৈরী করেন।

বাড়ীর সামনের দাওয়াটা বেশ প্রশস্ত। সেখানে নন্দর বাবা হরিচরণ ও অন্যান্য বৃদ্ধেরা প্রায়ই দাবা পেতে হুঁকো হাতে বসে।

বাড়ীর দাওয়ায় উঠে ওরা নিজেদের জিনিষ নামাল।

ঘরের ভেতর থেকে হরিচরণ বেরিয়ে এল।

"নন্দ এসেছিস—কত করে দর গেল আজ ?"—হরিচরণ ছেলেকে প্রশ্ন করল।

"এক টাকা দশ আনা—"

"বাজার সওদা সব করেছিস ?"

"হ্যাঁ—"

"আচ্ছা—বাকী টাকা মা'র কাছে দেগে—" হঠাৎ প্রবীরের উপর হরিচরণের নজর পড়ল, "আরে—প্রবীর বাবাজী না ?"

প্রবীর হাত তুলে নমস্কার জানাল—"হ্যাঁ কাকা—"

"অনেকদিন পরে দেখছি—ভাল আছ ত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"বেশ বেশ, তোমরা বসগে যাও—আমি একটু আখড়ায় যাচ্ছি। সোনাপুর থেকে একজন বোষ্টম এসেছে—সে নাকি ভারী সুন্দর কীর্তন করে।"

হরিচরণ চলে গেল।

প্রবীর একটু হেসে নন্দকে জিজ্ঞেস করল, "কিরে যাবি নাকি গান শুনতে ?"

নন্দ মাথা নাড়ল—"না ভাই—আজকে না—"

"কেন রে ?"

"বুঝলি না, বোষ্টমী হলে পরে যেতাম একবার"—নন্দ মুচকি হেসে বলল, "আসলে তা নয়, বড় ক্লান্ত—একটু জিরিয়ে নিই"—পরে ঘরের ভেতর ঢুকে সে ডাক দিল—"এই মাধবী—মাধবী—"

ভিতরের ঘরের দুদিকে আরও দুটো কামরা, তারি একটা থেকে একটি মেয়ে উত্তর দিল—"যাই দাদা—"

প্রবীর বাইরেই দাঁড়িয়েছিল।

নন্দ ডাকল—"আয়রে প্রবীর, ভেতরে আয়"—প্রবীর ভেতরে গেল।

নন্দ ঠাট্টা করে বলল—"তুই যে পরের মত ব্যবহার আরম্ভ করলি রে, এ্যাঁ ?"

প্রবীর একটু হেসে একটা তক্তাপোশে গিয়ে বসল।

"কি বলছ দাদা ?"—বলতে বলতে একটি ষোল বছরের মেয়ে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল। এসে প্রবীরকে দেখেই মেয়েটির চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে এগিয়ে এসে প্রবীরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে হেসে বলল—"উঃ—কতদিন বাদে তুমি এলে প্রবীরদা—"

প্রবীর হেসে বলল—"ভাল আছ ত' মাধু ?"

মাধু—মানে মাধবী—সস্মিতমুখে ঘাড় নাড়ল।

নন্দ বলল—"যা তো মাধু—কিছু খাবার আর জল নিয়ে এসে প্রবীরকে দে—"

প্রবীর বাধা দিল—"না না, খাবার টাবারের দরকার নেই, শুধু এক গেলাস জল আনলেই হবে মাধু—"

মাধবী কপট রোষে বলল—"ভারী পরের মত কথা বলছ ত' প্রবীরদা—চুপ করে বসে থাক দেখি—যা দেব তা খেতে হবে।"

ত্বরিৎপদে মাধবী ভেতরে চলে গেল।

"শিগ্‌গীই আবার চলে যাবি নাকি ?" নন্দ প্রশ্ন করল।

"না বলেই তো মনে হচ্ছে—"

"বেশ—কিছুদিন থাক এবার—তোরা থাকলে আমরা একটু ভদ্র হওয়ার সুযোগ পাব—"

"ঠাট্টা করছিস বুঝি ?"

"না রে না—নিজেদের শিক্ষিত বন্ধুবান্ধব থাকলে অনেক উপকার হয়—পরকে দিয়ে কি কাজ হয় ? শিক্ষিত লোক আরও অনেক আছে

বটে কিন্তু সবাই হয় দেমাকী আর স্বার্থপর। মানুষের ভালমন্দের কথা কি আর ওরা ভাবে ?”

“তা বটে—”

নন্দ একটু চুপ করে রইল, পরে পকেট থেকে বিড়ি, দেশলাই বার করে বলল—“বিড়িটিড়ি খাস নাকি প্রবীর—”

প্রবীর হেসে মাথা নাড়ল—“না রে—”

“একেবারে সাধু হয়ে পড়লি যে !”

“সাধু না—দরকার মনে হয় না তাই—”

মাধবী ফিরে এল। তার দুহাতে দুটো রেকাবে নারকেলের নাড়ু আর মোয়া মুড়কী।

দুজনের সামনে তা রেখে সে বলল—“খাও তোমরা—দিদি জল আনছে—”

প্রবীর চোখ বড় বড় করে বলল—“এতগুলো ! না, এত খাব না—”

মাধবী আদেশসূচক ভঙ্গী করে ঘাড় বেঁকিয়ে বলল—“এতগুলো মোটেই না—নাও দেখি, খেতে আরম্ভ কর—”

প্রবীরের ভারী কৌতুক বোধ হয় মাধবীর ভঙ্গী দেখে। সে খেতে আরম্ভ করল। খেতে খেতে মাধবীর দিকে সে একবার তাকাল। মাধবী তার দিকে চেয়ে আছে। ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসির রেশ, চোখে মমতার গাঢ় ছায়া। বেশ দেখাচ্ছে ওকে। আগের চেয়ে মাধবীর চেহারা অনেক বদলেছে। উৎফুল্ল যৌবন ওর সারা দেহের রেখায় রেখায় পল্লবিত। আগেকার শ্যামবর্ণ রং যেন হঠাৎ বিস্ময়কর ভাবে সুগৌর হয়ে উঠেছে, অনেকটা নন্দর গায়ের রংয়ের মত। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। পরিষ্কার ও টানা টানা ভুরু দুটোর নীচে

দুটো ডাগর ডাগর হরিণের মত চোখ—তাতে যেন অরণ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আছে। নাকটা খুব খাড়া না হলেও মুখের পক্ষে বেশ মানানসই হয়েছে, আর সব চেয়ে অপরূপ হচ্ছে ওর দুটো পাৎলা ঠোঁট। যেন প্রবাল-পদ্মের দুটো পাঁপড়ি। মাঝে মাঝে ওপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটের একটা কোণ যখন ও চেপে ধরছে তখন আরও ভাল দেখাচ্ছে ওকে। মাধবীর বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটেছে।

প্রবীর হেসে জিজ্ঞেস করল, "নাড়ুগুলো বেশ হয়েছে – তুমি তৈরী করেছিলে বুঝি ?"

মাধবী সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়ল—"হ্যাঁ—"

নন্দ সায় দিয়ে বলল—"জানিস প্রবীর, মাধু আজকাল বেশ ভাল রান্না করে—"

"বটে !—"

মাধবী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে মাথা নাড়ল, "কই—সে কিছু না—সে সবাই অমন রাঁধে—"

প্রবীর হাসল, "সব ভাল রাঁধুনীরাই অমন বলে, ও আমি শুনছি না—একদিন কিন্তু খাওয়াতে হবে ভাই—"

মাধবীর চোখ জ্বলে উঠল—"খাবে একদিন ?"

"হ্যাঁ—"

"আচ্ছা খাওয়াব"—মাধবী লজ্জায়, আনন্দে ঘেমে উঠেছে। কুন্দকলির মঞ্জরীর মত বিন্দু বিন্দু ঘাম চকচক্ করছে ওর ললাটে আর নাকে।

দু গেলাস জল নিয়ে মনোরমা ঘরের ভেতর এল।

মনোরমা মাধবীর বড়, বয়স প্রায় আঠার। দেখতে শুনতে সে মাধবীর চেয়েও সুন্দরী।

প্রবীরকে প্রণাম করে সে জিজ্ঞেস করল, "ভাল আছ প্রবীরদা ?"

"হ্যাঁ ভাই—ভালই আছি—"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মনোরমা বলল—"তোমরা বোস—আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি, মাকে পাঠিয়ে দিইগে। আজকে এখানে খেয়ে যাও প্রবীরদা—"

"না ভাই, আজ না—অন্য একদিন হবে।"

মনোরমা চলে গেল।

প্রবীর নন্দকে জিজ্ঞেস করল, "মানুর বিয়ের কি হল ?"

"কই আর হোল—তবে সাভার থেকে নাকি শিগ্‌গীরই লোক আসবে ওকে দেখতে। দেখা যাক্—ভগবান একটা ঠিক করে দেবেনই—"

প্রবীর হাত ধুয়ে হাসল, "ভগবান! তা হয়ত দেবেন—"

মাধবী মুচকি হাসল—"ভগবানের ওপর তোমার খুব বিশ্বাস নেই বলে মনে হচ্ছে প্রবীরদা ?—"

প্রবীর মাথা নাড়ল—"বিশ্বাসের মত কাজ নজরে পড়ে না যে—"

মাধবী নিরুত্তরে হাসল।

প্রবীর উঠে দাঁড়াল, "এবার আসি নন্দ—"

মাধবী বলল, "এখনি যাবে ? মায়ের সঙ্গে দেখা করবে না ?"

"করব খন পরে—এখন উঠি—"

নন্দও উঠল, "আচ্ছা যা।"

নন্দ হাত পা ধুতে ভিতরে গেল।

মাধবী হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে বলল, "চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি—"

প্রবীর হেসে উঠল, "দূর পাগল, আমি কি ছেলেমানুষ নাকি ?"

"না, অন্ধকার থাকতে পারে—বাঁশ ঝাড়ের ঐ জায়গাটায় দিনের বেলাতেই ত' বেশ অন্ধকার থাকে—"

"আজকে আর অন্ধকার নেই, বাইরে ফুটফুটে জোছ্‌না আছে—"

দাওয়ায় বেরিয়ে এসে প্রবীর স্যুটকেশটা তুলে নিল।

মাধবী প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বলল—"তুমি একটু রোগা হয়ে গেছ প্রবীর দা"—

প্রবীর মাধবীর দিকে তাকাল—একটু হেসে বলল, "সহরের মেসে থাকি—সেখানকার রান্না ত' আর তোমাদের মত না, শরীর ঠিক থাকে কি করে ?"

মাধবী প্রবীরের দিকে তাকিয়েই রইল, "প্রায় বছর খানিক পর তোমায় দেখছি ভাল করে। গেল বছর এলে, কয়েকদিন থাকলে, চাষা মজুর নিয়ে একেবারে উধাও হয়ে গেলে—আমাদের সঙ্গে একবার দেখাটাও করলে না।"

"হ্যাঁ সেবার খুব কাজ গিয়েছে। জান্ মাধু, এবার অনেক ভাল ভাল বই এনেছি—নিও পড়তে"—

"দিও। কবে দেবে ? কাল ?"

"আচ্ছা"—

মাধবী একটু ইতস্ততঃ করল, পরে জিজ্ঞেস করল, "এবার কিছুদিন থকবে ত' গাঁয়ে ?"

প্রশ্নটা করেই মাধবী নিঃশ্বাস বন্ধ করে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে।

"হ্যাঁ, এবার থাকব, হয়ত অনেকদিন থাকব"—

মাধবীর নিঃশ্বাস সহজ হল।

হ্যারিকেনের আলোর একটা তির্য্যক রেখা বাইরের জ্যোৎস্নার

আলোর সঙ্গে মিশে মাধবীর মুখের উপর পড়েছে। ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে।

চলতে আরম্ভ করে হঠাৎ প্রবীর মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, "জান মাধু—তুমি দেখতে অনেক বদলেছ"—

"কি রকম ?"—মাধবীর কণ্ঠে কৌতূহল।

"দেখতে আরো বড়, আরো সুন্দর হয়েছ।"

"ধ্যেৎ—"

"সত্যি বলছি—আচ্ছা, চল্লাম এবার"—

বড় বড় পা ফেলে প্রবীর চলে গেল।

দাওয়ার উপর মাধবী অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জায়, পুলকে ওর সমস্ত শরীর কাঁপছে, অবশ হয়ে আসছে। আরো সুন্দরী হয়েছে সে! প্রবীর বললে। প্রবীর। হে ঠাকুর গোপীনাথ, হে মা মঙ্গলচণ্ডী, প্রবীর যেন এবার থেকে চিরদিন এই গাঁয়েই থাকে। ধলেশ্বরী আর বুড়ীগঙ্গার তীরবর্ত্তী এই সুন্দর গ্রামটিতে। আম জাম নারকেল আর সুপারী গাছের নিবিড় ছায়ায় যেখানে মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, ভাঁটফুল সণ্টেফুলের সমারোহের মধ্যে যেখানকার বেতবন আর বাঁশঝাড় সালিক-ময়নাদের কাকলিতে সকাল-সন্ধ্যে সরগরম হয়ে ওঠে সেই গ্রাম ছেড়ে প্রবীর যেন আর শহরে ফিরে না যায়। হে শিবঠাকুর, তুমি তো জান মাধবীর কুমারী-হৃদয়ের নব-প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকে কার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ত' সেদিন, গেল শিবরাত্রিতে, মাধবী উপোস করে বারংবার তোমার কাছে প্রার্থনা করেছে—হে শিবঠাকুর, প্রবীরদা যেন আমার বর হয়, প্রবীরদা যেন আমার বর হয়। জাতি-কুলের বাধা থাকলেইবা ভোলানাথ—সে কথা কিন্তু তোমার ভুললে চলবে না।

কিন্তু হায়, প্রবীর একথার কিছুই জানে না।

লজ্জায় মাধবীর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। দিবসের সুস্পষ্ট প্রখর আলোতে তাকে দেখলে হয়ত মনে হতো যেন কে তার সারা মুখে হাল্কা আবীর মাখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু রাত্রি বেলায় হ্যারিকেনের স্তিমিত আলো আর জ্যোৎস্নাতে কি তা ধরা পড়ে?

আজ ত্রয়োদশী বটে কিন্তু পূর্ণিমার জোয়ার এসেছে নন্দলালের মনে, তার হৃদয়ের প্রান্তর আজ উপবনে পরিণত হয়েছে, আনন্দ ও আশার নানা রঙের ফুল ফুটেছে সেখানে। সব কিছু আজ ভাল লাগছে তার। কিন্তু এরি মধ্যে কোথা থেকে একটা শূন্যতার বেদনা এসে পীড়া দিচ্ছে নন্দকে। কাজললতা। কি করে কাজললতাকে পাওয়া যাবে? কাল কখন দেখা হবে তার সঙ্গে?

ঘরের ভিতর বসে থাকতে আর ভাল লাগে না।

নন্দ বাইরে বেরোল।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারদিক প্লাবিত। মৃদু বাতাস বইছে ঝিরঝির করে। রাস্তা ইতিমধ্যেই জনবিরল হয়ে এসেছে।

পূবদিকের রাস্তা ধরে পাটকলের দিকে নন্দ চলল।

গোপীনাথের আখড়া থেকে খোলকরতালের তুমুল শব্দ ভেসে এল না, আজ আর সেখানে যাওয়া হবে না।

প্রান্তরের গান

আকাশে অনেক নক্ষত্র আছে কিন্তু তাদের আলো আজ ম্লান।

ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক পাখী উত্তর দিকে উড়ে গেল। চন্দ্রালোক ওদের হাতছানি দিয়েছে বোধ হয়।

আখড়াটা পার হলো নন্দ।

আখড়ার পূবে ডোবাটার দিকে ঝোপ জঙ্গল ঘন হয়ে রয়েছে। তার পাশ দিয়ে চলতে চলতে নন্দ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

রাস্তা থেকে দূরে ডোবার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা পাটকলের মজুরদের বস্তীর দিকে গেছে তারি ডানদিকে বড় জগডুমুর গাছটার আড়ালে দুজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোক দুটোকে চেনা যাচ্ছে না। সেখানকার গাছপালার ঘন আস্তরণ ভেদ করে চাঁদের আলো ভালভাবে পৌঁছুতে পারেনি তাই দুটো অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তিই শুধু দেখা যাচ্ছে।

ফিস্‌ফিস্ কথাবার্ত্তা শোনা যাচ্ছে। একজন আর একজনের হাত ধরে টানাটানি করছে মনে হল।

নন্দ একটু ছায়াতে সরে দাঁড়াল।

"ধ্যেৎ"—একজনের গলার আওয়াজ শোনা গেল। নারীকণ্ঠ।

আবার কি সব ফিস্‌ফিস্ কথাবার্ত্তা।

"দূর মুখপোড়া বাহাত্তুরে কোথাকার—ভাগ্, আমি অত সস্তা নই, বুঝলি?" বলে সেই মেয়েলোকটা দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এদিকে এগিয়ে এল।

মেয়েলোকটিকে নন্দ চিনল। ললিতা। বস্তীর মধ্যেই সে থাকে, মিলে কাজও করে। কাজ তার নামমাত্র, খুব হাল্কা কাজ। আসলে তার মিলের কাজের দরকারই নেই। রাতের অন্ধকারে ললিতার দাম বেড়ে যায়, অসংখ্য ভক্ত তার দরজায় এসে করাঘাত করে তার

কৃপার জন্য। ললিতার ভক্তদের বিশেষ কোনো শ্রেণী নেই—ধনী, দরিদ্র সব আছে তাদের মধ্যে। তবে আজকাল দরিদ্রেরা পাত্তা পায় না, ললিতা বড়লোকদের জাতে উঠেছে। গ্রামের মধ্যে আরও অনেক লোক আছে ললিতার মত, কিন্তু দ্বিতীয় ললিতা আর কেউ নেই। রূপে, হাসিতে, গানে, রসিকতায়, সুনিপুণ সাজসজ্জায়, রক্ত-সমুদ্রকে উদ্বেল করতে ললিতার জুড়ি কেউ নেই। গ্রামের অনেক কুলবধূ দিবারাত্র তাকে অভিশাপ দেয়।

ললিতা নন্দকে দেখতে পেল।

"ওখানে কে দাঁড়িয়ে গো ?"—সে প্রশ্ন করল।

"আমি"—নন্দ এগিয়ে এল।

"আমি ! আমি কে ?"—ললিতা হাসল।

নন্দ উত্তর দিল না।

"ওঃ—ওস্তাদজী"—ললিতা মুখ টিপে হাসল। নন্দকে সে চেনে, তার গলার তারিফ করে তাকে 'ওস্তাদজী' বলে ডাকে। লোকে বলে ওটা ঠাট্টা, নন্দরও তাই মনে হয়। শুধু ললিতাই জানে ওটা ঠাট্টা কি সত্যি।

"হ্যাঁ—আমি"—নন্দ গম্ভীরভাবে বলল।

"তা এমন চোরের মত ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে ?"

"আমিই না হয় জিজ্ঞেস করছি—তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে ?"—নন্দ একটু কঠিনকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

"আমার দোষ নেই ওস্তাদজী—এক মুখপোড়া আমায় ধরল—ঐ যে এখন পা টিপে টিপে পালাচ্ছে"—

সত্যিই একজন লোক কাপড়ের খুঁটে মাথা ঢেকে পুবদিকের রাস্তা ধরে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল—"ড্যাকরা ওদিকে যাচ্ছে কেন— ওর বাড়ী তো কায়েতপাড়ায়—গাঁয়ের একজন মাতব্বর ও"—

নন্দর আস্বস্তি বোধ হয় ললিতার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে, সে বল্ল— "যাক্ গে—যাক্ গে"—

"যাক্ গে কেন ? ওদের বিষয়ে তো 'যাক্‌গে'ই—যত দোষ আমাদের কিনা। আচ্ছা—একদিন সব ফাঁস করব—সময় আসুক, যত সব ভণ্ডদের মুখোস খুলে একদিন তোমাদের দেখাব। ঐ যে উনি পালালেন, ঐ মহাপ্রভুকে তোমরা ধর্ম্মাবতার বলেই জান কিন্তু যেদিন জানতে পারবে সেদিন অবাক হয়ে যাবে"—

নন্দ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, আজকের আনন্দময় অভিজ্ঞতার মধ্যে কোথা থেকে যেন একটা অশুচি ছায়া এসে পড়েছে, সে বাধা দিয়ে বলল—"থাক্ ওসব কথা—আমি যাই"—

ললিতা মুচকি হাসল—"যাবেই ?"

নন্দ ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

ললিতা জিভ্ দিয়ে আক্ষেপের শব্দ করে বলল—"রাগ করছ মনে হচ্ছে—আচ্ছা ওস্তাদজী—এতো সেজেগুজে চলেছি, একবার জিজ্ঞেস করতেও কি ইচ্ছে হয় না—কোথায় যাচ্ছি আমি ?"—

নন্দ ভাল করে তাকাল ললিতার দিকে। ললিতার বয়স বেশী নয়, বড় জোর কুড়ি একুশ হবে। রাজারাজড়ার ঘরে জন্মালে বোধ হয় তার রূপের আগুনে অনেক রাজ্য তৃণের মত পুড়ে যেত। এত সুন্দরী সে। কিন্তু তবুও নন্দর মনে হয় যেন সেই রূপের ওপরেই একটা রাহুর ছায়া অদৃশ্যভাবে ওর সর্ব্বদেহে জড়িয়ে আছে। সাধারণে কিন্তু অত ভাববে না। সবাই ত' আর ওস্তাদ নন্দলাল নয়। সবাই বলবে ললিতা নটী মেয়েমানুষ হলেই বা, রূপের তার তুলনা নেই। আজ আবার



সেই ললিতার বেশভূষায় একটু বেশী পারিপাট্য। আস্‌মানী রঙের জরির কাজকরা জাম্‌দানী শাড়ীর অন্তরাল থেকে সুপুষ্ট অবয়বের আলেয়া-দীপ্তি মনকে প্রলুব্ধ করছে। চোখের কোণে কাজল আছে, পানের রসে ঠোঁট রাঙানো। কানে সোনার দুল, গলায় সোনার হার, হাতে একরাশ সোনার চুড়ী ঝক্‌ঝক্ করছে। তার দেহ থেকে উৎসরিত উগ্র একটা সুবাস চারদিকের বাতাসের শ্বাসরোধ করছে। জ্যোৎস্নালোকের পটভূমিকায় ললিতার এই রূপ দেখে ভয় হয়। মনে হয় যেন কুহকলোকের কোন মোহিনী সে।

"কই জিজ্ঞেস করছ না তো ?"—ললিতা আবার শুধোল।

"কি হবে জেনে ?"—নন্দ বিরক্ত হয়ে বলল।

কটাক্ষ হেনে ললিতা বলল—"যাচ্ছি অভিসারে"—

"তুমি মরগে"—দাঁতে দাঁত চেপে বলল নন্দ।

ললিতা হেসে উঠল—"রাগ করছ ? কিন্তু কি করব ওস্তাদজী—বড় মানী লোক, ভক্তের মান আমার জন্য বিপন্ন হবে বলে আমি নিজেই যাচ্ছি"—

নন্দ এবার চটে উঠল—"তা যাওনা, কেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করছ ?"

ললিতা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল, "তুমি রাগলেও আমার ভাল লাগে, মাইরি বলছি—আচ্ছা ওস্তাদ, আমার ওখানে একদিন পায়ের ধুলো দিও না, এ্যাঁ ?"

নন্দ জ্বলে উঠল, "অনেকের মাথাই তো চিবিয়ে খেয়েছ—আবার আমার ওপর নজর কেন ? চুলোয় যাও তুমি—"

নন্দ এবার পালাল।

পেছন থেকে ললিতা হেসে বলল, "ওদের মাথা খেয়ে সুখ পাই না তাই তো তোমার ওপর আমার লোভ"—

নন্দ আর ফিরেও তাকাল না। রাক্ষসী, পেত্নী, শাকচুন্নী—মনে মনে যত গালিগালাজ আছে সব সে ললিতার উদ্দেশ্যে বর্ষণ করল। মনটা কেমন যেন বিশ্রী হয়ে গেছে। নন্দর মন ললিতার প্রতি শিউরে উঠল।

খালের দিকের রাস্তা ধরল সে।

নির্জ্জন, আলোছায়াময় পথ দিয়ে চলতে চলতে নন্দর মন আবার হারানো প্রশান্তি ফিরে পায়।

ভাঁটফুলের গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে।

দু' একটা পাখী কোন গাছের ডালে বসে ডানা নাড়ছে।

হাওয়ার সংস্পর্শে ক্ষীণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে বাঁশগাছগুলো।

খালের ধারে গিয়ে দাঁড়াল নন্দ।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নার নীচে খালের জল রূপালী হয়ে চকচক্ করছে।

কি করছে এখন কাজললতা? সেও কি এখন নন্দর মত ভাবছে? কার কথা ভাবছে সে? নন্দর কথা? নন্দর ঘুম আসছে না, কিছু ভাল লাগছে না। কাজললতারও কি সেই দশা হয়েছে? মোটেই না, সে আশা নন্দ করতেই পারে না। কি হবে তবে? কি করে কাজললতাকে পাবে সে চিরদিনের জন্য? কালকে কি কাজললতার দেখা পাবে সে? আচ্ছা, কাজললতা আজ কেন তার বাপকে বলে দিল না, কেন সে আবার ফিরে এসে অমন ক'রে দরজায় হেলান দিয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল? কেন? মিথ্যে ভাবছে নন্দ। ও হয়ত এমনি খেয়াল, আর কিছু না। হবে।

নৌকোটাকে নিয়ে এই ফুটফুটে জোছনায় বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়।

প্রান্তরের গান

রাত্রির মধ্যখানে, যখন চরাচরে কেউ জেগে থাকবে না, তখন ধলেশ্বরীর জল ভেঙে তেতুলঝোরায় গিয়ে পৌঁছুবে নন্দ। গিয়ে দেখবে যে নদীর ঘাটকে রূপের আলোয় আলোকিত করে বসে আছে কাজললতা।

তাকে দেখে অভিমানে গলাভার করে কাজললতা বলবে, 'এত দেরী হল যে?'—

নন্দ হাত জোড় করে বলবে, 'বিলম্বের জন্য ক্রুদ্ধা হয়ো না, ক্ষমা কর দাসেরে দেবী—'

নন্দর অনুতাপ দেখে কাজললতা মুখ টিপে হেসে বলবে, 'আচ্ছা করব ক্ষমা, একটা গীত শোনাও দেখি—'

নন্দ হয়ত তখন গান ধরবে, মিষ্টিসুরে। নদীর জলের তানের সঙ্গে একতান হবে তার গলার সুর।

গীতশেষে কাজললতা মুগ্ধ হয়ে বলবে, 'বেশ গাও তুমি—অপূর্ব্ব!'

আরও অনেক কিছু ভাবে নন্দ খালের ধারে বসে বসে। অনেক রাত পর্য্যন্ত।

না, আর আশা নেই। ভয়ঙ্করভাবে প্রেমে পড়েছে নন্দ।

সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠবার কিছুক্ষণ পরেই প্রবীর জামাকাপড় ছাড়ছিল পাটকলের শ্রমিকদের সঙ্গে যাবে বলে। এমন সময় ডাক পড়লো তার বাপের কাছ থেকে।

প্রান্তরের গান

তারিণী চৌধুরীর বয়স হয়েছে। প্রায় ষাট বাষট্টি হবে। ধামরাইএর এক জমিদারের নায়েব ছিলেন তিনি। জমিদারী সেরেস্তায় প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়েছেন, বর্ত্তমানে সাত আট বছর হল অবসর গ্রহণ করেছেন। ছোটবেলায় ইংরাজী স্কুলে পড়েছিলেন কয়েক বছর, ইংরাজী তার ভাল লাগত না তাই বাড়ীতে সংস্কৃত চর্চ্চা করেছিলেন বেশ গভীর ভাবে। কিন্তু তাতে তার অন্তরের কঠিন হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটেনি। জমিদারের অসংখ্য প্রজাদের শায়েস্তা করে, জমিদারের লাভের ঘরে সিঁদ কেটে নিজের জন্য যা তিনি স্থাবর অস্থাবর গড়ে তুলেছেন তা মন্দ নয়। কিন্তু তবু সংসারে সুখ নেই তার। আরও দুটি ছেলে ছিল তাঁর, প্রবীরের চেয়ে বয়সে তারা বড় ছিল। একজন মারা গেল ত্রিশবছর বয়সে, অপরজন বাইশ বছর বয়সে। উপযু্যপরি দুটি সন্তানের মৃত্যুতে তাদের মা ভেঙ্গে পড়লেন, তিনিও কিছুদিন বাদে সংসারের মায়া কাটালেন। প্রবীরের তখন বয়স মাত্র বারো বছর। বিধবা বোন ছিল সংসারে—সেই প্রবীরকে মানুষ করেছে। তাঁর ইচ্ছে প্রবীর খুব লেখা-পড়া শিখুক, সে বি-এ পাশ করেছে—এবার এম-এ আর আইন পড়ুক। ছোটবেলা থেকেই প্রবীরের ঝোঁক আরো অন্যান্য বিষয়ে—তা তিনি জানেন। আরো জানেন যে আজকালকার যুগ অন্য। সংস্কৃত চর্চ্চার প্রভাবেই বোধ হয় এইটুকু তিনি স্বীকার করেন যে, যুগে যুগে মানুষের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম ও আদর্শ এক থাকে না, বিশেষতঃ যৌবনের। তা'ছাড়া বংশের রক্ষকও আর আঘাত পেয়ে পেয়ে তারিণী চৌধুরীও অনেক নরম হয়েছেন। প্রবীরের কোন কিছুতেই বাধা দিতে পারেন না তিনি।

"বাবা ডাকছিলেন ?"—প্রবীর এসে দাঁড়াল সামনে।

"হ্যাঁ, বোস—"

"কি ?"

"সহর থেকে ফিরে এলে যে বড় ?"

"অনেকদিন আসিনি তাই।"

"তা ভাল, মানে কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় ত' এটা নয় তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। বন্ধের সময় তো এলেই না—"

প্রবীর হাসল—"কলেজ বন্ধ হওয়ার দরকার নেই আর—"

"মানে ?" তারিণী বুঝতে পারলেন না।

"মানে কলেজে আর পড়ছি না।"

আকাশ থেকে পড়লেন তারিণী চৌধুরী।

"পড়ছ না ? এম-এ, ল'—এসব পড়বে না ?"

"না।"

"কেন ?"

"মিথ্যে কতকগুলো কাগজের ডিপ্লোমা নিয়ে কি হবে ? এখন বাড়ীতে বসেই পড়ব—"

তারিণী একটু আঘাত পেলেন। হতাশার ছায়া ছড়িয়ে পড়ল তাঁর মুখমণ্ডলে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি, পরে হঠাৎ কি ভাব্‌লেন, ভেবে মুখের ও মনের অপ্রসন্নতা বোধ হয় দূর হল একটু।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এবার তাহলে চাকৃরী বাকৃরী করবে ?"

প্রবীর আবার হাসল—"না বাবা।"

"সেকি !"—তারিণীর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। আবার এক নূতন আঘাত।

প্রবীর মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ—চাকৃরী আর করব না। দেশে ক্রীতদাসের অভাব নেই, কি হবে তার সংখ্যা বাড়িয়ে ? আমার ধাতে চাকৃরী করার

ধৈর্য্য নেই বাবা, ইংরেজ প্রভুর জন্য উদয়াস্ত খেটে কোনও রকমে বেঁচে থাকার মত ভিক্ষে নিতে আমি পারব না।"

তারিণী কথা বললেন না। জীবনে অনেক মানুষ দেখেছেন তিনি, মানুষের জটিল অন্তরলোকের অনেক গোপন তথ্য, অনেক গুপ্ত পথের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। কোন্ মানুষকে টলানো যায় আর কোন্ মানুষকে যায় না তা তিনি বেশ জানেন। তাই তিনি বুঝলেন যে প্রবীরের কথার নড়চড় হবে না।

খানিকক্ষণ কাটল নিঃশব্দে।

"তাহলে কি করবে স্থির করেছ?"—তারিণী জিজ্ঞেস করলেন।

"দেশ সেবা, দেশের দুঃখী দরিদ্রের সেবা"—প্রবীর বলল।

"হুঁ"

তারিণী চৌধুরী ভাবতে লাগলেন। সারা জীবন ধরে অন্যায়, জালিয়াতি আর কুটনীতির সাহায্যে তিনি জমিদারের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়েছেন নিজেও কিছু লাভ করেছেন। প্রভুর জন্য আর নিজের জন্য কত লাঠালাঠি কত দাঙ্গাহাঙ্গামা, কত রক্তারক্তি তাঁকে করতে হয়েছে! টাকার জন্য, মাটীর জন্য, লাভের জন্য, লোভের জন্য কত নিরীহের জীবনে সর্ব্বনাশকে ডেকে এনেছেন তিনি। তাঁর আদেশে কত অসহায়ের গৃহ ভস্মীভূত হয়েছে। কতবার ন্যায়ের কণ্ঠ তিনি নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে রোধ করেছেন। তাঁর জীবনের সেই সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ প্রবীর করবে। বিধাতার এ অমোঘ অনুশাসন। যাদের তিনি শোষণ কর্ত্তে সহায়তা করেছেন আজ তাদেরই সেবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর ছেলে। এমনি যুগে যুগে হচ্ছে। প্রতি পাপের জন্য, প্রতি অন্যায়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বাঁধা আছে। একজন না করলে আর একজন করবে, পিতা না করলে পুত্র করবে, এক পুরুষ না করলে অন্য পুরুষ করবে। গত্যন্তর

নাই। কালচক্রের আবর্ত্তনে সব বদলে যাচ্ছে। তাদের পুরানো পৃথিবী ভেঙ্গে যাচ্ছে। নূতন বাণী নিয়ে নূতনের দল এসেছে—বাধা-নিষেধে ফল নেই, কারণ বিধাতার অদৃশ্য নির্দ্দেশে কাজ করছে ওরা—কোন বাধাই ওরা মানবে না।

"শোন"—তারিণী ডাকলেন।

"বলুন।"

"খুব ভেবে চিন্তে কাজ করো বাবা—শেষে অনুতাপ কর্ত্তে না হয়। আমি চাই তুমি সুখী হও—"

প্রবীর মৃদু হাসল—"খুব ভেবেছি আমি। আমার পথ এই—এতেই আমি পরম সুখী।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তারিণী বললেন—"তবে এসো—যা ভাল বোঝ তাই কর।"

যোগবাশিষ্ট রামায়ণ খুলে বসলেন তারিণী চৌধুরী। আজ বিধাতার বিষয়ে একটা নূতন ধারণা জন্মাল তাঁর, আর সঙ্গে সঙ্গে এই ভেবে আজ ধিক্কার জন্মাল তাঁর মনে যে জীবনে নায়েবিছাড়া আর কিছুই করেন নি তিনি।

কিন্তু তারিণী চৌধুরী যদি ইতিহাসের সত্যকে উপলব্ধি করতে পারতেন তাহলে তিনি বুঝতেন যে ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাই পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত। এক ঘটনার সঙ্গে আর এক ঘটনার, রাজ্য ভাঙ্গার সঙ্গে রাজ্য গড়ার যুদ্ধের সঙ্গে শান্তির আর শান্তির সঙ্গে যুদ্ধের—এক অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। এ সত্যকে উপলব্ধি করলে তাঁর আক্ষেপ হত না। তাহলে তিনি বুঝতে পারতেন যে তাঁর কিছু না-করাটা পূর্ব্বতন ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটা ফল মাত্র। তাঁর জন্য তিনি দায়ী নন।

প্রান্তরের গান

অনেকটা হাল্কা মন নিয়ে বেরোল প্রবীর।

বেলা বেশী হয়নি। বোধ হয় সকাল সাড়ে সাতটা হবে। পাটকলের ভেঁপু এখনও বাজেনি, তা বাজবে বেলা নটায়।

তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করল প্রবীর। অনেকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

বসন্তের প্রভাত। রাঙা আলোর ছোঁয়াচ লেগেছে সব f আম-জামের নূতন পাতাগুলো চকচক্ করছে। নূতনের বাণী দিকের আকাশে, বাতাসে, গাছপালায়, লতাপাতায়। দেহের অভ্যন্তরস্থিত ইন্দ্রিয়গুলো যেন নবজন্ম লাভ করেছে। নবজাত মৃগশিশুর মত ক্ষণে ক্ষণে কোন অশ্রুত শব্দে, কোন অদেহী গন্ধে, কোন কায়াহীন রূপে, কোন অব্যক্ত রসচেতনায় ক্ষণে ক্ষণে তারা যেন অবাক হয়ে উঠছে, ক্ষিপ্রলম্ফে উচ্চকিত হয়ে তারা যেন আনন্দধ্বনি করে উঠছে।

রসিক ঘোষের পোড়ো ভিটার উপরে যে গন্ধভেদালি লতাটা নানা শাখা ছড়িয়ে ভিটের ঝোপঝাড়কে আরও ঘন করে তুলেছে তার গন্ধ ভেসে আসছে।

আর ভেসে আসছে আমের মুকুলের উগ্র সুবাস।

একদল যাত্রী চলেছে দ্রুত পদে। খালপাড় থেকে ঢাকাগামী গয়নার নৌকো ছাড়ল বলে।

প্রান্তরের গান

ধরিত্রী যেন নবকলেবর ধারণ করেছে। নিবিড় শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে তার ক্ষীণ দেহসৌরভে দক্ষিণের বাতাস মন্থর হয়ে উঠেছে। আঃ—প্রবীরের গ্রামের এই বসন্ত-প্রভাত অপূর্ব্ব।

মানুষের চারদিকে রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণের কত অদৃশ্য বন্যা কি উন্মত্ত, অধীর বেগে সুবিপুল আবর্ত্তের সৃষ্টি করে নিরন্তর বয়ে যাচ্ছে! অথচ কেউ তার খোঁজ নেয় না। কত সহজে তারা সুখী হতে পারে! কিন্তু কেউ তার চেষ্টা করে না। আদিম বর্ব্বরযুগের পুরাতন ইস্পাতের অস্ত্রগুলো এখনও সে লুকিয়ে রেখেছে তার সভ্যতার আবরণতলে। হিংসা, লোভ, ঈর্ষা, ক্রোধ, লালসা। বিষপান থেকে মানুষ এখনও বিরত হয়নি।

বস্তীর পরেই তাহেরের সঙ্গে দেখা হল। তাহের কলের শ্রমিক-সঙ্ঘের একজন উৎসাহী সভ্য। বয়সে সে নবীন।

"কবে আসলেন বাবু?"—উৎফুল্ল হয়ে তাহের প্রশ্ন করল।

"কাল রাত্তিরে—ভাল আছ তাহের?"

"জী হাঁ বাবু"—

"ইউনিয়ন কি রকম চলছে?"

"ভালই বাবু, তবে নতুন কিছু কাজ হচ্ছে না। সম্প্রতি অনেক গণ্ডগোল সুরু হয়েছে—কিন্তু কে এগোবে এই নিয়ে মুস্কিল হয়েছে।"

"কি গণ্ডগোল হচ্ছে?"—প্রবীর প্রশ্ন করল।

"সে এখানে দাঁড়িয়ে আর কি বলব বাবু, বস্তীতে যাচ্ছেন ত—ওখানেই শুনবেন আবদুলের মুখে।"

"যতীন ছিল না এখানে?"

"ছিল, কিন্তু আবার মাসখানেক হল চলে গিয়েছে—সেই বরিশালে"—

"হুঁ—আবদুল? আবদুল পারে না কিছু আরম্ভ করতে?"

তাহের হাসল, "আবদুল বলে যে আর কিছু দিন দেখা যাক, দরখাস্ত করা যাক, দরবার পরে করা যাবে। আসল কথা কি জানেন —ও ভয় পায়।"

"ভয়! কাকে?"

"মালিককে।"

প্রবীর নিরুত্তরে মৃদু হাসল।

তাহের বলল, "আমি তাহলে আসি বাবু—পরে দেখা হবে।"

"আচ্ছা এসো"।

"সেলাম"—

"সেলাম ভাই।"

প্রবীর এগিয়ে চলল। মালিক-জুজুদের সীমাহীন প্রভাব। তাদের অসংখ্য নাগপাশ শুধু মানুষের শোষন ও শাসনেই ব্যস্ত নয়, মানুষের মনের সাহস, কর্ম্ম, চিন্তা ও উদ্যমকেও তারা পঙ্গু করার চেষ্টায় সর্ব্বদা সক্রিয়। অনেক কাজ। অনেক কাজ কর্ত্তে হবে। অনেক দূরের পথ প্রবীর আর তার সহকর্ম্মীদের। আগে মানুষদের মনকে তৈরী করতে হবে, তাদের মনের অন্ধকার আর আবর্জ্জনা দূর করতে হবে। তারপর লড়াই—ক্ষমাহীন যুদ্ধ। তারপর—

ভয়ঙ্কর চীৎকার আর হট্টগোলে প্রবীরের চমক ভাঙ্গল।

বস্তীর সীমানা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মাটীর দেওয়ালের উপর খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কুঁড়ে। তাদের সংস্কার অনেকদিন হয়নি তা দেখলেই বোঝা যায়। দেওয়ালের মাটী খসে খসে পড়ছে, চালগুলোতে জীর্ণতার উইপোকা বাসা বেঁধেছে। এদিকে ওদিকে আবর্জ্জনা পড়ে আছে স্তূপীকৃত হয়ে। সকাল নটা থেকে সন্ধ্যে

ছটা পর্য্যন্ত খাটুনী খেটে এসে শরীরে যেটুকু উদ্যম থাকে তাতে ভালভাবে থাকবার চেষ্টা করা আর বোধ হয় পোষায় না ওদের।

চীৎকার শুনে মনে হলো যে নিকটেই বুঝি কোথাও লাঠালাঠি হচ্ছে। এগিয়ে বাঁ দিকের সরু পথটা দিয়ে যে বাড়ীটাতে যাওয়া যায় তারি পেছনের উঠোনে তাণ্ডব সুরু হয়েছে। ভীড় দেখে বোঝা গেল যে রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা, অভিনেত্রী ও দর্শকমণ্ডলীর অভাব নেই।

এই বাড়ীগুলোর একটাতেই প্রবীরের দরকার। এরি মধ্যে পিছনকার বাড়ীটাতে আবহুল থাকে। এই বাড়ীগুলোর বাসিন্দারা মুসলমান। হিন্দু শ্রমিকদের বাড়ীঘর আরও একটু এগিয়ে গিয়ে।

প্রবীর ভিতরে ঢুকে একপাশে দাঁড়াল। ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে সম্মিলিত চীৎকার কোলাহলের অতি দুরূহ লিপিসকলকে পর পর সাজিয়ে যা দাঁড়াল তা যুগপৎ করুণ ও হাস্যরসের উদ্রেক করবে।

ঘটনার মূল চরিত্র তিনজন। নায়ক হামিদ শেখ। বয়স তার গোটা পঁয়ত্রিশ হবে। প্লীহাশোভিত দুর্ব্বল ও খিটখিটে মেজাজের লোক। নায়িকা ছমিরণ বিবি। বয়স প্রায় ছাব্বিশ। সাধারণ চেহারা, অতি-সাধারণ, স্ত্রীসুলভ কলহপ্রিয়তায় ও পরনিন্দায় অতিশয় সুপটু। পরদার বালাই তার নেই। তৃতীয় চরিত্র আতাউল্লা। বয়েস প্রায় হামিদের সমান। হৃষ্টপুষ্ট, তাম্বুল-চর্ব্বনরত, খোস্ মেজাজের লোক।

যা ঘটেছিল তাকে বর্ত্তমান কালে রূপান্তরিত করলে এইরূপ দাঁড়াবে:

একটু আগে হামিদ তার স্ত্রীকে (এখন কিন্তু আতাউল্লা বলছে যে স্ত্রী নয়) বলল, "আইয়ুবের মা, এক মগ চা দ্যাও"—

আইয়ুবের মা ছমিরণ বিবির একটি ছেলে, দুটি মেয়ে। ছেলে আইয়ুবের বয়স প্রায় চার বছর। সেই বড়।

ছমিরণ বিবি খানা তৈরী করায় ব্যস্ত ছিল। পাট খড়ির ধোঁয়ায়

তার চোখ লাল হয়ে উঠেছে, কোলের এক বছরের মেয়েটা মাই চুষতে চুষতেও কাঁদছে। চুষেও দুধ না পেলে কাঁদবে না তো কি।

ছমিরণ উত্তর দিল। নিজের মনে গজর গজর করে কি যেন সে বলল।

"ছমিরণ—ও বিবি—"

ছমিরণ ঝঙ্কার তুলল, একটা ভাঙ্গা কাঁসার থালা যেন কেউ সানে আছাড় দিয়ে ফেলে দিল, "কি, পারব না আমি—একটু বাদেই ভাতও গিলতে হবে, তখন না পেলে আমারে খেয়ে ফেলবানে—আবার চা পানির সখ, ওরে আমার"—

হামিদ লোকটা এমনিতে ভাল কিন্তু কি যেন কেন মাঝে মাঝে হঠাৎ তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এবারও গেল।

লাফ দিয়ে উঠে সে বলল, "চোপরাও সুয়ারকা বাচ্চা"—

ছমিরণও রণে পরাঙ্মুখ না, "খবরদার, বাপ তুলো না বলছি"—

"তুলবোই ত', একশবার তুলবো, শালী, খানকীর বাচ্চি"—অশ্লীল গালিগালাজে আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলল হামিদ।

"তবেরে কুট্টীর পো"—ছমিরণ লাফিয়ে এল কোলের মেয়েটাকে মাটীতে ফেলে দিয়ে।

তারপরই কিল, চড়, লাথি, ঘুষো আর কেশাকর্ষণ। আইবুব আর মেয়ে দুটোর বিশ্রী কান্না।

ছমিরণ বলল যে হামিদ বদ্‌মায়েস, দুশ্চরিত্র, বেশ্যার ছেলে ইত্যাদি।

হামিদও বলল যে ছমিরণ দুশ্চরিত্রা, শয়তানী, দোজকের কীট ইত্যাদি।

পরিশেষে হামিদ বলল, "এইত সেদিন আতাউল্লার ঘর থেকে তুই বেরিয়ে এলি—হারামজাদী কোথাকার, আমি বুঝি জানিনা তোমার পীরিতের কথা।"

এবার সুরু হলো নূতন অধ্যায়।

আতাউল্লা বলল, "চুপ কর্ হামিদ—বাজে কথা বলিস্ না।"

হামিদ বলল, "কেন, উচিত কথায় আতে ঘা লেগেছে বুঝি?"

আতাউল্লা বলল, "বিয়ে করা বৌ হলে একথা বলতিস্ না, গাধা কোথাকার"—

"মানে?" হামিদ মৃগীরোগীর মত মুখভঙ্গী করে বলল।

"মানে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিস্ কিনা তাই মেয়েলোকটাকে অমন হেনস্তা করিস, ছিঃ—"

হামিদ গর্জ্জে উঠল, "খবরদার, মুখ সামলে আতাউল্লা, নইলে"—

আতাউল্লা হাসতে লাগল।

ছমিরণ এবার হঠাৎ আতাউল্লার উপরে রাগে ভেঙ্গে পড়ল। আবার এক প্রস্থ গালিগালাজ।

আতাউল্লা হেসে যেতেই লাগল।

ওদিকে ভীড় জমেছে। এসেছে জয়নুদ্দিন, এসেছে মদন, এসেছে জহুরুদ্দীন। আর এসেছে আশপাশের মেয়েরা। একজন স্ত্রীলোক ছমিরণের মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে ছমিরণকে ঝগড়াতে একাগ্র হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। আবদুলও তার বাড়ীর দাওয়ায় বসে হুঁকো টানতে টানতে নীরবে উপভোগ করছে এই জীবন্ত নাটক।

এই পর্য্যন্তই যখন হয়েছে তখন প্রবীর এসেছে।

বিশ্রী আবহাওয়া। এই করেই যারা উদ্বৃত্ত সময় কাটায় তাদের জন্য কাজ করতে গেলে কাজ আর এগোয় না, খালি পেছোয়। প্রবীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। অধিকাংশ শ্রমিক এবং মজুরদের জীবনের এই একটি ছবি।

প্রবীর ভিতরের দিকে এগিয়ে গেল।

সকলের নজর পড়েছে তার উপর।

আতাউল্লা হেসে সেলাম জানাল, "কেমন আছেন বাবুসাহেব?"

"ভাল, কিন্তু এসব কি হচ্ছে?"

"জিজ্ঞেস করুন না ঐ হামিদ শালাকে"—আতাউল্লা আবার হাসতে লাগল।

হামিদ প্রত্যুত্তরে একটা কিছু গরম কথা বলতে যাচ্ছিল, প্রবীর তাকে বাধা দিল, "হয়েছে থাম ভাই, যাও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করগে, তোমাদের সময় হলো যে তার খেয়াল আছে?"

কোলাহল শান্ত হয়ে এসেছে।

আবদুল এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়াল।

আতাউল্লা হেসে বললে, "আমিও ত' তাই বলছিলাম বাবু"—

প্রবীর বল্ল, "তুমিও এখন একটু থাম ভাই। এখানে আর ভীড় কেন, এ্যাঁ? যাও যাও, এখনি কলের ভেঁপু বাজবে—যাও"—

ভীড় ভেঙ্গে গেল।

ছমিরণ গজর গজর করতে করতে আবার রান্না করতে বসল।

প্রবীর বললে, "এসব কি হচ্ছে হামিদ, এ্যাঁ? ছিঃ—"

হামিদ চুপ্ করে রইল।

গ্রামের এই সব লোকেরা প্রবীরকে খাতির করে। সে ত' তাদেরই গাঁয়ের ছেলে, তায় শিক্ষিত, দরিদ্রের উপকারী। ভাললোকের ত' জাত নেই। তাই আতাউল্লাও খাতির করে প্রবীরকে যদিও সে মুস্লীম লীগের একজন নামজাদা সভ্য।

"তোমার লীগের খবর কি আতাউল্লা?"—প্রবীর জিজ্ঞেস করল।

"তা কি আর আপনার অজানা আছে?"—আতাউল্লা হাসল।

প্রবীরও মৃদু হাসল। হ্যাঁ, তা অজানা নেই বটে।

"যাও হামিদ, খেতে বসগে, পরে দেখা হবে। এস আবদুল, কথা আছে।"

আবদুল বলল—"আসুন।"

বাইরের দাওয়ার উপর একটা শীতলপাটি বিছিয়ে দিল আবদুল, "বসুন—কেমন আছেন?"

প্রবীর বসল "ভাল—কি খবর?"

আবদুল হাসল. "ভাল এবং ভাল না—দুই-ই। তার আগে বলুন দেখি যে এবার থাকবেন ক'দিন?"

প্রবীর আবদুলের মনোভাব বুঝতে পারল, সে হাত নেড়ে বলল, "ভয় নেই, এবার আর চট্ করে গাঁ থেকে যাচ্ছি না, এখানেই কাজ করার ইচ্ছে আছে।"

আবদুল যেন খানিকটা আশ্বস্ত হল, "ভাল, নিশ্চিন্ত হলাম বাবা।"

"কেন?"

"একা সব সময়ে সব কাজ করতে ভয় হয়।"

"ভয়! ভাল কাজ করতে ভয়! যা সত্য, যা ন্যায়—তার জন্য সিংহের মত নির্ভয়ে লড়বে।" প্রবীর উত্তেজিত হয়ে উঠল।

আবদুল হাসল, "সব মানি কমরেড, কিন্তু তবুও আমি একা অনেক সময় সাহস হারিয়ে ফেলি।"

প্রবীর হাসল, অভয় দিল, "আচ্ছা—সে ভয় দূর হয়ে যাবে। নিজের শক্তিকে যখন বুঝতে পারবে তখন আর ভয় থাকবে না, কিন্তু কি সব গণ্ডগোল সুরু হয়েছে তোমাদের বলত? রাস্তায় তাহেরের কাছে শুনলাম—কিন্তু সে কিছুই খুলে বলেনি।"

আবদুল মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ হয়েছে। আমাদের প্রথম অভিযোগ হচ্ছে যে এই সব বাড়ীঘর মেরামত করে দেয় না।"

প্রান্তরের গান

প্রবীর তাকাল চারদিকে। রাস্তায় আসতে আসতে যা সে দেখছিল তা আরও পরিস্ফুট হল তার কাছে। এই কুঁড়েঘরগুলো কলের মালিকের তৈরী, মজুরদের জন্য, কিন্তু তাদের স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সচেতন নন। পুরোনো কথা।

"তারপর ?"—প্রবীর প্রশ্ন করল।

"দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে যুদ্ধের জন্য আমাদের কাজ বাড়ছে, আমাদের উপরি খাটতে হয়, তাছাড়া জিনিষপত্রের দরও একটু বেড়েছে। অথচ এর কোনটার জন্যই আমাদের কোন কিছু বাড়তি দেওয়া হচ্ছে না। তা আমাদের চাই-ই।"

"হুঁ, তারপর ?"

"তৃতীয় অভিযোগ হচ্ছে খাটুনীর ঘণ্টা বাড়ানোর বিরুদ্ধে। নূতন আদেশ জারি হয়েছে যে আগামী পয়লা চৈত্র থেকে আরও এক ঘণ্টা করে বেশী খাটতে হবে—সকাল আটটা থেকে।"

"বটে !"

"হ্যাঁ, আপাততঃ এই তিনটে অভিযোগই প্রধান তাছাড়া ছোট খাট অভিযোগের কথা ছেড়েই না হয় দিলাম"—

"তবু শুনি"—

"যেমন অভদ্র ব্যবহার, গালিগালাজ—এগুলো একটু বেড়েছে"—

"অত্যাচারীর নিয়মই তাই—অত্যাচার ক্রমে বাড়াবে, কমাবে না।"

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল।

বাইরে কোথায় একটা পাপিয়া অশ্রান্তভাবে ডাকছে।

হামিদের মেয়েটার কান্না শোনা যায়।

আবদুলের স্ত্রী ভিতরে রাঁধছে, তার শব্দ ভেসে আসছে।

মুরগীর ডাক।

"কি ভাবছেন ?"—আবদুল জিজ্ঞেস করল।

"ভাবছি কি করা যায়"—

"কি করা যায় ?"

"আমাদের এখন তো একটি অস্ত্র হাতে আছে—অভিযোগ দূর না হলে ধর্ম্মঘট করা।"

"আমারও তাই মনে হয়—তবু প্রথমে এ নয়ে মালিকদের কাছে গিয়ে একটু পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা দরকার। কি বলেন ?"

প্রবীর একটু ভেবে মাথা নাড়ল, "তুমি ঠিকই বলেছ। তাই হবে। আচ্ছা আমি এখন উঠি, সন্ধ্যেয় ইউনিয়নে আসব। সবাইকে আসতে বলো—সব্বাইকে—"

"আচ্ছা—"

বেরোতেই উঠোনে একটা উলঙ্গ ছেলেকে দেখা গেল। তার মুখমণ্ডলে ও সারা দেহে বড় বড় বসন্তের ঘা—তখনও ভাল করে শুকোয়নি।

প্রবীর ডাকল—"আবদুল—"

"জী—"

"একি !"

"গ্রামের অনেক জায়গায় বসন্ত হচ্ছে—বিশেষ করে এই বস্তীতে। আর হবে না কেন ? দেখছেন চারিদিকের জঞ্জাল—তাছাড়া থাকে নোংরাভাবে। এই ছেলেটা, যা বাড়ী যা—ভাগ্—"

"এর জন্য মালিক কি ব্যবস্থা করেছেন ?"

"কি আবার—একদিন ডেকে সবাইকে টিকে নিতে বলেছিলেন। কথা ছিল ডাক্তার নিজে এসে সবাইকে দেখে টিকে দিবে। কিন্তু তা সে আর আসেনি, আসবেই বা কেন—এখানে ত' আর পয়সা নেই—"

"হুঁ—"

প্রবীরের ভুঁরু দুটো কেঁপে উঠল।

"চল্লাম আবদুল—"

"আদাব—"

"আদাব ভাই।"

অনেক কাজ। প্রবীর চলতে চলতে ভাবে। অনেক কাজ করতে হবে। আলস্যের দিন গেছে, এবার কর্ম্মের যুগ। অজ্ঞতা, ব্যাধি, দারিদ্র্য, দলাদলি, কুসংস্কার, নীচতা, লোভ, হিংসা, পরাধীনতা। কত শত্রু, কত বাধা। দুর্দ্দিনের অন্ধকারে দেশ ছেয়ে আছে। কিন্তু এসব অতিক্রম করতেই হবে। ভয় পেলে চলবে না, পেছোলে চলবে না। বড় কাজে বড় রকমের কষ্ট। নিরাশ হলে চলবে না। হ্যাঁ—অনেক কাজ করতে হবে।

বাড়ীর কাছাকাছি, বাঁ দিকের বাঁশঝোপের কাছে মাধবীকে দেখা গেল। শুকনো বাঁশপাতার ওপর বসে ডান পায়ের তলদেশকে সে খুব অভিনিবেশের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করছে।

"কি হল মাধু?"—প্রবীর হেসে প্রশ্ন করল।

মাধবী চমকে উঠল, প্রবীরকে দেখে তার মুখে একটু রঙের আভাসও আচম্‌কা খেলে গেল। উঠব-কি-উঠব-না ভাবের মাঝে একটু নড়ে উঠে সে যন্ত্রণাবিকৃত হাসি হেসে বলল—"কাঁটা বিঁধেছে পায়ে প্রবীরদা—এই এত্ত বড় বেলকাঁটা—"

"বের করলে?"

"এই করছি—"

"দেখি"—প্রবীর এগিয়ে এল কাছে, ঝুঁকে পড়ে কাঁটাটা দেখে বলল, "সত্যি তো, মস্ত বড় কাঁটা, দাও বের করে দিই"—হাত বাড়াল সে।

মাধবীর চোখ দুটো অনন্দে জ্বলজ্বল করে বড় হয়ে উঠল কিন্তু তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বাধা দিয়ে সে বলল—"না না, আমিই বের করছি, তোমায় আমার পায়ে হাত দিতে হবে না—"

প্রবীর হাসল—"তাতে কি হয়েছে?"

"ধ্যেৎ—লোকে দেখ্‌বে।"

"দেখলেই বা কি?"

"না না—তুমি গুরুজন—"

"তবে থাক কাঁটা শুদ্ধু বসে—"

"বসে থাকব কেন—এই ত' বের করেছি"—মাধবী হাসল।

কাঁটাটা বেশী গভীর ভাবে বেঁধেনি তবু একটু রক্ত বেরিয়ে এল তার সঙ্গে।

প্রবীর বল্লে, "বাড়ীতে চল, একটু ওষুধ লাগিয়ে নেবে—"

মাধবী উত্তর দিল না। বোঝা গেল সে রাজী। উত্তর সে ইচ্ছে করেই দিল না। প্রবীরকে সে নিরীক্ষণ করে। তার পায়ের কাঁটা দেখে প্রবীরের মুখচোখে কেমন সহানুভূতি আর উদ্বেগের ছায়া ঘনিয়ে উঠেছিল, এখন একটু রক্ত দেখে আবার কেমন ব্যাকুলভাবে সে ওষুধ লাগাবার কথা বলল! এর মধ্যে কি প্রকাশ পায়—এর অর্থ কি? শুধুই নিছক সহানুভূতি আর উদ্বেগ? না, তা নয়। আরো কিছু যেন মেশানো আছে তার সঙ্গে। মাধবী তা বুঝতে পারছে। মাধবীর মন আনন্দে, আবেশে একবার থরথর করে উঠ্‌ল, নিঃশ্বাস হল ঘন।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার দমে যায় মাধবী। 'যদি'। যদি'র ত' উল্টো দিকও আছে একটা। যদি না হয় তা, যদি সহানুভূতি আর উদ্বেগ ছাড়া অপর তৃতীয় কাম্য বস্তুটি মিথ্যাই হয়! বিচিত্র কিছু

নয়। প্রবীর তো মানুষ নয়, প্রবীর দেবতা—পাথরের তৈরী দেবতা। যে দেবতা শুধু ভক্তদের পূজা উপচারকেই গ্রহণ করতে জানে, হৃদয় বলে যার কোন বালাই নেই। প্রবীর মানুষ নয়। তাহলে প্রবীরের রক্তে আর চেতনায় মাধবীর সেই অতিকাম্য তৃতীয় বস্তুটিও প্রবীরের সহানুভূতি আর উদ্বেগের আড়ালে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকত আর তাহলে প্রবীর মাধবীর পায়ের কাঁটাটা টেনে বারও করত। মাধবী 'না' বললেই বা কি? মেয়েদের মুখের কথাই ত' সব কথা নয়।

অভিমানে ফুলে উঠল মাধবীর ঠোঁট দুটো।

কিন্তু যাকে নিয়ে মাধবীর এত চিন্তা তার মনে ওসবের লেশ মাত্রও নেই। সে তখন ভাবছে যে সন্ধ্যেবেলায় ইউনিয়নে কি কি করতে হবে, কি কি বলতে হবে।

"এদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছ মাধু?" প্রবীর তার চিন্তার বল্গা টেনে জিজ্ঞেস করল।

"বাড়ী"—হঠাৎ যেন কঠিন শোনাল মাধবীর কণ্ঠস্বর।

"গেছলে কোথায়?"

"তোমাদের বাড়ীর পেছনে, কমলার কাছে।"

মিথ্যে কথা বলতে মাধবীর মুখে আট্‌কাল না। আর মিথ্যে কথা ছাড়া উপায়ও নাই। সে যে সকাল থেকেই প্রবীরকে দেখার জন্য ছটফট্ করছে, কাজের এক ফাঁকে মাকে মিথ্যে কথা বলে সে যে প্রবীরদের বাড়ী গিয়েছিল—এ সব কথা প্রবীরকে খুলে বলার মত নয়। কাল রাতে অল্পক্ষণের জন্য আবছা আলোতে প্রবীরকে দেখে তার আশা মেটেনি। প্রবীরের বাড়ীতে গিয়ে তার পিসীর সঙ্গে নানা কথায় অনেকক্ষণ কাটিয়ে মায়ের বকুনীর ভয়ে নিরাশমনে,

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ফিরে আসছিল। হঠাৎ পথে কাঁটা বিঁধলো পায়ে। এল প্রবীর।

"ওঃ—সকাল বেলা উঠেই আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছ খালি"—হেসে বলল প্রবীর।

"করব কি ছাই ?"

"তাইত, কি করবে ? পড়াশোনা করতে ভাল লাগে না বুঝি ?"

"হুঁ—ভাল লাগবে না কেন ?"

হঠাৎ একটু রহস্য করবার ইচ্ছে হয় প্রবীরের। বাঁশঝোপের ছায়ায়, গ্রাম্য সরু পথটিতে দাঁড়িয়ে একটি গ্রাম্য তরুণীকে সহজ ও অতি-পুরাতন কথা বলে একটু রসিকতা করতে ইচ্ছে হয় প্রবীরের।

"খুব ভাল লাগে না, আমি জানি। ভাল লাগে খালি আড্ডা দিতে আর বিয়ের কথা ভাব্‌তে—"

"ধ্যেৎ"—মাধবী লজ্জায় ভেঙ্গে পড়লো, পাকা করম্‌চার মত তার গাল দুটো হঠাৎ লাল হয়ে উঠল, মুহূর্ত্তে দৃষ্টিটা তার মাটীর দিকে নত হয়ে পড়ল, আঁচলটাকে নিয়ে হাতে জড়াতে জড়াতে সে থম্‌কে দাঁড়াল।"

প্রবীর হাসতে লাগল।

"হাসছ—একটা পচা রসিকতা করে হেসে ভারী আনন্দ হচ্ছে তোমার ?" মাধবীর চোখে যেন একটা রাগের প্রচ্ছন্ন দীপ্তি। প্রবীর হাসি থামাল।

"রেগে গেছ দেখছি—"

মাধবী উত্তর না দিয়ে সোজা বাড়ীর দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল।

"আরে চলে যাচ্ছ যে, মাধু—"

মাধবী থামল না। ডানপায়ের পাতাটা সে সহজভাবে ফেলতে পারছে না, তবু সে থামল না।

"পায়ে একটু ওষুধ লাগিয়ে যাও—লক্ষ্মীটি—"

"চাইনে তোমার ওষুধ"—মাধবীর ক্রোধমিশ্রিত কথা ভেসে আসল।

"বই নেবার কথা ছিল যে মাধু—শুনছ—"

"না," মাধবীর উত্তর এল। তার গলা কাঁপছে।

মাধবী চলে গেল।

মাধবী কি কেঁদে ফেলল নাকি? কেন? একটা ছোট্ট কথায়, একটা হাল্কা রসিকতায় সে কেঁদে ফেলল! কথাটা কি এমন গুরুতর! গ্রামের সাধারণ একটি মেয়ে মাধবীর বয়সে কি বিয়ের স্বপ্ন দেখে না? এতে রাগের কি আছে, কাঁদবার কি আছে?

কিম্বা হয়ত আছে। মাধবী গ্রামের মেয়ে হলেও সাধারণ হয়ত নয়। সে হয়ত বিয়ের স্বপ্ন দেখেনা। একজন অপরিচিত শান্ত-সুবোধ স্বামীর বুকে মাথা রেখে দশটি সন্তানের জননী হয়ে সুপরিচিত অভাবের মধ্যে দিনগত পাপক্ষয় করার কথা বাদ দিয়ে হয়ত অন্য কিছুও চিন্তা করে মাধবী।

কিম্বা কেন, সত্যিই তাই। মাধবী ঠিক সাধারণ মেয়ে নয়, হাল্কা নয়। ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা দীপ্তি রয়েছে লুকিয়ে, ওর মনের গভীরতাও যেন এখন প্রবীর অনুভব করতে পারছে। রীতিমত শিক্ষা পেলে হয়ত ও আরও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে।

না, মাধবী মেয়েটি ভাল। প্রবীর তা স্বীকার করে। মাধবীকে তার ভাল লাগে তাও সে স্বীকার করে।

কিন্তু একথা জানলে মাধবী খুসী হবে না। ভাল লাগা আর ভালবাসা ত' এক কথা নয়।

রোদের তেজ একটু কমে আসতেই প্রবীর দুটো বই হাতে নিয়ে নন্দদের বাড়ী গেল।

"নন্দ"—সে ডাকল।

ভেতরের উঠোনে নন্দ মুখ ধুচ্ছিল।

মনোরমা ভেতরে এসে বলল, "বোস প্রবীরদা, দাদা আসছে—"

"মাধু কোথায় মানু?"

"পাশের ঘরে—মহাভারত পড়ছে—"

"বটে! ডেকে দাও ত', ওর জন্য বই এনেছি।"

"ডাক্‌ছি—"

মনোরমার বই পড়ার চেয়ে ঘর সংসারের কাজ করতেই ভাল লাগে; সে বই সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল প্রকাশ না করে ভিতরে গেল।

মাধবী ঘরে এল। অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে মুখখানা থমথম করছে। অতিমাত্রায় অস্বাভাবিক, মনে হচ্ছে যেন সে জোর করে গম্ভীর হয়ে প্রবীরকে একটু ভড়কে দিতে চায়। সে আসতেই মনে হল যেন কালো মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এল ঘরের ভেতর।

"মহাভারত পড়ছিলে বুঝি?" প্রবীর হেসে জিজ্ঞেস করল।

"হুঁ—" সংক্ষিপ্ত উত্তর। প্রবীরকে আমল না দেওয়ার ভাব দেখানোই মাধবী এখন ঠিক করেছে।

"কোন্ পর্ব্ব পড়ছিলে—শান্তিপর্ব্ব ?"

"উহুঁ—"

"না না শান্তিপর্ব্বই—তুমি ভুল বলছ—"

"না—"

"তা না হোক্ কিন্তু আমাদের মধ্যে শান্তি হোক, কেমন ?"

উত্তর নেই।

"সে সময় খুব রাগ হয়েছিল আমার ওপর, না ?"

মাধবী উত্তর দেবে না। সেই সকল থেকে এখন পর্য্যন্ত সে খুব ভেবেছে। মহাভারত সে ছাই পড়ছিল, ভাবছিল সে কি করবে প্রবীরের সঙ্গে দেখা হলে। মনে মনে সে ঠিক করছিল কোন্ কথার জবাব দেবে, কোন্ কথার জবাব দেবে না, কখন গম্ভীর হয়ে থাকবে আর কখন সে হাসবে।

"আমার ভারী ভুল হয়েছে মাধু।" প্রবীর কৃত্রিম বেদনার ছায়া মুখের উপর টেনে জড় করল। ছেলেমানুষ, ভারী ছেলে মানুষ মাধবী।

নৈঃ শব্দ।

"আর কোনও দিন এমন ঠাট্টা করব না—বুঝলে ?"

ফিক্ করে হেসে ফেলল মাধবী। হেসেই কিন্তু মনে মনে সে জিভ কাটল। এখানে এমনভাবে হাসার ত' কথা ছিল না। বয়ে গেছে, আর সে রাগ করতে পারে না প্রবীরের উপর। কেমন অনুতপ্ত হয়েছে প্রবীর! সে কথা বলছে না দেখে, রাগ করেছে ভেবে কি রকম আপশোষ করছে প্রবীর! এখন হাসলেই বা কি ?

"যাক্, হাসলে তবে—বাঁচলাম।" প্রবীরও হাসল।

"হুঁ—"

"কি রাগই করেছিলে মাধু—উঃ—"

"রাগব না—অমন বাজে কথা বল্লে কেন ?"

"আর বলব না—"

"আচ্ছা বেশ, এবার আর রাগ নেই আমার। দেখি, কি বই এনেছ আমার জন্যে—"

বই দুটো নিল মাধবী। বই দুটোর সব কিছু হয়ত মাধবীর মাথায় ঢুকবে না, তবু তার চেতনার তীক্ষ্ণতাকে সব কিছু এড়িয়ে যেতে পারবে না। মাধবী গ্রাম্য, অশিক্ষিতা বল্লেই চলে তবু দেশের কথা, সমাজের কথা, স্বাধীনতার কথা সে শুনতে ভালবাসে, তাদের বিষয়ে ভাবেও। আর তা ত' খুব অস্বাভাবিক নয়। যা সকলেরই ভাবা উচিত তা মাধবীর মত মেয়ে আজকালকার দিনে অনায়াসে ভাবতে পারে। যুগ বদলেছে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের যুগ এসেছে। তাছাড়া প্রবীরকে সে ভালবাসে। প্রবীরের আদর্শকেও যে তাকে ভালবাসতে হবে এটুকু বুদ্ধি মাধবীর আছে। হয়ত মাধবীর চিন্তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, উচ্চস্তরের নয়। হয়ত কেন, সত্যি তাই। কিন্তু তাতে কি ? মাধবী যে বড় কথা ভাবে এইটেই বড় কথা।

"কি খবর রে ?" নন্দ এসে জামা পরতে লাগল।

মনোযোগ দিয়ে নন্দ চুল আঁচড়ায়। ওস্তাদ নন্দলাল। মাথায় একরাশ বাবরি চুল রেখেছে নন্দ, আঁচড়ালে বেশ দেখায়।

"তুই এখন কোথায় যাচ্ছিস ?" প্রবীর জিজ্ঞেস করল।

"আমি !—এই—যাচ্ছি একটু পাশের গাঁয়ে"—মিথ্যে কথা বলতে গিয়েও সত্যি কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"কি কাজ ?"

"এমনি।"

"এমনি কি রে—নিশ্চয় যাত্রাটাত্রা হবে ?"

নন্দ কূল পেল, একটু হাসল, "হতেও পারে, নে চল্, তুই বেরোবি নাকি ?"

মাধবী বলল, "তুমি যাওনা কোথায় যাচ্ছ, প্রবীরদাকে ধরে আবার টানাটানি করছ কেন ?"

প্রবীর বাধা দিল, "না ভাই, আমাকেও যেতে হবে, চল্‌রে নন্দ"—

"চল্।" দাঁড় আর পালটা কাঁধে নিয়ে নন্দ ডাক দিল।

দুজনে বেরোল।

মাধবীর মুখ চোখ অন্ধকার হল একটু। দাদা ভারী ইয়ে। কিন্তু নন্দর দোষ নেই। সে এখন নিজের চিন্তা নিয়েই মশগুল, মাধবীর মনের খবর কি করে সে আঁচ করবে ? তায় মাধবী আবার মেয়েমানুষ যাদের মনের কথা দেবাঃ ন জানন্তি। জান্‌লে না হয় সে প্রবীরকে জোর করেই বসিয়ে যেত আর মাধবী না হয় বসে বসে তাকিয়ে দেখত প্রবীরের মুখ, স্বপ্নের জাল তৈরী করত এই অলস অপরাহ্নে যখন বাঁশঝাড়ের পড়ন্ত ছায়ার শান্তিময় আশ্রয়ে বসে ঘুঘুরা ডাকছে উদাস কণ্ঠে। কিন্তু তা হল না। সত্যি নন্দ ভারী ইয়ে।

প্রজাপতির মত যেন দুটো রঙীন পাখা গজিয়েছে নন্দর। ইচ্ছে করে উড়ে যায় তেতুলঝোরাতে—গৌরদাসের বাড়ীর দোরগড়ায়।

পবন-নন্দন হনুমানের কথা শুনে কেন যে লোকেরা জানোয়ারের মত দাঁত বের করে নন্দ তার কারণ অনুমান করতে পারে না। কত বড় বীর ছিলেন রামায়ণের সেই রাম-ভক্ত। একলাফে তিনি সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তাঁর মতন ক্ষমতা যদি থাকত নন্দর! তাহলে এই আড়াই মাইল স্রোত ঠেলে তাকে তেতুল-ঝোরায় যেতে হত না। চোখ বুজে "জয়রাম" বলে শুধু একটা লাফ, ব্যস্, এক নিমেষে হুস্ করে গিয়ে দাঁড়াত সে কাজললতার সাম্‌নে। উহুঁ, সাম্‌নে নয়, কাজললতা হয়ত তার আলৌকিক ক্ষমতা দেখে তাকে অন্য কিছু ভাবতে পারে।

কি রকম ছেলেমানুষ হয়ে গেছে নন্দ!

স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড় টানতে টানতে নন্দর হাতের আর কাঁধের পেশীগুলো বারংবার ফুলে ফুলে উঠে।

দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানিকের মধ্যে তেতুলঝোরা এসে পড়ল।

কদম্ব ফুলের মত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল নন্দর সারা শরীর।

কালকের সেই ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে আছে কাজললতা, পায়ের কাছে আজ একটা পিতলের কলস।

তাকে দেখতে পেয়েছে কাজললতা। দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি কলসীটা তুলে নিল হাতে।

নন্দ হাসল। নিশ্চয়ই অনেক আগে এসেছে কাজললতা। কিন্তু এমন ভান করছে যেন এই মাত্র সে ঘাটে এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা সত্যকে যেন আবিষ্কার করে নন্দ। যে সত্যটা সে কাল থেকে জানতে চাইছে। কাল বাপকে না ডাকা আর আসবার সময় দরজার পাশ থেকে তাকিয়ে দেখার সঙ্গে আজকের এই আগে ভাগে ঘাটে আসার সঙ্গে কোথায় যেন একটা যোগ রয়েছে। এসবের

মূলে যেন সেই সত্যই রয়েছে যে তেতুলঝোরার কাজললতা ভিনগাঁয়ের নন্দলালকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। নইলে কি দরকার ছিল তার আজকে ঘাটে আসার, আর এসময়ে? সে ত জানে যে নন্দ আজ আসবে? সাহস বেশী বলে আরও কি হয় দেখার জন্যই কি সে এসেছে? কিন্তু না, তা নয়। শুধুই কি সাহস আর কৌতূহল? না, নন্দর মন সায় দেয় না।

ঘাটে একজন গ্রাম্য-বধূ এল।

তাকে দেখে কাজললতা হাতমুখ ধুতে বসল।

সেই বধূটি কি যেন বলল কাজললতাকে, সে মাথা নাড়ল। মাথা নেড়ে সে জলের মধ্যে পা ডোবাল। ভঙ্গীটা এমন যেন সে চান করবে।

নন্দর নৌকো ঘাটের কাছে পৌঁছোল।

বধূটি ঘোমটা টেনে ভরা কলস কাঁখে নিয়ে চলে গেল।

নৌকো থামল।

কাজললতা তাড়াতাড়ি পা তুলে নিয়ে কলসী দিয়ে জলটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে জল ভরল।

না, কাজললতারও সাহস বেড়েছে।

জল তুলে সে মন্থরপদে উপরে উঠতে লাগল।

নন্দ ডাকল, "শুনছ—আমি এসেছি।" নৌকো থেকে নামল সে।

কাজললতা যেন কাউকে চেনে না, কোন ডাক যেন তার কানে যায়নি।

নন্দ পিছু ধরল, "আমি এসেছি—"

কাজললতা পিছন না ফিরে বলল, "এসেছ বেশ করেছ। মজা দেখবে"—

"কি মজা?"

"বাবাকে বলে দিয়েছি।"

"বেশ ত', আসুকনা তোমার বাবা, তাঁকে গান শুনিয়ে দেবখন"—

কাজললতার কাঁধ নড়ে উঠল। সে কি হাসল নাকি?

"একবার তাকাতে দোষ কি?" নন্দ হাসল।

চকিতে কাজললতা নন্দর মুখের উপর দৃষ্টিটা একবার বুলিয়ে নিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল। তার ঠোঁটের কোণে যেন একটু হাসিও দেখা গেল।

নন্দ, ওস্তাদ কবি নন্দ গানের সুরে বলল, "তোমার হাসিটি বড় সুন্দর কাজললতা—

—তোমার মুখের হাসি
দেখতে বড্ড ভালবাসি,
তাইত কাছে আসি।
আশা দিবানিশি আসা
কিন্তু অনেক দূরে বাসা,
তাই মনের আশা মনেই রেখে
নয়ন জলে ভাসি।

দেখি মুখখানা, আর একবার হাস না—"

কাজললতা ঝঙ্কার দিয়ে বলল, "লাঠির চোটে গান বেরিয়ে যাবে একটু পরেই।" তার কণ্ঠে ক্রোধের একটা রেশ আছে বটে, কিন্তু মনে হয় যেন সেটা নিছক একটা আবরণ মাত্র।

নন্দ হাসল, "গান? প্রাণ বেরিয়ে গেলেও ভয় করি না। কাজললতা, তোমায় ছাড়া আমার আর চলবে না।"

কাজললতা চলছেই, জবাব দিল না।

"তুমি বড় সুন্দর কাজল, যেন নব বসন্তের প্রথম পদ্ম।"

কাজললতার গতি যেন আরও মন্থর হয়ে এল।

“একটু দাঁড়াও কাজল, একবার ফিরে তাকাও আমার দিকে।”

কাজললতা ফিরে তাকাল, থমকে দাঁড়াল। কিন্তু কোথায়? চোখ দুটো যে রাগে আগুনের মত জ্বলছে!

ক্ষণকাল নন্দকে ভাল করে দেখে নিয়ে কাজললতা আবার চলতে লাগল।

একটু থতমত খেল নন্দ। তবু সে আজ আর ভয় পাবে না, পেছু হটবে না।

আর কি বলা যায়? নন্দর ভেতরে এত কথা ফেনিয়ে উঠছে যে নন্দ সামলাতে পারে না, তাদের প্রকাশ করতে পারে না। ফুরফুরে দখিনা বাতাস আসন্ন সূর্য্যাস্তের রঙীন আলোয় স্নান করে গা ছুঁয়ে যাচ্ছে তাদের। বসন্তের ফুল ফুটেছে চারদিকে আর ভাঁটফুল বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে আশপাশ থেকে। এমন সময় কাজললতাকে সামনে পেয়ে অনেক কিছুই বলতে ইচ্ছে করে নন্দর। কিন্তু সব গুলিয়ে যায়। আর কিছু সে রচনা করতে পারে না। তার কবি-প্রতিভা মূক হয়ে গেছে। বহু যাত্রায় গান গেয়েছে, অভিনয় করেছে সে। বহুবার কত রাজপুত্র সেজে প্রেম জানিয়েছে কত রাজকন্যাদের। সেই সব রাজপুত্রদের মধ্যে একজনের উক্তি সে আবৃত্তি করে বলল,

“কেন ফিরে লও
আঁখি? জাননাকি, তোমার
স্বপন দেখি কাটে দিবানিশি;
জাননাকি, তোমার স্মৃতির শিখা
অনির্ব্বাণ জ্বলে অকম্পিত
আমার হৃদয়-পদ্মে যেথা
তব বহ্নিকায়া বসায়েছি

সযতনে অনুরাগ-রক্তপুষ্প দিয়া ?
ফিরে চাও,
হে প্রমদা,
ফিরাও নয়ন ।”

কিছু বুঝল না কাজললতা। বরঞ্চ আগের গানটা সে বুঝেছিল, মন্দও লাগেনি তা। কিন্তু এবারকার গুরুগম্ভীর শব্দসমষ্টির অর্থ সে গ্রহণ করতে পারল না। কিন্তু তাতে কি, নন্দর উদ্দেশ্য তাতে ব্যর্থ হল না। নন্দর কণ্ঠের থর থর আবেগ, তার মিষ্টি সুরের রেশ, আর ঐ সমস্ত ছন্দোময় শব্দের ঝঙ্কার—সব মিলিয়ে কাজললতাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল। এমন কথা সে কারও কাছে শোনেনি। ছোট্ট গ্রামের একটি মেয়ে সে। এই সমস্ত বড় বড় কথা যা শুধু যাত্রাগানের রাজপুত্রেরাই রাজকন্যাদের বলে সেই সব কথা নন্দ যদি কাজললতাকে বলে, কাজললতার অভিভূত না হয়ে উপায় নেই। যাত্রাগানের রাজকন্যারা পর্য্যন্ত কাবু হয়ে যায়, কাজললতা হবে না কেন ?

কাজললতা তাকাল নন্দর দিকে। এবার তার চোখের আগুন নিভে গেছে।

“ফুরকুনী—অ’ ফুরকুনী”—

কালকের সেই বুড়ী।

ত্রস্তে কাজললতা দু’পা এগিয়েই থমকে বলল, “লোক আসছে, এগিয়ে যাও না, অমন হাঁ করে কি দেখছ ? যাও না নিজের কাজে—”

নন্দ হাসল, “যাচ্ছি”—এগিয়ে গেল সে।

“ফুরকুনী, ফুরকুনী রে”—বুড়ী নন্দকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

দু’চোখের উপর ডান হাতের তালু প্রসারিত করে সে নন্দর দিকে তাকাল যেন রোদ্দুরের আঁচ থেকে চোখকে বাঁচাচ্ছে বুড়ী।

"শোন বাছা"—বুড়ী ডাকল নন্দকে।

"কি ?"

"তুমিই না কালকের সেই"—

"হ্যাঁ—আমিই সেই—"

"তুমি কি দেখেছ ইদিকে—"

"তোমার ফুরকুনী ঠান্‌দি ? সাদা রঙের ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বাছা—"

"দেখেছি, ঐ ঘাটের কিনারায়"—অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলল নন্দ। একটু হেসে কাজললতা পাশ দিয়ে চলে গেল।

"ঘাটের কিনারায় ?"

"হ্যাঁ—"

"দেখেছ হতচ্ছাড়ার কাণ্ড ? ডুবে না মরে ."

"শিগ্‌গীর যাও ঠান্‌দি।"

"যাচ্ছি বাছা।"

নন্দ পা চালাল।

বুড়ী চলতে চলতে একবার পিছনদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "কালকে দেখলাম মেয়েটার পেছনে ছেলেটাকে, আজ দেখছি ছেলেটার পেছনে মেয়েটাকে—ব্যাপার কি ? ছেলেটা আন্‌গাঁয়ের—ড্যাক্‌রাটা কেডা ?"

বুড়ী চলে গেল।

নন্দ হাসল, "ফুরকুনীর ঠান্‌দি কিন্তু দেখে নিল"—

"দেখলেই বা কি—আমায় ও চেনে। কিন্তু তুমি আবার পেছন পেছন আসছ কেন ? মেয়েলোকের পেছনে ঘুরতে লজ্জা করে না তোমার ?"

"না।"

মুখ ফিরিয়ে নিল কাজললতা ।

"তুমি দেখছি বাড়ীতে চল্লে ?"

"চল্লামইত । গিয়ে বাবাকে পাঠাচ্ছি ।"

"বেশ, পাঠিও । কিন্তু কালকে আবার আসবে ত' ?"

"না ।"

"রাস্তার মধ্যে চলতে চলতে কি কথা বলা যায় ?"

"কথা বলো না তুমি আমার সঙ্গে । আমি কি বলছি নাকি কথা ?"

"কাল কোথায় আসব ?"

"সে আমি কি জানি ।"

বাড়ী কাছে এসে গেছে ।

"বলনা"—নন্দ মিনতি জানাল ।

"আমি জানিনা, আর তোমায় আসতেও হবে না, বাবাকে বলে তোমার আসা বন্ধ করে দিচ্ছি আমি"—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কাজললতা বলল, পরে একটু থেমে আবার বলল, যেন নিজের মনে বলছে, "আমি কাল যাব সুন্দরী বিলের ধারে, অনেক পদ্ম ফোটে সেখানে—"

"সুন্দরী বিল আবার কোথায় ?"

"সে যেখানেই হোক—তোমার তাতে কি ?"

"কেন যাবে সেখানে ?"

"কেন ?" একটু ভেবে কাজললতা বলল, "কাল বিষ্যুদ্‌বার—লক্ষ্মীপুজো—তার জন্যে ফুল তুলে আনব ।"

"বেশ, আমিও আসব ।"

"আমি যাব না কাল সেখানে ।" থমকে দাঁড়িয়ে কাজললতা বলল, "আমার বাড়ী এসে গেছে, বাবার হাতে লাঞ্ছনার লোভ যদি থাকে তবে এসো আর খানিকদূর—"

নন্দ হাসল, হেসে দাঁড়াল।

"তাহলে কাল দেখা হবে, কেমন ?"

"না।"

"তোমায় না দেখতে পেলে মরে যাব।"

"মরগে। বাবা, কি বেহায়া লোক!"

কাজললতার কণ্ঠে যেন হাসির রেশ। দ্রুতপদে সে চলে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নন্দ দেখল কাজললতা সামনের বাড়ীগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নন্দ। যদি আবার কাজললতা ফিরে আসে ?

না, কাজললতা আর এল না।

আবার কাল।

কে একজন মোটা সোটা লোক যেন আসছে ওদিক থেকে। কাজললতার বাপ নাকি ?

নন্দ হাঁটতে আরম্ভ করল ঘাটের দিকে।

না, কেউ নয়।

ঘাটে পৌঁছুল নন্দ।

এবার স্রোত ঠেলে এগুতে হবে না, এবার হাওয়ায় পাল ফুলে উঠবে, এবার নৌকো চলবে আপনা থেকেই, তীরের মত।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। নদীতীরের ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের মধ্যে জোনাকিরা জ্বলতে আরম্ভ করেছে। ঠাকুরমার কোলে মাথা রেখে নাতি নাত্‌নীরা এখন গল্প শুনতে বসবে। কাঞ্চনমালা আর মধুমালার গল্প। গল্প শুনতে শুনতে হয়ত তারা দেখবে যে তারাময় আকাশের পূবদিকে চতুর্দ্দশীর বড় চাঁদটা উদিত হচ্ছে।

স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসতেও যে নন্দ ক্লান্তি বোধ করেনি সেই নন্দই এখন ফেরার সময় ছট্‌ফট্‌ করে। আর কতদূর? পথ যেন আর ফুরোবে না।

আবার কাল। সুন্দরী বিলের ধারে। যেখানে অজস্র পদ্ম বিলের জল আলো করে ফুটে রয়েছে। সেইখানে অজস্র পদ্মের শোভাকে ম্লান করে দিয়ে লক্ষ্মীপুজোর ফুল তুলতে আসবে একটি স্থলপদ্ম। সে কাজললতা।

অনেক মুহূর্ত্ত, অনেক দণ্ড আর অনেক প্রহরের পর। আবার কাল।

বাড়ী ফিরতে রাস্তায় অবিনাশের সঙ্গে নন্দর দেখা হল। অবিনাশও পাটকলে কাজ করে।

"কোত্থেকে আসছ অবিনাশ?"

"ইউনিয়ন থেকে।"

"কি ছিল আজ—মিটিং?"

"হ্যাঁ—"

"কি ঠিক হল?

"জমিদার শশাঙ্করায়ের নামে একটা দরখাস্ত লিখল প্রবোধবাবু—সাতদিনের মধ্যে জবাব চাই।"

"প্রবীর এসেই উঠেপড়ে লেগে গেছে !"

"তা না হলে আমরা বাঁচব কি করে—উনি আমাদের কত সাহায্য করেন তা বলবার নয় ।"

"তা ঠিক—"

"ওর মত লোক হয় না। কৈ, গাঁয়ে ত' আরও শিক্ষিত ছেলে আছে, আমাদের নিয়ে কে মাথা ঘামায় ? সুব্রতবাবুও ত' আছেন। চরকা কেটে, অহিংসা ব্রত পালন ক'রলেই কি আমাদের দুঃখ দূর হবে ? খানিকটা না হয় হোল, ওসব বিশ্বাসও করি, কিন্তু আমাদের জন্য কি হচ্ছে, আমাদের কথা নিয়ে তিনি কি মাথা ঘামান ? আমাদের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে খেটে, মালিকেরা চুষে খাচ্ছে আমাদের। তাদের সঙ্গে গিয়ে আমাদের ভাল'র জন্য কই আর কেউ ত' গিয়ে ঝগড়া করে না ?"

"সেটা সত্যি ঠিক ভাই"—নন্দ সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিল।

কিন্তু নন্দর ঘুম হবে না আর।

কাজললতা তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

কাজললতাকে কি করে জয় করা যায় ? কি করে ? বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে হঠাৎ একটা কথা খেলে গেল তার মাথায়। প্রবীরকে যে মিথ্যে কথা বলে রেহাই পেয়েছিল সেই কথাটাকেই সত্যি করার জন্য ভাবনা আরম্ভ হল তার। তেতুলখোরায় একটা যাত্রাগানের ব্যবস্থা করতে হবে একদিন। কথাটা ভেবেই নন্দ এত খুশী হল মনে মনে যে সারারাত সে খুশীর আতিশয্যে আর ঘুমোলই না।

লালচোখে ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে জ্বালা ধরিয়ে সে ছুটল যতীশ সাহার বাড়ীতে।

প্রান্তরের গান

যতীশ সাহা সাউপাড়ার সবচেয়ে ধনাঢ্য বণিকের ছেলে। ঢাকায় নানা কারবার আছে তার বাপের—লক্ষপতি লোক। বড়লোক বাপের বড়লোক ছেলের যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতির সখ বড় প্রবল। গ্রামের এসবের সেই বড় সমজদার। সেই তাদের বড় পাণ্ডা, একজন বড় অভিনেতা (অবশ্য সবাই তা' স্বীকার করেনা), এক কথায় ওসবের মালিক। কথা নেই বার্ত্তা নেই নেই, কোনও উপলক্ষ্য নেই, কিন্তু হঠাৎ যতীশের সখ চাপলেই হল। সখ চাপতেই দেখা গেল যে তাদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বা জমিদার বাড়ীর প্রাঙ্গণে সামিয়ানা খাড়া হয়েছে বা পেছনে ষ্টেজ বাঁধা হয়েছে, দুটো ডানাওয়ালা অর্দ্ধ নগ্ন পরীর ছবিওয়ালা ড্রপসিনটা পাড়ার ছেলেমেয়েদের চোখে বিস্ময়ের জোয়ার টেনে এনেছে।

যতীশ সবে ঘুম থেকে উঠেছে।

"চা খাবি ?"—সে জিজ্ঞেস করল।

নন্দ ঘাড় নাড়ল।

"চোখ লালচে কেন ? কোথাও গাওনা ছিল নাকিরে ?"

"না"

"তবে ?"

"যে সব কথা শুনেছি কাল, ঘুম আসবে কোত্থেকে ?"

"কথা শুনেছিস ? কি কথা ? কোথায় ?"

"তেতুলঝোরাতে, দু'তিনজন চেনাশোনা লোক বলছিল—"

"কি বলছিল ?"

"বলছিল যে মালতীপুরের জমিদারের নাট্যসমিতিই সবচেয়ে ভাল যাত্রা থিয়েটার করে।"

যতীশ উত্তেজিত হয়ে উঠল, "বলছিল ! কে—কে—?"

"ও আপনি চিনবেন না তাদের—ওরা বলছিল যে আমরা নাকি ওদের কাছে একটুও লাগি না, আমরা নাকি ওদের নখের যুগ্যি না—"

"বলছিল, বলছিল এমন বাজে কথা?" যতীশের গলা রাগে আর উত্তেজনায় কাঁপছে।

"বলছিলোই ত'। আমি আপনার নাম পর্য্যন্ত করলাম যে আমাদের যতীশদার এ্যাক্টিং তোমরা দেখনি বোধ হয়—"

"তারপর, তারা কি বলল?"

"তারা হেসে বলল যে দেখেছি, তা আর এমন কি এ্যাক্টিং—"

দাঁতে দাঁত চাপল যতীশ, "এমন কি—বটে!"

নন্দ উত্তেজিত ভাবে বলল,—"যতীশদা—"

"উঃ—"

"এর শোধ নিতে হবে—"

"কি করে?"

"তেতুলঝোরায় একদিন যাত্রার ব্যবস্থা কর"—

"আমিও তাই ভাবছি"—যতীশের মুখের অন্ধকার দূর হল।

চা এল।

"ঠিক বলেছিস—ওদের নাকের ডগায় তুড়ী মেরে আসব আমরা।" মালতীপুরের দলকেও নেমন্তন্ন করব—স্পেশাল রিকোয়েষ্ট, কি বলিস?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—

"নে চা খা—আচ্ছা দেখে নেব। যাত্রা শেষ হলে ডাকাব তোর সেই লোকগুলোকে, স্যাঙাতদের মুখে রা কাটে কিনা দেখা যাবে"—

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

দুদিন পরেই সব ঠিকঠাক হলো। মহলাও আরম্ভ হয়ে গেলো। তেতুলঝোরার শ্রীমন্ত সাহা যতীশের ভগ্নীপতি, বড় মহাজন। তারই বাড়ীতে যাত্রাগান হবে। দশদিন বাদে। যে পালাটা তাদের করা আছে সেইটে। পালার নাম "কুরুক্ষেত্র"।

রোজই নন্দ বিকেল হলেই তেতুলঝোরায় উধাও হয়। মাঝে দু'দিন মাত্র সে কাজললতাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু কাজললতা ধরাছোঁয়া দেয় না। হয়ত এক মিনিট, কখনওবা মিনিট পাঁচেক হয়ত তাকে দেখে নন্দ। দু'একটা কথা বলে কাজললতা—কিন্তু তাও হেঁয়ালিভরা। আসল কথার জবাবই দেয় না সে, ঘাটের দিকেও বেশী আসে না আজকাল। বিলের ধারে মাত্র দুদিন এসেছিল। বাড়ীতে নাকি একটু নজর পড়েছে তার ওপর—ফুরকুনীর সেই বুড়ী ঠান্দি নাকি বাড়ীতে এসে নালিশ করেছে। সুতরাং কয়েকদিন যে নন্দ আর ভাল করে দেখা পাবেনা তার একথা কাজললতা জানিয়েদিয়েছে নন্দকে। ভালবাসার কথা? নন্দ তা জানে না। কাজললতার সব কিছুই দুর্বোধ্য রহস্যে ঢাকা। একবার মনে হয় ভালবাসে আবার মনে হয় না, শুধু কৌতুক করে কাজললতা। নন্দ কিছু বুঝতে পারছে না। না বুঝুক, নন্দ এটা জানে যে সে কাজললতাকে ভালবাসে।

জল্পনা কল্পনা করে সময় কাটে নন্দর। তাদের গ্রামে যে যাত্রাগান হবে একথা নন্দ কাজললতাকে জানায়না। অবাক করে দেবে কাজল-

লতাকে এই ঠিক করেছে সে। মনে মনে কল্পনা করে সে আনন্দ পায় যে তেতুলখোরা গ্রামে শ্রীমন্ত সা'র বাড়ীর বড় উঠোনটাতে, বড় সামিয়ানার নীচে, যাত্রার আসর তৈরী হয়েছে। গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়েছে, মালতী-পুরের জমিদারের দল যতীশের "স্পেশাল রিকোয়েষ্টে" সামনে এসে গম্ভীর মুখে বসে আছে, আসর গম্‌গম্ করছে, তাদের দলের হরিপদ'র হাতে বেহালাটা যেন মানুষের মতই কথা বলছে; আবহাওয়া জমে উঠেছে। চিকের আড়ালে মেয়েরা বসেছে, সে চিক অবশ্য দেওয়াল নয় যে কাজললতাকে দেখা যাবে না। কাজললতাকে সে দেখতে পাবে সামনেই, ঝাড়লণ্ঠনের আলো যেখানে তির্য্যকভাবে গিয়ে পড়েছে সেইখানে সে আবিষ্কার করবে কাজললতাকে। পালা যখন বেশ জমে উঠবে, ভীমবেশী যতীশ যখন আস্ফালন আরম্ভ করবে একটা মস্ত বড় গদা নিয়ে সেই সময় সে—নন্দলাল—অর্জ্জুন সেজে আসরে ঢুকবে (তাদের গাঁয়ের অর্জ্জুন নয়, মহাভারতের মহারথী—মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন)। মাথায় তার মণিমাণিক্যের মুকুট, জরির কাজকরা মিরজাই আর রক্তাম্বর পরণে; হাতে আর গলায় চক্‌চকে মতির মালা, কাঁধে লাল শালু আর জরি দিয়ে জড়ান মস্তবড় ধনুক আর হাতে একটা ঝকঝকে তীর (বোধ পাশুপত অস্ত্র)। যাদুমন্ত্রের মত ধ্বনিত হবে অর্জ্জুনের কণ্ঠস্বর, তার গানে (হ্যাঁ, অর্জ্জুনেরও গোটা চার পাঁচ গান থাকবে। বীরেরা বুঝি গাইতে জানে না?) আসরের লোক মুগ্ধ হয়ে বাহবা দেবে, হাততালি দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌বে -'সাধু' 'সাধু'। ঠিক সেই সময়ে সে কাজললতাকে দেখতে পাবে। তার নাকের ডগায় ভীড়ের গরমে ঘাম জমেছে, ডাগর ডাগর চোখদুটো আরও ডাগর হয়ে উঠেছে বিস্ময় আর মুগ্ধতার আবেশে। একেবারে অবাক হয়ে গেছে সে অর্জ্জুন-বেশী নন্দকে দেখে। এত অবাক হয়েছে যে তার মাথার

ভারী খোঁপাটা কখন যে ভেঙ্গে পিঠের ওপর এলিয়ে পড়েছে সেদিকে তার হুঁশই নেই।

আশ্চর্য্য, একটু ভাবলেই মানুষ কত আনন্দই না পেতে পারে!

তাই হলো।

একদিন তেতুলঝোরায় শ্রীমন্ত সা'র বাড়ীতে ২রা চৈত্রের রাত্রে বড় বড় পেট্রোম্যাক্স বাতি আর ঝাড়লণ্ঠনের আলোকে উদ্ভাসিত সামিয়ানার নীচে কলাতিয়ার সুবিখ্যাত সরস্বতী নাট্য সমিতি "কুরুক্ষেত্র" অভিনয় করল। ঢাকা থেকে নূতন পোষাক ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। পোষাক পরিচ্ছদের সে কি বাহার, কি জাকজমক, আর কি কন্সার্ট! ছেলেবুড়ো সবাই একেবারে থ' হয়ে গেল। ভীম, ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র এবং সৈনিকেরা ছাড়া আর সবাই গান গেয়েছিল। কিন্তু মাৎ করেছিল সব দিক থেকে নন্দ, যতীশ আর শ্রীকৃষ্ণবেশী নিতাই। অর্জ্জুন, সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন বটে কিন্তু তিনি যে উঁচুদরের সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন তা এইবারে বোঝা গেলনন্দর গানেতে। বাঁশীর মত রিণ্‌রিণে, কাজ-করা গলা তার —মানুষেরা বাহবা দিতে দিতে প্রায় পাগল হয়ে উঠলো। আর ভীম—কি তর্জ্জন, কি গর্জ্জন, গদা বিঘূর্ণন করে কি আস্ফালনটাই যতীশ করল! ধন্য ধন্য রব উঠেছিল চারদিকে। সকলে, এমনকি মালতী-পুরের দলও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করল যে সরস্বতী নাট্য সমিতির গীতাভিনয় চমৎকার হয়েছে। বস্তুতঃ এ তল্লাটে তাদের জুড়ি নেই।

অভিনয় আরম্ভ হয়েছিল রাত সাড়ে আটটায় আর শেষ হলো ভোর পাঁচটায়। তখন ভোরের ফিকে আলোর আস্তরণটা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কুরুক্ষেত্রের মত এলাহি ব্যাপার যে সরস্বতী নাট্য সমিতি মাত্র সাড়ে আট ঘণ্টায় শেষ করলো, এ চারটিখানি কথা নয়।

অভিনয় শেষ হলেও অনেকক্ষণ যাবৎ যতীশের মধ্যে একটা বীররসের ভাব বিদ্যমান থাকে। আজ আরও বেশী মাত্রায় ছিল।

বেশ তখনো সে ছাড়েনি, ভীমের ছুটো মোটা গোঁফ মুচড়ে রোষ-কষায়িত লোচনে যতীশ বলল, "নন্দ, আন্ ত' সেই সব স্তাঙাৎদের ডেকে যারা বলেছিল যে আমরা বাজে অভিনয় করি।"

নন্দ হাসল, "তারা কি আর আছে যতীশদা, তারা গেছে, তারা পালিয়েছে।"

"পেলে নাকে খৎ দেওয়াতাম ব্যাটাদের।" হুইস্কির বোতল থেকে একটা গেলাসে একটু ঢেলে যতীশ পান করল। নেশা না করলে তার অভিনয় জমে না।

"নিশ্চয়ই।"

"খাবি নাকি রে একটু?"

"না যতীশদা'।"

সবাই পোষাক ছেড়ে রঙ্ শুদ্ধই শ্রীমন্ত সা'র বড় কাছারী ঘরটার মেঝেতে শুয়ে পড়ল। আজ তাদের যাওয়া হবে না—শ্রীমন্ত সা'র অনুরোধ। কাল ছুপুরে ভোজ হবে। তারপর ফিরবে তারা নিজেদের গাঁয়ে।

নন্দদের গ্রাম থেকেও অনেক লোক এসেছিল। নন্দ অনেককে বলেছিল, প্রবীরকেও বলেছিল। প্রবীর আসেনি, ওর এসবে বেশী রুচি নেই। মাধবী এসেছিল তার বাপের সঙ্গে অর্জ্জুনের নৌকোয়, কারণ

নিজেদের নৌকোতে তিনচারজন, দলের লোককে নিয়ে তুপুর থাকতেই নন্দ এখানে চলে এসেছিল। ওরা একটু আগে অর্জুনের নৌকোতেই ফিরে গেল।

সবাই চোখ বুজে পড়ে আছে। সারারাতের লাফালাফি আর চীৎকারের পর সেটাই স্বাভাবিক। নন্দ কিন্তু জেগে রইল, ভাবতে বসল।

হঁ্যা, কাজললতা এসেছিল। সে নিজে কাজললতাকে বলেনি বটে কিন্তু শ্রীমন্ত সা'র একজন লোককে পাঠিয়ে গৌরদাসকে সে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। একটা লালরঙের জামদানী শাড়ী পরে কাজললতা এসেছিল। চিকের আড়ালে সে বসেনি বসেছিল চিক ঘেঁষে, বাইরের অনেকগুলো ছোট ছেলেমেয়েদের মাঝখানে। চাঁপার মত সুন্দর রঙ তার উজ্জ্বল আলোতে আরও অপরূপ হয়ে উঠেছিল। গলার সুন্দর চিকণ সোনার হারটা যেন তার গায়ের রংয়ের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় চোখ তুটো তার এদিক ওদিক ঘুরছিল, বিস্ময় পুঞ্জীভূত হয়েছিল তাতে। পানের রসে ঠোঁট তুটো রাঙিয়েও নিয়েছিল সে, পরণের লালশাড়ীর সঙ্গে সেটা এমন খাপ খেয়েছিল যে বলবার নয়। দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল নন্দ।

বেশ মনে পড়েছে। কাজললতা যখন তাকে চিনতে পারল তখনকার কথা। চোখের পলক পড়ছে না তার, নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে বিস্ময়ে, ঠোঁট তু'টো কাঁপছে আনন্দে, অজ্ঞাতে একটু হাসিও যেন খেলে গেল তার মুখে। সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল কাজললতা, পুষ্পরেণুর মত গুঁড়ো গুঁড়ো ঘাম জমে উঠেছিল তার ললাটে, তার নাসিকাগ্রে। দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সারাক্ষণ তারই উপর।

মাঝে কিন্তু একটু বেগ পেতে হয়েছিল নন্দকে। ভীমবেশী যতীশও হঠাৎ দেখে ফেলেছিল কাজললতাকে। তখন ভীম আর অন্যদিকে

তাকায় না, কাজললতার দিকের আসরের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েই শুধু তর্জ্জন গর্জ্জন করে। অর্জ্জুন কিছুতেই ফেরাতে পারে না তাকে, তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলা আরম্ভ করাতে এবং দর্শকেরা ভীমকে ঘুরে দাঁড়াবার জন্য চেঁচানোতে ভীম ফিরে দাঁড়িয়েছিল। সাংঘাতিক।

যাত্রা শেষ হতেই নন্দ সকলের অলক্ষ্যে গিয়ে দাঁড়াল পথের একপাশে।

সকলের অলক্ষ্যে মানে অন্যান্য অভিনেতাদের লক্ষ্য এড়িয়ে, কিন্তু যার লক্ষ্যপথে পড়তে সে চেয়েছিল তার দৃষ্টিকে সে এড়াল না।

সারি সারি দর্শকেরা গুঞ্জনধ্বনি তুলে বিভিন্ন মুখে চলে যাচ্ছিল। অনেকেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল যে গাণ্ডীবধারী মহাবীরটি পথের একপাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

এমন সময়ে এল কাজললতা, সঙ্গে তার মা, বাপ ও আরও কয়েকজন বর্ষিয়সী।

কাজললতা সস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল নন্দর উপর।

নন্দ যেন পার্ট আওড়াচ্ছে কিম্বা কাউকে উদ্দেশ্য করে বলছে এমনি ভাবে বলল—"কাল দুপুরে যাব বিলের ধারে।"

কাজললতা ঘাড় নাড়ল—পরিষ্কার বোঝা গেল সে ঘাড় নাড়ল।

"আসতেই হবে"—নন্দ বলল আকাশের দিকে তাকিয়ে।

কাজললতা আবার ঘাড় নাড়ল, এবার একটু হাসলও। সোনার যে সরু হারটা তার সুগৌর কণ্ঠদেশকে বেষ্টন করে চিক্‌চিক্ করছিল তারি মতন সুন্দর তার হাসি।

আনন্দে নন্দর শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। মহাবীর কর্ণকে বাছা বাছা তীর দিয়ে ভূতলশায়ী করে বিমুগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর অকৃপণ হাততালি ও বাহবাতেও তার এত আনন্দ হয়নি।

প্রান্তরের গান

মধ্যাহ্ন শেষ হতে চলেছে।

চৈত্রের প্রথম ভাগ, খর রৌদ্রে মাটীর উপরকার সব কিছুই যেন মূহ্যমান হয়ে পড়েছে। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। দূরে তাকালে দেখা যায় যে মাটীর উপর থেকে ভাপ উঠছে কাঁপতে কাঁপতে। সেতারের তারে ঝঙ্কার দিলে যেমন কাঁপে তেমনি ভাবে কেঁপে কেঁপে উপর দিকে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোন্ অদৃশ্য সেতারী যেন মধ্যাহ্নের আকাশে তার সেতারে ঘা মারছে। তার সেতারের আলাপ শুনতে শুনতে যেন উদাস হয়ে উঠছে সমস্ত প্রকৃতি।

সেই আলাপ শুনতে শুনতে সুন্দরী বিল যেন ঝিমোচ্ছে।

গ্রামের শেষ প্রান্তে এই সুন্দরী বিল—প্রায় আধ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বিল অধিকাংশ জায়গাতেই শুকিয়ে গেছে। শুকনো জমিতে কচুরীপানা-গুলো বর্ষার স্বপ্ন দেখছে। গ্রামের কাছাকাছি জায়গাটাতে অল্প জল আছে—অজস্র রক্তপদ্মে ভর্তি। রোদ্দুরের তেজে পদ্মগুলোকে বিষন্ন, শুকনো শুকনো মনে হচ্ছে। পদ্মবন থেকে একটা মৃদু সুবাস ভেসে আসছে থেকে থেকে।

বিলের ধারে বাঁশ আর বেতের বন। আশে পাশে নারকেল আর আমজামের গাছও ভীড় করে আছে।

লোকজনের যাতায়াত এদিকে খুব কম। দেখাই যায় না কাউকে।

শুধু মাঝে মাঝে পদ্মফুল আহরণ করার জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে আসে।

কেউ আসে না এদিকে। অন্যদিন যদি বা আসত আজ আর কেউ আসবে না। 'কুরুক্ষেত্রে'র বিরাট ব্যাপারের পর একটু ঘুমোবার ব্যবস্থা না করে চৈত্রের এই খর রৌদ্রের মধ্যে পুড়ে মরতে কেউ আসবে না। আজ সবাই ঘুমুচ্ছে।

কেবল নন্দ জেগে আছে। একটা নারকেল গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে সে বসে আছে। এদিকটায় গাছপালা ঘন, তাই ছায়াও ঘন, শীতল।

মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়া আসে পশ্চিম থেকে। গরম হাওয়া। শুক্‌নো পাতাগুলো সশব্দে উড়তে থাকে। নন্দ চমকে ওঠে। কাজললতা এল নাকি?

রাগ হয় নন্দর। ঘণ্টাখানেক ধরে বসে আছে সে, দুপুর গড়িয়ে চলেছে, বিকেল হতে আর দেরী নেই। কেন আসছে না কাজললতা? সে কি কৌতুক করছে তার সঙ্গে? সারারাত জাগার পর দুপুর বেলায় রোদ্দুরের মধ্যে তাকে বসিয়ে রেখে একটু জব্দ করছে তাকে!

কিম্বা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে কাজললতা। পুরুষমানুষেরা হ্যাংলার জাত, মেয়েদের চেয়ে তাদের গরজই বেশী এই ভেবে সে হয়ত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। বোধ হয় সে নিশ্চয়ই ভেবেছে যে আজ নন্দ ফিরে গেলে আবার কাল আসবেই।

কিন্তু না। নন্দ আর আসবে না। না হয় তার কষ্টই হবে, উদাস মনে হবে, ঘুম আসবে না, তবু সে আর আসবে না। এ খেলা আর তার ভাল লাগছে না। আজ এর নিষ্পত্তি করবে সে। এলেও

করবে, না এলে ত' কথাই নেই। আজ সে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করবে কাজললতাকে—

শব্দ হলো। শুক্‌নো পাতার মর্ম্মরধ্বনি। কার পায়ের চাপে তারা যেন ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। এবার ভুল হবার নয়। মানুষের চলার শব্দ বোঝা যায়। কেউ এসেছে।

নন্দ ফিরে তাকাল। তার চোখের তারা দুটো জীবন্ত হয়ে উঠল অনেকক্ষণ পরে, দেহে জাগল চাঞ্চল্যের একটা ঢেউ।

কজললতা এসেছে।

রাত্রি জাগরণের কালো ছায়া ওর চোখের নীচে, মন্থর গতিতে আলস্যের ইঙ্গিত। বিন্দু বিন্দু ঘামে মুখখানা চক্‌চক্ করছে কাজললতার, ব্লাউজের হাতাও একটু ভিজে উঠেছে। গরমের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে রোদ্দুরের তাতে তার গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে, উনুনের ধারে অনেকক্ষণ বসে থাকলে যেমন হয়। নন্দর হাত দশেক দূরে একটা আমগাছের তলায় এসে দাঁড়াল কাজললতা। এসেই অন্যদিকে মুখ ফেরাল সে, যেন সে জানেই না যে নন্দ বলে একজন লোক কাছাকাছি বসে আছে।

নন্দ রাগ করবে ঠিক করেছে। ঠিক কেন, করবেই, কারণ সে রেগেছে। এত দেরী করার কি কারণ দেখাবে কাজললতা? নন্দও অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

চুপ্‌চাপ্‌।

পশ্চিমের দম্‌কা বাতাসে শুক্‌নো পাতার একটা ঘুর্ণাবর্ত্ত তাদের সাম্‌নে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল।

ঘুঘুর ডাক ভেসে আসছে।

"এতক্ষণে মনে হল আসার কথা? না এলেই পারতে সুন্দরী"

—নন্দ বলল। আরও কয়েকটা কথা, সে এখুনি বলবে, শ্লেষতিক্ত কয়েকটা কথা।

কাজললতা শুনল কথাগুলো। একটু দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল সে। আকাশের ঝলসানো শূন্যতায় যে দু'একটা বাজপাখী উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল তাদেরই ডানার মত বাঁকা তার ভুরু দুটো ক্ষণকালের জন্য কেঁপে উঠল। তারপরেই সে চলতে আরম্ভ করল—যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেইদিকে।

নন্দর অন্যান্য শ্লেষতিক্ত কথাগুলো তামাদি হয়ে গেল। বাড়াবাড়ি হয়ে গেল নাকি? রাগ করা আর হলো না তার।

"চললে যে—বা-রে!"

কাজললতা যেন কিছুই শুনতে পায়নি।

ছুটে গিয়ে কাজললতার পথ আটকাল নন্দ।

"সামনে থেকে সরে যাও"—রাগ করেছে কাজললতা। কিন্তু কেন?

"না—ফিরে চল লক্ষ্মীটি—"

"সরে দাঁড়াও বলছি—ভাল হবে না কিন্তু।"

"মাপ করো লক্ষ্মীটি, পায়ে ধরছি তোমার।" একটুও লজ্জা হলো না নন্দর, একটুও দ্বিধাবোধ করল সে না। সরল বাংলায় 'দেহিপদপল্লব-মুদারম' আউড়ে কাজললতার সাম্‌নে হাঁটু গেড়ে বসে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সে তার পায়ের দিকে।

সারা দুপুর কাজললতা বিলের স্বপ্ন দেখছিল। ভাবছিল কখন সে যাবে সেখানে। সবাই না ঘুমোনো পর্যন্ত কি ভয়ঙ্কর কষ্টটাই তাকে পেতে হয়েছে, ছট্‌ফট্‌ করতে হয়েছে। তা না জেনে, জানবার চেষ্টা না করে, এরকম ব্যবহার করলে কে না চটে? তাই নন্দ যা করল, তাতে হিতে বিপরীত হলো।

তীব্রকণ্ঠে ভৎর্সনা করে উঠল কাজললতা, "ওরকম করলে আর কোনো দিন তোমার সামনে আসব না আমি, সত্যি বলছি"—রাগে তার চোখের উপর জলের একটা হাল্কা আস্তরণ দেখা দিল।

ঘাবড়ে গেল নন্দ। ভয়ঙ্কর।

উঠে দাঁড়াল সে, আমতা আমতা করে বলল, "আচ্ছা, আর ওরকম করব না, কিন্তু তুমি চল"—

মিনিট খানেক গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাজললতা, তারপরে ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে আবার সেই গাছটার নীচে দাঁড়াল।

"বোস"—নন্দ বলল।

কাজললতা নিরুত্তরে ধপ্ করে বসে পড়ল। বোঝা গেল তার রাগ কমেনি। কেন রেগেছে সে?

একটু চুপ করে থাকে দুজনেই।

নন্দ একটু বাদে হেসে জিজ্ঞেস করল, "কাল যাত্রা দেখ্তে গিয়েছিলে?"

কাজললতার ভুরু দুটো আবার কেঁপে উঠল, তার অপ্রশস্ত, সুন্দর ললাটে দু'একটা রেখাও খেলে গেল।

"ন্যাকা সাজছ কেন? তুমি আমায় দেখনি কাল?"

নন্দ হাসল, "পার্ট করতে করতে কি সব দিকে নজর দেওয়া যায়?"

"ড্যাব্ড্যাব্ করে তাকিয়ে ত' ছিলে হাঁ করে।"

নন্দ হাসল।

"হাসতে লজ্জা করে না তোমার"—কাজললতা গ্রীবা উন্নত করে কঠিনকণ্ঠে বলল।

"লজ্জা করবে—কেন?"

"খুব ত' যাত্রা করা হোল—আমায় বলতে কি হয়েছিল?"

"ও এম্নি, তোমায় অবাক করে দেব বলে।"

"ইস্—ভারী তো—যদি না আসতাম ? একটা খবরও যদি না পেতাম ?"

"আমি নিজে লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছি তোমার বাপকে—"

"যদি না আসতাম তবু ?" অভিমানে কাঁপছে কাজললতার গলা।

"তাহলে অর্জ্জুন গিয়ে ডেকে আনত তোমায়—সত্যি বলছি, তোমায় অবাক করে দেবার লোভেই তোমায় বলিনি।"

"হয়েছে—হয়েছে"—

"বিশ্বাস করো কাজল, সত্যি বল্ছি। এ যাত্রা শুধু তোমায় দেখানোর জন্যেই"—

"মিথ্যেবাদী কোথাকার"—

"বিশ্বাস করো কাজল"—কাজললতার দিকে এগিয়ে এল নন্দ। কণ্ঠে তার মিনতি।

কাজললতা নন্দর দিকে তাকাল। খানিকক্ষণ [illegible] থেকে সে চোখ ফিরিয়ে নিল।

"কেমন হয়েছিল কালকে বলত ?"—নন্দ জিজ্ঞেস করল।

"ভাল।"

"কার কার পার্ট ভাল লেগেছে কাল ?"

"ভীম, দুর্য্যোধন, শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী, নিয়তি—আর—"

"আর ?"

"আর ভীষ্ম, শকুনি, গান্ধারী।"

"আর অর্জ্জুন ?" মিহিসুরে প্রশ্ন করল নন্দ। একটু নিরাশ বোধ করছে সে।

খিলখিল করে হেসে উঠল কাজললতা। সে হাসি আর থামতে

চায় না। এতক্ষণ গরমের মধ্যে বসে থেকেও যার কিছু হয়নি কাজললতার হাসি শুনতে শুনতে আর দেখতে দেখতে সেই নন্দরই মুখচোখ এবার লাল হয়ে উঠল।

"বা-রে—হাসছ যে!"

তবুও হাসতে লাগল কাজললতা।

নন্দ অন্যদিকে মুখ ফেরাল। নির্ব্বাপিত দীপের মত তার ভিতরটা উত্তাপহীন হয়ে উঠছে।

হাসি থামাল কাজললতা। দু'তিনবার জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাসির বেগে বিপর্য্যস্ত হৃদ্‌যন্ত্রকে সহজ করে নিয়ে সে বলল, "ভাল লেগেছে—খুব ভাল হয়েছে তোমার পার্ট।"

নন্দর বিশ্বাস হয় না। হয়ত ঠাট্টা করছে কাজললতা।

"হাসি দেখে ঘাব্‌ড়ে গেছ বুঝি? ও হাসি কি তোমার পার্টের জন্য—ও তোমার নিজের বিষয়ে জানবার জন্য আকুলি বিকুলি দেখে। তোমার বিষয়ে কিছু বলছি না দেখে কি দুঃখের ভাব ফুটে উঠেছিল তোমার মুখে—মাগো।"

নন্দ ফিরে তাকাল, "ঠাট্টা করছ!"

"ঠাট্টা? সত্যি না, মাইরি না। সত্যি বলছি, তোমার পার্ট আমার খুব ভাল লেগেছে। শুধু আমার কেন, সব্বাই বলছে। অর্জ্জুন ছাড়া আর কারও কথা কারও মুখে নেই।"

"সত্যি বলছ?" আনন্দে নন্দর চোখের তারা দুটোতে আগুনের মত দীপ্তি দেখা যাচ্ছে।

"সত্যি বলছি। কি সুন্দর পার্ট কর তুমি—আর কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল তোমাকে, উঃ"—উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল কাজললতা। বলেই কিন্তু হঠাৎ লজ্জায় মুখ নত করল সে। একটু বেশী বলে ফেলেছে

সে। যে কথাটা কাল সে সারারাত মুগ্ধচিত্তে স্মরণ করে রোমাঞ্চিত হয়েছে, অধীরে আনন্দে বারংবার শিউরে শিউরে উঠেছে, সেই কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল তার।

কিন্তু সতিই কি তাই? সত্যিই কি কথাটা মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল? কাজললতার অবচেতন মনে এই কথাটা বলার একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা কি জাগেনি?

ডানপায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে নরম মাটিতে আঁচড় কাটছে কাজললতা। পায়ে সে আল্তা পরেছে, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তার পা দুটো।

দেখতে দেখতে নন্দর মাথা ঝিম্ঝিম্ করে। এ ঝিম্ঝিমানি দৈহিক দুর্ব্বলতা নয়—এ একটা বাসনা ও পুলকের, আকুলতা ও ব্যাকুলতার মিশ্রিত দোলা।

"কাজললতা"—স্বপ্নের ঘোরে যেন কথা বলছে নন্দ—টেনে টেনে।

"উঁ?"

"তোমায় ছাড়া আর আমার চলবে না"—

কাজললতা তাকাল পদ্মবনের দিকে, শরীরটা তার যেন কেঁপে উঠল একবার।

"তোমায় ছাড়া আমার বাঁচাই হচ্ছে মরা আর মরাই হচ্ছে বাঁচা"—আবেগে থরথর করে কাঁপছে নন্দর গলা।

"কি সুন্দর পদ্মফুলগুলো।"—কাজললতা বলল।

"কাজল—"

"আমায় দুটো পদ্ম তুলে দাও না"—দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলছে কাজললতা।

থামতে হল নন্দকে। মনে মনে একটু রাগ হয় কাজললতার এই

আচরণে। তার কথাগুলো একটু কাণ দিয়ে শুনলে কি হত্ত মেয়েটার! নেশা জমে আসতে আসতে, ঘুমে চোখ বুজে আসতে আসতে হঠাৎ বাধা পেলে, তা ভেঙ্গে গেলে যেমন মনে একটা বিরক্তিকর অনুভূতি জাগে, তেমনি অবস্থা হল নন্দর।

কিন্তু আপাততঃ পদ্মফুল তুলতে হবে। যাই হোক তবু ত' একটা আব্দার করেছে কাজললতা। প্রথম আব্দার। ভয়ঙ্করভাবে রাগবার উপায় থাকে না নন্দর।

জলের মধ্যে সে পা ডোবাল। ইচ্ছে এই যে ঐ শ্যামাঘাস, বনকলমী আর কাদা ঠেলে সে বেছে বেছে কতকগুলো পদ্ম তুলে আনবে।

"কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"—কাজললতা সন্ত্রস্তভাবে প্রশ্ন করল।

"জলে—ফুল তুলতে।"

"জলে নামতে হবে না।"

"বা-রে, ফুল পাব কি করে তবে?" নন্দ বিস্মিত হল।

"তা আমি কি জানি—তীর থেকেই কি ফুল তোলা যায় না?"

"ও ফুল ছোট।"

"হোক—বড় ফুলের জন্য এখন ঐ কাদা আর জঙ্গলের মধ্যে নেমে সাপের কামড় খেতে হবে না।"

কাজললতা নন্দর নিরাপত্তার বিষয়ে ভাবে তাহলে! তাকে সাপে কামড়াতে পারে ভেবে সে রীতিমত ভয় পেয়েছে, আশঙ্কায় আকুল হয়ে সে তাকে বাধা দিচ্ছে, কড়া স্বরে নিষেধ করছে জলে নামতে! বেশ লাগে নন্দর, সে খুশী হয়ে ওঠে।

তবু আরও একটু চলুক এই ভাবনার পালা।

"সাপ?"—নন্দ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।"

"বয়ে গেছে—তবু যাব। আমি মরে গেলেই বা কি"—মুখ চোখে একটু বিষন্নতার ছায়া টেনে এনে নন্দ বলল। বলেই আর এক পা এগিয়ে গেল জলের মধ্যে।

"ভাল হবে না কিন্তু—" চেঁচিয়ে বলল কাজললতা। তুচোখ তার জ্বলে উঠছে।

"থাক্ তবে"—নিস্পৃহতা ধ্বনিত হল নন্দর কণ্ঠে।

দূরে একটা কঞ্চি পড়ে ছিল, তাই দিয়ে সামনের তুটো পদ্ম-ফুলকে টেনে তুললো নন্দ। তুটোর মধ্যে একটা কলি।

"গ্রহণ করুন দেবী"—যাত্রার অর্জ্জুন যেন কথা বলছে, ফুল তুটোকে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে নিয়ে।

একটু হাসল কাজললতা। নন্দর হাত থেকে ফুলতুটো তুলে নিল সে, কিন্তু অত্যন্ত আল্‌গাভাবে। নন্দর স্পর্শকে এড়িয়ে গেল সে।

ফুলতুটোকে নাড়াচাড়া করতে লাগল কাজললতা। একবার মুখের কাছে নেয়, একবার আঘ্রাণ নেয়, একবার গালের উপর দিয়ে বুলিয়ে নেয়।

নন্দ তাকিয়ে থাকে তার দিকে। রক্তপদ্মের স্পর্শ লেগেছে কাজললতার গালে, কপালে, ঠোঁটে। নীচের ঠোঁটের বাঁ দিকের কোণটা উপরের দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে সে। চাপের চোটে তা আরও লাল হয়ে উঠেছে। মনে হয় এখুনি হয়ত লাল রক্ত ফেটে বেরোবে পাকা আঙ্গুরের রসের মত।

হারানো নেশাটা আবার যেন ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। সমস্ত চেতনাকে তোলপাড় করে একটা ঝড় উঠছে। বুকের মধ্যে, কপালের তুপাশের রগে, শরীরের সমস্ত শিরার মধ্যে সেই আসন্ন ঝড়ের বার্ত্তা যেন ছড়িয়ে পড়ছে পলে পলে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সে কাজললতাকে। নন্দর স্বপ্ন, তার বাসনা মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। কাজললতার সুগৌর বর্ণচ্ছটার দিকে তাকাতে তাকাতে চোখে ধাঁধা লাগে নন্দর—সূর্য্যের আলোর দিকে চাইলে যেমন হয়। বঙ্কিম ভুরু, প্রজাপতির পাখ্‌নার মত ঠোঁট দুটো, পদ্মের ছায়ার মত কালো দুটো চোখ, নিটোল দুটো হাত, উন্নত বক্ষের উদ্ধত আত্মপ্রকাশ, ক্ষীণ কটিদেশ, সমস্ত দেহের রেখায় রেখায় একটা অপরূপ লীলায়িত ছন্দ—কোনো প্রতিভাবান ভাস্করের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যেন জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে নন্দর সাম্‌নে।

শুধু নেশা নয়—নেশায় বেসামাল হয়ে গেল নন্দ। যে নিষ্পত্তি আজ সে করতে চেয়েছিল আপনা থেকেই সেটা এখন সহজ হয়ে এল।

"কাজললতা—"

"উঁ ?"

"এবার আমার কথার জবাব দিতে হবে।"

"কি ?"

"তোমায় ছাড়া আমার চলবে না।"

কাজললতার কোমর ছাড়িয়ে যে একরাশ চুল নীচে নেমে গেছে দম্‌কা হাওয়ায় তারা উড়তে থাকে। দু'একটা চূর্ণ কুন্তল এসে তার ললাটে পড়ল। কলঙ্কযুক্ত চাঁদের মত তাতে অপরূপ হয়ে উঠল তার মুখশ্রী।

"কাজললতা"—থর থর করে কাঁপছে নন্দ। কাজললতার হাতের দিকে সে হাত বাড়াল।

"আমায় ছুঁয়োনা"—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল কাজললতা।

নেশাখোর আর পাগলে কি সব কথা গ্রাহ্য করে ?

কাজললতার কথা যেন নন্দর কানে যায় নি। তার হাত দুটো সে চেপে ধরল।

"আমি তোমায় ভালবাসি কাজললতা—তুমি ?"

"ছেড়ে দাও আমার হাত"—চোখ দুটো জ্বলছে কাজললতার। সেটা কি রাগ ?

"না। বল, তুমি কি আমায় ভালবাস না ?" নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ছে নন্দর, উত্তেজনায় চোখ দুটো ছল্ ছল্ করছে।

"ছেড়ে দাও বলছি"—এবার ভাঙ্গা গলায় মিনতি জানাল কাজললতা।

"না।" দৃঢ় কণ্ঠে নন্দ উত্তর দিল।

কাজললতারও সারা শরীর কাঁপছে। সে বসে পড়ল মাটির উপর—দমকা বাতাসের উদ্দাম বেগে দুর্ব্বল নব-মালতী লতা যেমন মাটিতে এলিয়ে পড়ে তেমনি ভাবে।

"বল"—নন্দ জিজ্ঞেস করল কাঁপতে-কাঁপতে। তার হাতের মুঠোয় কাজললতার হাত দুটো। একরাশ ফুলকে যেন চেপে ধরেছে সে। তারও হাত কাঁপে।

"বল কাজললতা—তুমি কি আমায় ভালবাস না ?"

কাজললতা মাটির দিকে চেয়ে আছে।

"বল"—

কাজললতা এবার মাথা নাড়ল।

"জোরে বল—জোরে"—

কি যেন অস্ফুট কণ্ঠে বলল কাজললতা। তাই যথেষ্ট। তার মানে হ্যাঁ। হ্যাঁ, সেও নন্দকে ভালবাসে। সে ত ভালবেসেছিল নন্দকে প্রথম দিন থেকেই। এতদিন সে কেবল ধরা দেয়নি কারণ নন্দ ত' তাকে এমন দুর্ব্বলভাবে রোজ পায়নি কাছে। ধীরে ধীরে তার মন নরম হয়ে আসছিল কয়েকদিন ধরে—বৈশাখের আতপ-শুষ্ক মাটি যেমন বৃষ্টিধারায় ক্রমে ক্রমে সিক্ত হয়, নরম হয়। গতকল্যকার মহাবীর অর্জ্জুন তাকে

একেবারে জয় করে ফেলেছে। রাতের বেলায়, আলোয় ঝলমল সামিয়ানার নীচে, ঝক্‌ঝকে পোষাকপরা শ্রীমণ্ডিত বীরের অপূর্ব্ব ভঙ্গী আর সুমধুর কণ্ঠস্বর তার নবীন যৌবনের স্বপ্নের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে তাকে বিমুগ্ধ, তাকে দুর্ব্বল, তাকে বিজিত হবার জন্য প্রেরণা জাগিয়েছিল। আর ত' দূরে থাকা যায় না।

"আমায় বিয়ে করবে কাজললতা ?"

কাজললতার মাথা যেন ক্রমশঃ নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

"বল"—

উত্তর নেই।

"বল—বল লক্ষ্মীটি, বল—"

"হ্যাঁ"—

ঝড় এসে গেছে। বাঁধ ভেঙ্গে গেল।

অধীর আগ্রহে, সুবিপুল আনন্দ-বন্যায় প্লাবিত হয়ে কাজললতাকে নন্দ বুকের মধ্যে টেনে নিল। অন্তরের বহ্নিজ্বালায় জর্জ্জর ওষ্ঠদ্বয়কে সে কাজললতার মুখের কাছে এগিলে নিল।

"না—না"—বাধা দিল কাজললতা। নারীর একটা অতি পুরাতন রীতি। সে বাধা কে মানে ?

"হ্যাঁ।"

"না—কেউ দেখবে"—কাজললতার চোখ নীমিলিত।

"কেউ যেখানে কোনোদিন আসেনা ?"—নন্দ হাসল।

প্রথম চুম্বন। জ্বালাময়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। শরীর শিউরে উঠল দুজনের। পায়ের নীচের মাটীও যেন অসহায় পুলকে কাঁপছে।

পশ্চিমের অশান্ত বাতাসের দুর্দ্দম বেগ। শুকনো পাতার ঘুর্ণি ওঠে।

ধুতুরা ফুল আর আকন্দ ফুলগুলো মাটীতে লুটিয়ে পড়ে। বাঁশঝোপ আর আম জামের বনে একটা সাড়া জেগেছে—কে জানে কি বার্ত্তা পেয়েছে তারা পশ্চিমা বাতাসের কাছে। রৌদ্রের প্রাখর্য্য কমে আসছে, শঙ্খচিল আর বাজপাখীর ডানা ঝলসায় ধূসরনীল আকাশের শূন্যতায়। পদ্মবনের ওপাশে, একটু ছায়ায়, তিনচারটে বক মাছের স্বপ্নে বিভোর। সবই সুন্দর। সবই বিচিত্র রঙে রঙীন। বসন্তের অলোপ গাইছে সব কিছু। চেতনায় একটা সুনিবিড় শান্তি নেমে আসে। একটা সুগভীর তৃপ্তি।

কাজললতার কালো চুলের রাশিতে চুম্বন করে নন্দ বলল, "কি সুন্দর তোমার চুলগুলো কাজললতা! কাহ্লা রাত এসে বাসা বেঁধেছে বুঝি এখানে?"

কাজললতা আর চোখ মেলবে না। লজ্জায়, আনন্দে সে মূহ্যমান, অবশ। কোথায় ছিল এত আনন্দ! অনুভূতির এমন উগ্র মাধুর্য্য! চোখ মেলতে আজ আর সে পারবেনা।

নন্দর মনে আর সুখ নেই। নেই স্বস্তি, নেই শান্তি।

কাজললতার সঙ্গে কয়েকদিন ধরেই পরামর্শ হয়েছে। বিয়ে তাদের শিগ্‌গীরই হওয়া চাই। কিন্তু কি করে? নন্দর বাপ রাজী হবে—নন্দ চেনে তার বাপকে। কিন্তু গৌরদাস শক্ত লোক। তাকে ধরবে কে, বলবে কে? নন্দ নিজেই গিয়ে বলতে চেয়েছিল, কাজললতা নিষেধ করেছে। কাজললতাও ত' চেনে তার বাপকে। সে জানে গৌরদাসের অহঙ্কার আছে, পুরোনো জাঁকজমকের গৌরববোধ আছে। হয়ত সে রাজী হবে না। তাছাড়া গ্রাম দেশ, নন্দর অমন সহুরে সাহস বরদাস্ত করবে না গৌরদাস।

সুতরাং কি উপায় হবে? কাজললতা বলেছে যে হরিচরণ যেন নিজেই তার বাপকে বলে।

তা কি হয়? পাত্রের পিতা যেচে বলবে প্রথমে? অবশ্য নিজে যেচে না বললেও চলবে, অন্য কাউকে পাঠালেও হবে।

যেই যাক, হরিচরণকে জানাতে হবে ত' কথাটা। কি করে বলবে তা সে?

ভাবনায়, চিন্তায় নন্দর মুখকে মলিন দেখায় আজকাল, দু'একটা অস্পষ্ট রেখাও মাঝে মাঝে জেগে ওঠে তার ললাটে।

বড় ভাবনা। রাতে ভাল ঘুম হয় না। দিনের বেলা সারাটা সময় এদিকে ওদিকে, বাঁশঝোঁপে, খালপাড়ে, ধলেশ্বরীর ধারে, একা একা সে ঘুরে বেড়ায়, বিকেল হলেই তেতুলঝোরায় গিয়ে হাজির হয়। সারাক্ষণ এক চিন্তা।

কাকে দিয়ে বলে সে তার বাপকে? প্রবীর? উঁহু, প্রবীরকে মনে মনে একটু ভয় করে নন্দ। অর্জ্জুন? না লজ্জা করবে। মা? পাগল। মনোরমাকেও না। মাধবী? মাধবীটাকে হয়ত বলা যেতে পারে। হুঁ, ঠিক। মাধবী বলবে মাকে। মা বলবে বাবাকে। ব্যস্, হয়েছে। একটা দুর্ভাবনা গিয়ে অনেকটা হাল্কা মনে হয় নন্দর।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা সমস্যা এসে সামনে দাঁড়ায়। সুবিধে মত সময় পায় না মাধবীকে কথাটা জানাতে। হুট্ করে ডেকে বলতে বাধে নন্দর। হাজার হোক ছোট বোন ত'।

মাধবীকে বলার চিন্তাটা মনে উদিত হতেই নন্দ আর বাইরে যায় না, সবসময়েই বিছানাটার ওপর শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করে, সুযোগের অপেক্ষায়।

যে সুস্থ লোকটা এতদিন নিয়ত আড্ডা দিয়ে বেড়িয়েছে, খাবার আর

শোবার সময় ছাড়া যাকে ক্বচিৎ কদাচিৎ বাড়ীতে দেখা গিয়েছে তাকে এমন ভাবে ওপরের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলে বাড়ীর লোকের মনে প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। নন্দর কি অসুখ হয়েছে কোন? না, অসুখ হলে মানুষ খাওয়া বন্ধ করবে, ওষুধ খাবে। নন্দ তো তা করছে না। তবে?

হুঁকোয় একটা লম্বা টান্ মেরে হরিচরণ রাসমণিকে শুধোয়, "হ্যাঁগা, ব্যাপার কি বলো দেখি?"

"কিসের ব্যাপার?"

"নন্দর হয়েছে কি? ক্ষেতে টেতে গিয়ে জমিটা একটু ঠিকঠাক কর্‌তে হয়, চত্তির মাসের শেষ হতে আর কদিনইবা—তা ত' যায়ই না, অন্য কোথাও যায়না কদিন ধরে। কি হল ছেলেটার?"

"কি জানি বাপু। আমি কিছু বুঝি না ওর ধরণ ধারণ।"

হরিচরণ চুপ করে তামাক টানতে থাকে।

রাসমণি আবার রান্না করতে করতে মনোরমাকে ডাক দেয়, "মানু—"

"এ্যা?"

"তোর দাদার কি হয়েছে রে, দিনরাত শুয়ে থাকে খালি?"

মনোরমা গৃহস্থালী নিয়ে মস্‌গুল, ওর ভাববার অবসর নেই, "কি জানি মা, তোমার কচি ছেলে, ওদের মেজাজই আলাদা বাপু।"

তবু মনোরমা এক সময়ে মাধবীকে ডেকে চুপি চুপি প্রশ্ন করে, "আচ্ছা মাধু, তুই কিছু জানিস?"

"কি?"

"দাদা ওরকম শুয়ে শুয়ে কাটায় কেন?"

"আমিও ত' তাই ভাবছি রে দিদি"—মাধবী খানিকটা আঁচ্ করতে

পারে নন্দর ব্যাপার। মানুষকে উদাস, কর্ম্মবিমুখ, দুর্ব্বল করে দেয় কিসে—তার অভিজ্ঞতা সে লাভ করছে দিন দিন।

"বুঝ্‌লি দিদি—"

"কি ?"

"দাদা নিশ্চয়ই কাউকে ভালবেসেছে।"

"দূর্‌ মুখপুড়ী—"

"বিশ্বাস হচ্ছে না ? আচ্ছা আমি সব জানতে যাচ্ছি।"

"ইস্‌, দাদা যেন তোকে সব খুলে বলবে।"

"দায়ে পড়লে বলতেও পারে রে, এক আধটা চিঠিপত্র দিয়ে আসবার লোকের দরকারও পড়তে পারে ত—"

"তুই কি রে!"

দু'বোনে হাসাহাসি করে।

মাধবী কিন্তু থাম্‌ল না।

দুপুর বেলায় সবাই সেদিন ঘুমোচ্ছে। প্রবীরের দেওয়া বইটা শেষ করে সে ভাবছে কি করবে, এমনি সময়ে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

নন্দ ঘুমোয় নি, বসে বসে বিড়ি টানছিল।

"দাদা—"

"উঁ—"

"কি ভাবছ ?"

"কিছু না তো—"

"তা হয় না, মানুষ সব সময়েই কিছু না কিছু ভাবে।"

নন্দ সুযোগ পেয়েছে।

"আমি জানি কি ভাব্‌ছ তুমি।" মাধবী মুখ টিপে হাসল।

"কি ?"

"কাকুর কথা।"

"কার কথা ?"

"বৌদি'র কথা।"

"কোন্ বৌদি'র কথা রে ?" নন্দ বুঝতে পারে না।

"কোন্ বৌদি আবার, আমার দাদা নন্দলাল দাসের বৌ—সেই বৌদি'র কথা।"

"বিয়ে করলাম না বৌ হল কোথেকে রে ?" নন্দ হাসল।

"সেই ত' হচ্ছে কথা—সেই ভাবী বৌদি কবে এসে ঘর আলো করবে, তোমার মুখের আঁধার দূরে যাবে তাই ভাবছ তুমি।"

নন্দ মাথা নাড়ল, "তাই রে, ঠিক তাই"—এবার বলা উচিত, আর দেরী করা উচিত'না।

"মানে ?"

নন্দ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাকাল বোনের দিকে, "মাধু—"

"কি বলছ ?"

"সত্যি কথা শুনবি ?"

"কি ?" মাধবী উৎসুক হয়ে উঠল।

"বিয়ের কথাই ভাবছি।"

"সত্যি ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু যাকে তাকে বিয়ে করব না আমি—"

"কাকে বিয়ে করবে ?"

"তেতুলঝোরার গৌরদাসের মেয়ে কাজললতাকে—নাম শুনেছিস ওদের ?"

"গৌরদাসের নাম শুনেছি।" মাধবী হেসে বলল।

"একটা কাজ করবি ?"

"কি ?"

"মাকে কোনও রকমে কথাটা জানা যাতে বাবা জানতে পারে।" নন্দর কণ্ঠে মিনতির রেশ।

"বলব দাদা।"

"বলবি যত শিগ্‌গীর হোক বাবা যেন এ বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়।"

"আচ্ছা।" মাধবী হসে চলে যাচ্ছিল।

"শোন্—"

"কি ?"

"বাইরের আর কাউকে কিন্তু বলিস না কিছু, কেমন ? এবার আমি বাইরে চল্লাম, সন্ধ্যের পর ফিরব, এর মধ্যে সব ঠিক করে ফেলা চাই।"

"আচ্ছা দাদা—কি রকম দেখতে বৌদি ?" কৌতূহল উপ্‌চে পড়ছে মাধবীর চোখে মুখে। কে সে ভাগ্যবতী লীলাবতী, কেমন দেখতে সেই কন্যা যে তার দাদার মত সুপুরুষকে মুগ্ধ করেছে, জয় করেছে ?

"ঘরে এলেই দেখতে পাবি"—নন্দ হেসে উঠে দাঁড়াল।

গুন্‌গুন্ করে একটা গান ভাঁজতে ভাজতে সে বেরিয়ে গেল।

"দিদি—এই দিদি—এই—"

মনোরমা ঘুমোচ্ছিল, মাধবী তাকে ঠেলে জাগাল।

"কি হোল ?" মনোরমা বিরক্ত হয়ে জাগল।

"শোন্, বাইরে আয়—"

"কি আবার হোল ?"

বাইরে গিয়ে দাওয়ার উপর দাঁড়াল তারা।

"যা বলেছিলুম তাই"— মাধবী ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

মাধবীর ভঙ্গী দেখে মনোরমার মনেও ঔৎসুক্য জাগে, "কিরে ?"

"দাদা ভালবেসেছে—তেতুলঝোরা গাঁয়ের গৌরদাসের মেয়ে কাজললতাকে।"

"নামটা ত' বেশ রে"—মনোরমা হাসল, "তোকে দাদা বলল?"

"হ্যাঁ—আর বলল মাকে বলতে যাতে বাবা জান্তে পায়, শিগ্‌গীরই বিয়ে হওয়া চাই।"

মনোরমা মুখে আঁচল চাপা দিল, "অবস্থা সাংঘাতিক তাহলে—তর সইচে না।"

"হ্যাঁ—চল্ মাকে বলিগে।"

"চল্।"

রাসমণি রান্নাঘরের বারান্দায় বসে মুড়ী ভাজার চাল ঝাড়ছিল।

"মা"—মনোরমা ডাকল।

রাসমণি মুখ তুলে তাকাল।

"দাদার আজকাল এরকম কেন হয়েছে জান?"

"কেন রে?" রাসমণি যুগপৎ কৌতূহলান্বিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠল।

"তেতুলঝোরা গাঁয়ের গৌরদাসের মেয়ে কাজললতার সঙ্গে বিয়ে না হলে দাদা বিবাগী হয়ে যাবে। বাবাকে বলো আজই, বুঝলে?"

রাসমণির চোখে বিস্ময়, আনন্দ।

"সত্যি?" সে বলল।

"হ্যাঁ মা।"

ছেলের উপর অগাধ ভালবাসা রাসমণির, অপরিসীম গর্ব্ব তার মনে ছেলের জন্য।

"বলো কিন্তু বাবাকে মা —"

"বলব রে বলব—কিন্তু কে বললে এসব কথা?"

"যার গরজ সেই।"

"নন্দ ?"

"হ্যাঁ।"

হরিচরণ বাড়ী ছিল না। রাসমণি ছটফট করে তাকে সব কথা জানাবার জন্য।

অবশেষে দুপুর পড়ে আসতেই হরিচরণ বাড়ী ফিরল।

"কোথায় থাক বলত ?" রাসমণি বিরক্ত হয়ে বলল।

"কোথায় আর থাকব, একটু কাজে গিয়েছিলাম।"

"শোন, কথা আছে।"

"দাঁড়াও, আগে একটু জিরোই, একটা পাখা দাও।"

হাতপা ধুয়ে হরিচরণ বসল, রাসমণি একটা পাখা নিয়ে এসে তাকে বাতাস করতে আরম্ভ করল।

"কি বলছ ?" হরিচরণ শুধোল।

"মেয়েদের বিয়ের কথা তা' ভাবছই না—ছেলেটারও কি বিয়ে দেবে না ?"

"দেখ নন্দর মা, তোমার কথার ধরণ ভাল না।"

আড়ি পেতে শুনতে শুনতে মাধবী মনোরমার গা টিপল। বাপ বাড়ী আসতেই ওরা বুঝতে পেরেছিল যে মা এখুনি কথাটা পাড়বে। তাদের মায়ের পেটে কোন কথা বেশীক্ষণ থাকতে চায় না, এটা ওরা জানে।

"কেন ?" রাসমণি ঠোঁট উলটাল।

"মেয়েদের বিয়ের জন্য চেষ্টায় নেই আমি ? মানুকে দেখতে আসছে সামনের সোমবার, মাধুর জন্যও খোঁজে আছি। নন্দর বিয়ের জন্য আটকাবে না কি ? ও ত' পুরুষ মানুষ, তা ছাড়া আমার ইচ্ছে মানুর বিয়ের পর ওর আর মাধুর বিয়ে একসঙ্গে দেব।"

"হয়েছে, অত দেরী করলে আর চলবে না।"

"কেন?"

"শিগ্‌গীরই যদি তেতুলঝোরায় গৌরদাসের মেয়ে কাজললতার সঙ্গে তার বিয়ে না দেও তবে ছেলে তোমার বিবাগী হয়ে যাবে।"

হরিচরণ হাসল, "কে বল্লে?"

"কে আবার বলবে, তোমার ছেলেই বলেছে।"

"হুঁ, গৌরদাস, মানে গৌরদাস ঘোষ, চিনি ত' তাকে।"

"তুমি ঘটকালি করাও।"

"বরের বাপ যেচে যাবে?"

"তাতে কি—দায়ে পড়েছ—কাউকে পাঠাও তুমি।"

"দায় না হাতী, হুঁ—, মেয়েটা দেখতে কেমন?"

"তোমার ছেলে ত' কুচ্ছিৎ নয়, তার মনে ধরেছে যখন তখন নিশ্চয় সুন্দরী।"

"বটে—ওরে মাধু"—

মাধবী দরজার আড়াল থেকে মুখ বাড়াল—"এ্যাঁ?"

"হুঁকোটা সেজে আন্‌ ত' মা।"

তামাক টান্‌তে টান্‌তে গম্ভীর মুখে হরিচরণ ভাবতে আরম্ভ করল। ছেলেটা শেষে প্রেম করে ফেলল। দিন কাল বদলে গেছে, সত্যি। বেহায়ার মত মুখ ফুটে জানিয়েছে যে কাজললতাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়েই কর্ব্বে না, বিবাগী হয়ে যাবে! নির্ল্লজ্জ। তবু সঙ্গে সঙ্গে অতীত দিনের কথা মনে পড়ে হরিচরণের, যৌবনের কথা। একই ইতিহাস, শুধু প্রকাশের ভঙ্গীটাই বদলেছে। আর সবই এক, চিরন্তন। হরিচরণের সাধারণ মনের অন্তরালে একটা রসিক মন প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, সেটা মাথা চাড়া দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠল আজ। মান সম্মান, সামাজিক

আদবকায়দা ! কোন্‌টাই বা ঠিক আছে আজকাল ? সবই ত' ভেঙ্গে যাচ্ছে। একটু মান যায় তো যাক না, ছেলেটার বিয়ের ব্যবস্থাটা করতেই হবে। নিজেদের জীবনে যে অমৃত লাভ হয়নি, ছেলের জীবনে তা সফল হোক। যতই সকলে নাক সিঁটকাক্‌, মুখে তারা যাই বলুক, মনে মনে কে না স্বীকার করে যে পৃথিবীতে প্রেমের চেয়ে বড় কিছুই নেই।

হরিচরণের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

হরিচরণ উঠে দাঁড়াল।

"কোথায় চল্লে আবার ?" রাসমণি প্রশ্ন করল।

"শিবেশ্বরের কাছে।"

শিবেশ্বর পাল অর্জ্জুনের বাবা। পিছনেই তাদের বাড়ী। শিবেশ্বর বয়সে হরিচরণের থেকে দু'একবছরের ছোট হলেও সেই তার বড় বন্ধু। কোনও কিছু করতে গেলেই শিবেশ্বরের পরামর্শ তার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

ঘণ্টাখানিক পরে হরিচরণ আবার ফিরে এল।

"শুনছ—অ' নন্দর মা ?"

"কি ?" রাসমণি কাছে এসে দাঁড়াল।

"শিবেশ্বরকে বলে এলাম নন্দর বিয়ের কথা। অত সব বলিনি, খালি বলে এলাম যে গৌরদাসের মেয়েকে দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে, ওর সঙ্গে কোনও প্রকারে নন্দর বিয়েটা ঘটিয়ে দাও। সে রাজী হয়েছে, পরশুদিন সে যাবে গৌরদাসের কাছে।"

রাসমণি খুব খুশী হয়ে উঠল, "বেশ করেছ।" মনশ্চক্ষে সে দেখতে লাগল যেন একটি কিশোরী রূপসী নববধূ এসে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়েছে তার সাম্‌নে, তাকে মা বলে ডাকছে, এঘর ওঘর চলতে ফিরতে তার পায়ের মল (রাসমণির যৌবনকালে ওসবের খুব রেওয়াজ ছিল) ঝম্‌ ঝম্‌ করে বেজে উঠছে। ভাবতে বেশ লাগে তার।

নন্দর ফিরতে বেশ রাত হল।

হরিচরণ বাড়ী ছিল না, আখড়ায় গিয়েছে সে।

নন্দর ডাক্ শুনে মাধবী ছুটে এল।

দরজা খুলেই সে সুর করে বলল—

"ডালিমগাছে পক্ষী নাচে,
তাক্ ডুমাডুম্ বাদ্যি বাজে,
হেই দাদা তোর পায়ে পড়ি,
বৌ এনে দে খেলা করি।"

নন্দ হাসল, "মানে?"

"মানে সব আল্ রাইট"—

"অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন—আস্তে বল্তে পারিস না?"

"আস্তেই বলছি বাপু, আর এত লজ্জাই বা কেন?"

"বল্না কি হলো?" আগ্রহ ধরা পড়ে যায় তার কণ্ঠস্বরে।

"কি আবার হবে? আমি বল্লাম দিদিকে, দিদি বল্ল মাকে, মা বল্ল বাবাকে আবার বাবা বল্ল গিয়ে শিবেশ্বর কাকাকে। শিবেশ্বর কাকা পরশুদিন যাবে তেতুলঝোরায় গৌরদাসের মেয়ে কাজললতার সঙ্গে মাধবীর দাদা নন্দলালের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কথা বলতে। তারপর রাঙা বউ ঘরে আসবে, আমরা বৌদির সঙ্গে খেলা করব। তারপর"—

"হয়েছে—থাম্ দেখি"—নন্দর মুখ আনন্দে, লজ্জায় একটু লালচে দেখাচ্ছে, চোখে তার ঔজ্জ্বল্য ঘনিয়ে এসেছে।

"থাম্ব কি? কি দেবে এবার বল।"

"কি আবার দেব—একটা রাঙা বৌদি এনে দেব, খেলা করবি।"

"ইস্, তা বললে চলছে না।"

"আচ্ছা আচ্ছা, ভেবে দেখব,' এখন যা। খেতে দিবি? ক্ষিদে পেয়েছে।"

"ক্ষিদে পায় তবে? হ্যাঁ দাদা, ক্ষিঁদে পায়?"

"বড় ফাজিল হয়েছিস্, মুখপুড়ী—"

রাত্রে আর ঘুম আসে না। উত্তেজনায় ছট্‌ফট্ করে নন্দ। পরশু! পরশু কেন আবার? কালকেই কি শিবেশ্বরকাকা যেতে পারে না? যত্ত সব—।

মাধবীরও ঘুম আসে না। দাদার বিয়ের কথা ভাবে সে। তার দাদা ভালবেসেছে কাজললতাকে। তাকে বিয়ে না করলে তার চলবে না। তাই মুখ ফুটে সে লজ্জার, বাধা অতিক্রম করে জানিয়েছে যে সে বিয়ে করবে সেই মেয়েটিকে। প্রবীর কি বলতে পারে না তারিণী জ্যাঠাকে অম্‌নি করে যে সে হরিচরণ দাসের মেয়ে মাধবীকে বিয়ে করবে, মাধবীকে ছাড়া তার দিন আর চলবে না?

নন্দ সকালে উঠেই অর্জ্জুনের বাড়ী গেল।

"কি খবর রে নন্দ?"

"এই এম্‌নি এলাম একবার—"

"আজকাল তো তোর দেখাই পাওয়া ভার, কোথায় থাকিস?"

"এদিক ওদিক ঘুরি আর কি।"

"সেদিন তোদের যাত্রা ফাষ্টো কেলাশ হয়েছিল রে"—হঠাৎ একটু হেসে সে নিম্নকণ্ঠে বলল, "যাত্রা করতে গিয়েই বুঝি মন মজিয়েছিস্ ?"

নন্দ হাসল।

"বাবার কাছে শুনলাম যে পরশু দিন তেতুলঝোরায় যাবে তোর সম্বন্ধ ঠিক করতে।"

নির্ল্লজ্জের মত নন্দ বলে ফেলল, "মাকে দিয়ে একটু বলাস্, শিবেশ্বর কাকা যেন বেশ ভাল করে গৌরদাসকে বলে। রাজী করাতেই হবে বুঝলি ?"

অর্জ্জুন চোখ বড় করল, "সক্কালে উঠেই এই জন্য এসেছিস্! দূর্ গাধা—"

নন্দ মাথা নাড়ল, "প্রেমে পড়লে বুঝবি কি জ্বালা রে ভাই—"

"প্রেমে পড়তে ত' চাই—কিন্তু তোর মত ভাল বরাত নয় রে ভাই।"

দুজনেই হাসল।

"আচ্ছা আচ্ছা বলবখন্, কিন্তু আসল ব্যাপার খুলে বল ত' যাদু—আরও কাহিনী আছে নিশ্চয়ই।"

"শুন্‌বি ?"

"হ্যাঁ—"

"কাউকে বলবি না দিব্যি কর।"

"বলব না।"

নন্দ সব খুলে বলল। একেবারে প্রথম থেকে।

সব শুনে অর্জ্জুন বলল, "জীতা রহো বাবা—লে বিড়ি খা।"

"বাবাকে বলাবি, বুঝলি ?"

"আচ্ছা, আচ্ছা। নে, চল্ দেখি, আমি দোকানে যাব।"

একটা ছোট্ট লোহালক্কড়ের দোকান আছে অর্জ্জুনের। পরিবারে

লোক অনেক, অবস্থাও ওদের খুব স্বচ্ছল নয়। তবু অল্প জমি আছে আর এই দোকান। চলে যায় কোনমতে।

"চল্।"

দুজনে বেরোল।

নন্দ বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকল। একটু আশ্বস্তবোধ করছে সে।

অর্জ্জুন চলল আখড়ার দিকে। প্রবীরদের বাড়ীর দিকের রাস্তাটা থেকে একটা শাখা আখড়ার পিছন দিয়ে চলে গেছে সেই দিকে। সেখানে কার কাছে দুটো টাকা পাওনা আছে ওর।

প্রবীরদের বাড়ীর রাস্তায় পড়তেই সে মাধবীকে দেখতে পেল।

"মাধু—কোথায় যাচ্ছিস্‌রে?" সে হেসে বলল।

মাধবী থমকে দাঁড়াল, একটু থতমত খেল সে। সকালবেলা উঠেই তার প্রবীরকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। দুদিন ধরে সে প্রবীরের দেখা পায়নি। মনে হচ্ছে যেন কত যুগ দেখেনি। বই দুটো ফেরৎ দেবার অছিলায় সে যাচ্ছিল প্রবীরকে দেখতে। কিন্তু সত্যি কথা কি সব সময় সকলকে বলা চলে?

"এই—এই যাচ্ছি একটু কমলাদের বাড়ী অর্জ্জুনদা।" বই দুটোকে আঁচলের নীচে লুকোল মাধবী।

"ওঃ—"

অর্জ্জুন তাকিয়েছিল মাধবীর মুখের দিকে। ছোটবেলা থেকেই ত' সে মাধবীকে দেখে আসছে। বাড়ীর পাশেই বাড়ী। তাদের বাড়ীতে যায়ও সে। মেয়েদের নিয়ে সে বেশী মাথা ঘামায় না, তাই কারও বিষয়ে ভাববারও নেই তার যেমন নন্দ'র আছে। কিন্তু আজ হঠাৎ এক-মুহূর্ত্তে কি যেন হয়ে গেল অর্জ্জুনের মধ্যে। মাধবীর গায়ের রং, তার মাথার কুঞ্চিত কেশরাশি, তার হরিণের মত দুটো নিষ্পাপ চোখ, আজ মুগ্ধ

করে দিল অর্জ্জুনকে। মুহূর্ত্তমাত্র। তারি মধ্যে অপ্রত্যাশিত একটা পরিবর্ত্তন ঘটে গেল অর্জ্জুন পালের। মাধবীকে সে ভালবেসে ফেলল।

"আজকাল আমাদের বাড়ীতে যাস্ না ত' মাধু?"

"যাই ত' প্রায়ই, সন্তু'র সঙ্গে, খুড়ীর সঙ্গে গল্প করি গিয়ে—"

"ওঃ—কিন্তু আমি ত' দেখি না।"

"বাঃ রে, তুমি দেখবে কি করে, তুমি ত'দোকানেই থাক।"

"ওঃ—হ্যাঁ, তা বটে"—অর্জ্জুন হাসল।

আরও কথা বলতে ইচ্ছে করে অর্জ্জুনের, আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে মাধবীর নবাবিষ্কৃত রূপ দেখে তার নূতন উপলব্ধিকে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কথা খুঁজে পায় না সে। সে লাজুক, ভীরু। সে নন্দ নয়। গায়ে জোর থাকলেই যদি বড় প্রেমিক হওয়া যেত তবে অর্জ্জুন নন্দ'র চেয়েও বড় প্রেমিক হত। তা নয়। তা ছাড়া রাস্তায় দূরে লোক দেখা যাচ্ছে।

"আচ্ছা, যাও মাধু"—অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বিদায় নিল।

যে অর্জ্জুন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল সেই অর্জ্জুন কিন্তু আর বাড়ী ফিরবে না।

মাধবী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। উঃ, আর একটু হলেই বই দুটো দেখেছিল আর কি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল সে। প্রবীর বুঝি বেরিয়ে গেল।

কিন্তু না, প্রবীর বাড়ীতেই আছে। পেছন দিক দিয়ে ভিতরে যাচ্ছিল মাধবী। যেতে যেতে পাশের একটা জানালা দিয়ে প্রবীরের ঘরের ভিতর সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। প্রবীর বসে কি যেন একটা কাগজ পড়ছে।

সোজাসুজি প্রবীরের কাছে গেলে ভাল দেখাবে না। বাধ্য হয়ে প্রবীরের পিসীর সঙ্গে গিয়ে গল্প করতে হয় খানিকটা।

"পিসীমা, কি করছ ?"

"কে, মাধবী ? আয় মা, বোস"—পিসী রান্না করছিল।

মাধবী বসল না, দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল, "কি রান্না করছ পিসী ?"

পিসীর নাম সিদ্ধেশ্বরী, সে বলল, "এই একটা চচ্চড়ি আর কি, দাদা হাটে গেছে, দেখি কি মাছ আনে।"

উনুনের মুখে একটা ঘটিতে জল ফুটছিল, সেদিকে নজর পড়তেই সিদ্ধেশ্বরী বলল, "একটা কাজ করবি মাধু ?"

"কি কাজ পিসীমা ?"

"এই গরম জলটা নামিয়ে দিচ্ছি—এক কাপ চা তৈরী করে নিয়ে দে ত' প্রবীরকে, পারবি ? আমার হাতটা জোড়া—"

"কি যে বল পিসীমা, এতটুকুও পারব না ?"

হাতে স্বর্গ পেল সে।

চা তৈরী করে, বই দুটো বগলে নিয়ে, পা টিপে টিপে প্রবীরের ঘরের সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল। তাকে দেখে প্রবীর কেমন অবাক হয়ে যাবে তাই ভেবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সে।

আর তাই হল।

প্রবীর অবাক হয়ে বলল, "মাধু, তুমি ! আবার চা নিয়ে ?"

"হুঁ—তাতে কি, আমার ছোঁয়া খাবে না ?"

"কেন ?"

"তুমি যে বামুন ঠাকুর।"

প্রবীর হেসে উঠল, "বামুন আর ঠাকুরদের যুগ আর নেই মাধু, মানুষদের যুগ আরম্ভ হয়েছে এবার।"

"ওসব বড় বড় কথা বুঝি না"---মাধবী হেসে বলল।

"না বুঝলে, দেখি চা কেমন মিষ্টি হয়েছে—বাঃ, ঠিক হয়েছে।" চায়ে চুমুক দিয়ে প্রবীর বলল।

পুলকে মাধবীর মুখেচোখে রক্ত উছলে উঠলো।

"কোথাও বেরোচ্ছ নাকি প্রবীরদা ?"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি জমিদারবাবুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে।"

একটু হতাশ হল মাধবী। একটু দেখেই তার আশা মিটতে চায় না।

"কিসের বোঝাপড়া ?"

"ও মজুরদের বিষয়ে।"

নিঃশব্দতা।

প্রবীরের চ-পান করা দেখে মাধবী।

"তারপরে, নন্দর কি খবর ? খুব ত' অজ্জুনের পার্ট করল শুনলাম।"

মাধবী হাসল, "দাদার কি হয়েছে শুনবে ?"

"কি ?"

"কাউকে বলবে না ?"

প্ররীর হাসল, "না, কি হয়েছে ?"

"তেতুলঝোরার গৌরদাসের মেয়ে কজললতাকে বিয়ে করার জন্য সে ক্ষেপে গেছে।"

প্রবীর উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, "তাই নাকি, হতভাগার পেটে পেটে এত! তাই দেখি প্রায়ই বিকেলে নৌকো নিয়ে ভেসে পড়ে। ভাবি কোথায় যায় রোজ—তা এই ব্যাপার ?"

"হ্যাঁ।"

"ভাল ভাল, তারপর কদ্দুর এগোল ?"

"শিবেশ্বর কাকা কথাবার্ত্তা চালাতে যাবে পরশু।"

"বেশ, ভোজের জন্য তৈরী থাকব।"

প্রবীর উঠে দাঁড়াল, এবার আমি যাই মাধু—"

"যাবে?"

"হ্যাঁ—ওঃ, বই দুটো এনেছ? পড়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন লাগল?"

"ভাল।"

"আচ্ছা পরে কথা বলব, কেমন? এখন যাই। জমিদারবাবুদের কথাই আলাদা, কোথায় চলে যাবে কে জানে।"

"এসো।"

"রাগ করো না কিন্তু আমি চলে যাওয়ায়, আমার ঘরে আরও বই আছে, নেবার ইচ্ছে থাকলে নিয়ে যেও।"

"আচ্ছা।"

প্রবীর বেরিয়ে গেল।

প্রবীরের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল মাধবী। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে প্রবীরের জিনিষপত্রগুলো দেখে। অনেক বই। বইগুলোতে হাত বুলোয় সে। জামাকাপড়। সেগুলোকে নাড়াচাড়া করে সে। শয্যা। তার উপর বসে মাধবী। সব কিছুর ভিতর থেকে সে যেন তার স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে প্রবীরের স্পর্শকে আহরণ করতে চায়। দিবাস্বপ্ন দেখে মাধবী। অলঙ্কারে বিভূষিতা হয়ে, একমাথা সিঁদুর মেখে, লাল শাড়ী পরে, ঘোম্‌টা টেনে সে যেন সলজ্জভাবে এই ঘরটাতেই দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, এই ঘরটাতেই।

পনেরো মিনিট লাগে যেতে।

জমিদারবাবুর অট্টালিকার বাইরে একজন পশ্চিমা দারোয়ান বসে ছিল। সে বল্ল যে জমিদারবাবু ভিতরে আছেন।

বাইরে দুটো বড় ঘর কাছারী-ঘর রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রবীর সেদিকে গেল না। জমিদারবাবুর খাস্ বৈঠকখানার দিকে সে এগোল।

সেখানে চাকর বাকর কেউ নেই।

খানিকক্ষণ দাঁড়াল প্রবীর। অবশেষে পর্দ্দা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল সে।

ঘরে একটি ইজিচেয়ারে বসে একটি মেয়ে বই পড়ছিল। বছর কুড়ি একুশ বয়স হবে।

তাকে দেখেই প্রবীর বলল, "মাফ্ করবেন—"

সে বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু মেয়েটি তাকে দাঁড় করাল, "শুনুন—কাকে চান আপনি?"

"জমিদারবাবুকে, তিনি আছেন?"

"বাবা? হ্যাঁ, ভেতরে আছেন, বসুন আপনি।" মেয়েটি একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রবীরকে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল।

প্রবীর মেয়েটির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। প্রজাপতির জাত। রঙীন ডানাটাই সার। সাজসজ্জায় একটু বাহুল্য, নিজেকে

জাহির করে আনন্দ পেতে চায়, গর্ব্ব বোধ করে। জমিদারের মেয়ে তা বোঝা গেল। জমিদার-সুলভ আভিজাত্যের অহঙ্কার বেশ সুস্পষ্টভাবে মুখের উপর লেগে আছে। লোকে বলবে যে তার চেহারা ভালই। গৌরাঙ্গী বটে, কিন্তু এমন কিছু মারাত্মক গৌর নয়। চোখটা শাণিত দৃষ্টিতে প্রখর। মুখের পাউডারের ছোপটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। একটা রুক্ষতা লুকিয়ে আছে সর্ব্বাকৃতিতে। দেহসৌষ্ঠব সম্বন্ধে সে সচেতন তাই আঁটসাঁট পোষাকের ভিতর দিয়ে যে যৌবনোচ্ছল দেহ-রেখাকে সে সুপ্রকাশ করতে চায় সেটা বোঝা যায়। প্রবীর মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু মেয়েটার মুখ যেন দেখেছে সে কোথাও। আর এর কথাও সে শুনেছে। বি-এ পাশ করেছে নাকি মেয়েটি। মেয়েটি ছোট, তার বড় আর একটি ছেলে আছে সে নাকি কলকাতায় পড়ে।

"কিছু মনে করবেন না, আপনার নাম জানতে পারি কি?" মেয়েটি বলল।

"নিশ্চয়ই, আমার নাম প্রবীর চৌধুরী।"

"ওঃ, আপনার নাম শুনেছি। ঢাকায় কলেজ মহলে খুব নাম ছিল আপনার। আপনাকে দেখেছিও আমি। জগন্নাথ হলে রবীন্দ্র-স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে—"

প্রবীর হাসল, "আপনাকেও দেখেছি মনে হচ্ছিল।"

মেয়েটিও হাসল, মাপা হাসি, "তাছাড়া বাবার মুখেও কয়েকদিন আগে আপনার নাম শুনেছি। পাটকলের মজুরদের আপনি নাকি মুরুব্বি—"

"মুরুব্বি নই, বন্ধু।"

মেয়েটি হাসল, "আপনি একজন পাকা কম্যুনিষ্ট হয়ে উঠেছেন মনে হচ্ছে।"

প্রবীর মৃদু হাসল। উত্তর দেওয়া সে নিরর্থক মনে করল। মেয়েটির এই অতিমাত্রায় সপ্রতিভভাব আর কথার ধরণ ধারণ তাকে উৎসাহিত করছিল না মোটেই।

"ভোলা!"—মেয়েটি ডাকল।

একজন চাকর এসে দাঁড়াল।

"বাবাকে বল্‌গে যে একজন বাবু এসেছেন দেখা করতে, বিশেষ কাজ আছে।"

চাকরটি চলে গেল।

"আজকাল ফার্দার ষ্টাডি করছেন নাকি?" মেয়েটি প্রশ্ন করল।

"না।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল প্রবীর।

"সব ছেড়ে দেশের কাজে লেগেছেন? ভাল—"

ভিতর থেকে চটির শব্দ ভেসে আসল।

"বাবা আসছেন।" মেয়েটি ঘোষণা করল।

পরক্ষণেই শশাঙ্ক রায় ভিতরে এলেন।

"কে রে শিখা?"—বলতে বলতেই তার নজর পড়ল প্রবীরের উপর তিনি এগিয়ে এলেন।

মেয়েটির নাম তাহলে শিখা।

প্রবীর উঠে দাঁড়াল. "নমস্কার।"

শশাঙ্কবাবু প্রতি নমস্কার জানালেন না, একটি চেয়ারে বসে বললেন, "তুমিই প্রবীর চৌধুরী—তারিণী চৌধুরীর ছেলে?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"হুঁ"—একদৃষ্টে তাকালেন তিনি প্রবীরের দিকে। যেন যাচাই করতে চান যে ছোক্‌রা কোন শ্রেণীর কর্ম্মী।

প্রবীরও তাকাল শশাঙ্কবাবুর দিকে। অর্থ আর আরাম, আভিজাত্য

আর অহঙ্কার যেন একসঙ্গে মিশে তাঁকে তৈরী করেছে। খ্যাতি আর ঐশ্বর্য্যের লালসা তার দুচোখের ঈষৎ পিঙ্গল চক্ষু-তারকায় প্রখর হয়ে উঠেছে। জমিদার সহরেই বছরের মধ্যে ছ'মাসে থাকেন। এই মিলের জন্যই তাকে এখানে আসতে হয়, থাকতে হয়। ষ্টেটের জন্য এবং মিলের জন্য দুজন সুদক্ষ ম্যানেজার আছে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কাজ আটকায় না মোটেই। আগে দু'একবার দূর থেকে প্রবীর তাঁকে দেখেছিল, তাতে বেশী বোঝা যায়নি। আজ সে অনুভব করল যে আকাশের উদার শূন্যতার মধ্যেও যে অনুদার, হিংস্র ও লোভ-ক্ষুধাতুর শ্যেন পাখীরা উড়ে বেড়ায় তাদের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে শশাঙ্কবাবুর।

"জান বাবা, প্রবীরবাবুকে আগে দেখেছি কলেজ-মহলে, খুব নাম করা ছাত্র ছিলেন উনি।"

"হুঁ—নাম তো এখানেও হয়েছে।" শশাঙ্কবাবু একটু তিক্ত হাসি হাসলেন, পরে বললেন, "চাকরী বাক্‌রী পাওনি বুঝি ?"

"পাইনি কারণ চেষ্টা করিনি ?"

"কেন ?"

"স্থান, কাল, পাত্র ভেদে রুচি বদলায় জানেন না ?"

শশাঙ্কবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, "ওঃ, আমি ভাবলাম যে আজকালকার বেকারদের মত কিছু না পেয়েই বোধ হয় এই সব ছোটলোকদের নিয়ে মাতব্বরী করে বেড়াচ্ছ।"

শিখা হাসল।

প্রবীরও হাসল, "আপনার ভাবতে বাধা নেই। কিন্তু বেকার মাতব্বরদের দোষ নেই, অন্ততঃ তারা পরের খেয়ে মোটা হয় না আর

আমাদের ভগবান তাদের ক্ষমা করবেন কারণ যাদের নিয়ে তারা মাতব্বরী করে বেড়ায় তারা ছোটলোক হলেও মানুষ, পশু নয়।"

শিখার মুখের হাসি আস্তে আস্তে মিলিয়ে এসেছে। একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে প্রবীরের দিকে।

শশাঙ্কবাবু শ্লেষতিক্তকণ্ঠে বললেন, "ওঃ, তুমি কম্যুনিষ্ট মনে হচ্ছে, তারা আজকাল ঐসব কথাই বলবে বটে। যত সব ছোটলোক আর বিড়িওয়ালারা দল বেঁধে সাম্যের বুলি আওড়াচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী টান্ধীর মত লোক কিছু করতে পারলে না, এবার এরা এসেছেন দেশোদ্ধার করতে!"

প্রবীরের মুখে রক্ত উঠে এসেছে, "যে যুগের যে ধারা। একটা বিরাট মহীরুহ একটা বীজ থেকেই হয়—বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে শাখাসমাকুল বৃক্ষ, পরে মহীরুহ। মাটি, জল, আলো, বাতাস এবং তার প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তনই তাকে ছোট অবস্থা থেকে মহীরুহত্বে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। আমাদের জাতীয় জীবনেও তাই। স্বাধীনতা লাভের যে প্রচেষ্টার অঙ্কুর অনেকদিন আগে রোপন করা হয়েছিল তাকে একটা রূপ দিয়েছেন মহাত্মাজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ছোটলোক আর বিড়িওয়ালাদেরও কিছু করবার আছে, তারাও চেষ্টা করছে, করবেই। মহাত্মাজীর দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত কি হল তার বিচার কি এখনই করা যাবে? আর কার দ্বারা দেশোদ্ধার হবে তা কি আপনিই বলতে পারেন?"

শশাঙ্কবাবু মৃদু হাসলেন, "বেশ বক্তৃতা দিতে পারো ত তুমি?"

শিখা আবার হাসল নিঃশব্দে। হাসলে তাকে ভাল দেখায়। প্রবীরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সে একহাত দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা ঠিক করে নিল। ফিনফিনে ব্লাউজের নীচেকার কর্সেটটা পর্য্যন্ত দেখা যায়।

প্রবীর বিরক্ত বোধ করছে, কিন্তু তা দমন করে শান্তকণ্ঠে হেসেই

বলল, "বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু ওসব কথা যাক, আমার কয়েকটা কথা আছে।"

"জানি।" শশাঙ্কবাবু খাড়া হয়ে বসলেন। মুহূর্তে তাঁর চেহারা বদলে গেল, মুখমণ্ডলে রেখাসমাকুল গাম্ভীর্য্য নেমে এল, চোখের তারায় নিষ্ঠুর একটা দীপ্তি জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল। মাথা নেড়ে তিনি বললেন, "জানি—মজুরদের বিষয়ে ওকালতী কর্ত্তে এসেছ তুমি।"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু ফিরে গেলেই ভাল করতে তুমি। তোমার বাবাকে চিনি আমি, তার সঙ্গে হৃদ্যতাও আছে আমার। আমার মজুরদের ব্যাপারে মাথা গলাতে না এসে ফিরে গেলে ভাল হোত তোমার।"

প্রবীর হাসল, "আমার কিসে ভাল, সে আমি জানি। আর কলটা আপনার হলেও শ্রমিকেরা আপনার কেনা সম্পত্তি না বলেই ওতে আমাকে মাথা গলাতে হচ্ছে।"

শশাঙ্কবাবুর চোখে ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল, "বাজে কথা থাক্।"

"সত্যি, বাজে কথা থাক্—আমিও বলছি।"

শিখার চোখে বিস্ময়।

"কি চাও তুমি ?"

"মজুরদের তরফ থেকে যে দরখাস্ত করা হয়েছিল, তার কি করলেন আপনি ?"

"পরে জানানো হবে।"

"মজুররা সাতদিনের মধ্যে উত্তর প্রার্থনা করেছিল আপনার কাছে। সে জায়গায় একপক্ষকাল হয়ে গেল, আর অপেক্ষা করবার ধৈর্য্য নেই তাদের। তারা আজই জবাব চায়।"

"এই হুম্‌কী, এই জুলুম আমাকে সইতে হবে ?"

"এত' হুম্‌কী বা জুলুম নয়—এ দাবী। তাদের শ্রমে আপনি ধনবান্, লাভবান হচ্ছেন, তারা সহজেই এ দাবী করতে পারে।"

"তবে শোন"—ড্রয়ার থেকে একটা চুরুট বের করে ধরালেন

"বলুন।"

"তাদের বাড়ীঘর ইত্যাদির সংস্কার পরে হবে কিন্তু অন্যান্য দাবী মানে মজুরী বাড়ান ইত্যাদি এখন হবে না।"

"তার মানে—সব ব্যাপারেই আপনার অস্বীকৃতি?"

"যদি এই মনে কর তবে তাই।"

"আপনি সহৃদয়তার সঙ্গে ভেবে দেখুন ব্যাপারটা—আমার অনুরোধ।"

"আমি যা ভেবে দেখলাম তা তোমায় বললাম এখুনি।"

প্রবীর উঠে দাঁড়াল, "তবে এই শেষকথা। ভাল। আমাকেও দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাতে হচ্ছে যে আপনার এই বিরূপ মনোভাবের উত্তরে মজুরেরা ধর্ম্মঘট করতে বাধ্য হবে।"

শশাঙ্কবাবু হাসলেন, "টাকায় সবাইকে সুবোধ করা যায়, তা জান?"

"হয়ত যায়। যারা টাকা চায় তাদের যায়, যাদের সে লোভ নেই তাদের?

"তারা ক'জনইবা?"

"অনেক—আপনি টাকাই চেনেন তাই তাদের চিনবেন না।"

শশাঙ্কবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "আমার জবাব দিয়েছি—তুমি এবার আসতে পার।"

"আচ্ছা, নমস্কার—"

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন শশাঙ্কবাবু। তিনি উত্তেজিত হয়েছেন বেশ বোঝা গেল।

প্রবীর পা বাড়াল।

"আপনি চললেন নাকি ?" পেছন থেকে শিখা ডাকল।

"সেইটেই স্বাভাবিক।"

"সেকি! বসুন—প্লীজ। বাবার সঙ্গে আলোচনায় তিক্ততা হতে পারে কিন্তু তা আমাদের বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ কেন ঘটাবে ?"

প্রবীর হাসল নিজের মনে। গায়ে পড়ে আলাপ করার এত স্পৃহা কেন মেয়েটির ?

"এক কাপ চা খেয়ে যান প্রবীরবাবু।"

"ধন্যবাদ। বসতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু সত্যি উদ্বৃত্ত সময় নেই বলেই চললাম। নমস্কার।"

প্রবীর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শিখার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, আঁকা ভ্রূদুটো ঘন সন্নিবিষ্ট হলো। উঠে সে পর্দ্দাটা সরিয়ে দেখল গমনরত প্রবীরকে।

রূপকথায় পড়া যায় যে আগেকালের দিনে রাজকন্যারা মুগ্ধ হত রাজপুত্রদের দেখে। রূপকথার দেশে রাজাদের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু মাটীর পৃথিবীতে রাজাদের সংখ্যা খুব কম, আরো কম হয়েছে আজকাল। তবু যারা আছে তাদের কদর নেই। আজকালকার রাজকন্যারা মুগ্ধ হয় গরীবের ছেলেদের দেখে, নিস্ব, রিক্ত, শূন্যপকেট দরিদ্র মজুরকে দেখে, নির্ভীক দেশকর্ম্মীকে দেখে। কারণ পুরুষের পৌরুষ। রূপকথার রাজপুত্রদের মধ্যে যে পৌরুষ ছিল তা আজকালকার সংখ্যায় নগণ্য মৃত্তিকার রাজপুত্রদের নেই। কারণ পৌরুষ আদর্শহীনের হয় না, চরিত্রহীনের হয় না, দুর্ব্বলের হয় না।

জমিদার-কন্যা শিখার প্রবীরকে ভাল লেগেছে। প্রবীরের স্পষ্ট কথায়, দৃপ্ত ভঙ্গীতে, নির্ভীক ব্যবহারে যে পৌরুষের দীপ্তি স্ফুরিত হচ্ছিল

প্রতি মুহূর্ত্তে তা মুগ্ধ করেছে তাকে। বহু বিলেত-ফেরৎ আর ধনীর দুলালদের সান্নিধ্যে গেছে সে, বহু নিবিড় সঙ্গ লাভ করেছে তাদের, তাদের পুরুষ মনের নানা প্রকাশকে সে দেখেছে, তারিফ করেছে। কিন্তু তা এরকম পৌরুষ নয়। এ একেবারে একটা নূতন অভিজ্ঞতা। রোমাঞ্চকর।

সন্ধ্যাবেলায় সবাই ইউনিয়নে এলো।

হ্যারিকেনের কাঁচটা ময়লা ও ভাঙ্গা। একটা পোষ্টকার্ড এঁটে ভাঙ্গা দিকটা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তার ম্লান আলোতে দেখা যায় যে ঘরের দাওয়ায় ও উঠানে সব মিলে প্রায় দেড়শ লোক বসে আছে।

প্রবীর বলল, "সব কথা ত শুনলে ভাই সব—এবার ?"

আবদুল গম্ভীরভাবে বলল, "এবার ধর্ম্মঘট—এ ছাড়া উপায় নেই।"

যতীন, রাম সিং, অবিনাশ আর তাদের সায় দিল।

প্রবীর আতাউল্লাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি মত ?"

আতাউল্লা হাসল, "আমার আবার মত কি বাবু, পাঁচজনের ভালর জন্য যা ঠিক হয়েছে আমারও তাই মত।"

"খুশী হলাম ভাই—তোমার লীগ এতে বাধা দেবে না ত' ?"

"লীগের এতে স্বার্থটা কি ?"

প্রবীর মাথা নাড়ল, "তা বটে, তাহলে শোন ভাই সব—এবার তবে ধর্ম্মঘট সুরু হবে। কেমন, রাজী ?"

একসঙ্গে বেশীরভাগ লোকই সম্মতি জানাল।

চুপ করে রইল গণি মিঞার দল। তাদের মধ্যে ভোলা আছে, যদু আছে, শম্শের আছে, তাছাড়া আরও জনকুড়ি লোক। গণি মিঞার এই নৈঃশব্দ পূর্ব্বেই অনুমান করা হয়েছিল। প্রবীর জানত যে শশাঙ্কবাবু টাকা দিয়ে যাদের সুবোধ করে রেখেছেন—তাদের মধ্যে গণি মিঞাই প্রধান।

"তুমি যে চুপ করে রইলে গণি ভাই ?"—প্রবীর প্রশ্ন করল।

গণি মিঞা মাথা নাড়ল "হ্যাঁ, চেঁচিয়ে কি লাভ তাই ভাবছি।"

"কেন ?"

আবদুলের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

"ধর্ম্মঘট করলেই কি দাবী মিট্‌বে মনে করেন ?"

"নিশ্চয়ই।"

"আমার মনে হয় না।"

"তোমার ধারণা ভুল—তোমরা যদি ঠিক থাক তবে তোমাদের দাবী মিটবেই।"

"কিন্তু ধর্ম্মঘট এখনই আরম্ভ করার দরকারটা কি ? আর কিছুদিন দেখা যাক্ না—মালিকবাবু তো বলছেন ভেবে দেখবেন।"

প্রবীর হাসল, "তুমি মিথ্যে আশা করছ গণি ভাই—যার ইচ্ছে থাকে সে সঙ্গে সঙ্গেই একটা ব্যবস্থা করে দেখায়। প্রায় পনর দিন যাবৎ আমরা তাঁকে জানিয়েছি—তার আগেও তোমরা জানিয়েছ—কোথায়, কি ফলটা হয়েছে ?"

গণি মিঞা তবু মাথা নাড়ল, "না বাবু, আমার মনে হয় তিনি একটা কিছু ঠিক করবেন।"

"আচ্ছা গণি ভাই ?"

"জী –"

"আসল খাটুনী কার ?"

"আমাদের"

"বেশ। আর আমাদের শ্রমের ফলেই মালিকের ধনবৃদ্ধি হচ্ছে, নয় কি ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে আমরা অত ভয়ে ভয়ে, মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব কেন ?"

গণি মিঞা চুপ করে রইল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে ভাবছে। যে টাকা শশাঙ্কবাবু তাকে ও তার লোকদের দিয়েছে তার প্রতিদানে তাঁকে কি উপকার করা যায় সেই কথা।

"বল"—প্রবীর জিজ্ঞেস করল।

অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হয়েছে। উত্তেজিত আলোচনা।

গণি মিঞা মাথা নাড়লো, "না বাবু, আমি রাজী নই—আমি হয়ত ধর্ম্মঘটে যোগ দেব না এবার।"

"ওঃ—তোমার সঙ্গে আর কজন আছে?"

"তা কি বলা যায়—সে পরে বুঝতে পারবেন।" গণি মিঞা হাসল।

অন্যান্য সকলের চাপা আলোচনা এবার বেশ পরিষ্কার ভাবে কাণে আসছে।

যতীন একটু রগচটা লোক, সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "আপনি ওসব কথা

ছাড়ুন প্রবীরবাবু। ভালমানুষ হলে না ভাল কথা শুনবে—যত সব বেইমান ঘুষখোর—"

গণি মিঞা লাফ দিয়ে উঠল—"খবরদার শালা—জবান টেনে ছিঁড়ে ফেলব কিন্তু।"

তার সঙ্গীরাও লাফিয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রবীর উঠে দাঁড়াল, "ছিঃ—থাম, থাম গণি ভাই।"

যতীনও রুখে এসেছিলো, রাগে তার বিশাল দেহটা ফুলে ফুলে উঠছিল। আবদুল তাকে চেপে ধরে বসিয়ে দিল।

"এরকম কথা কেন বলবে তবে?"—গণি মিঞা প্রশ্ন করল।

"সত্যি অন্যায় কথা, যাক্—এসব ব্যাপারে ও হয়েই থাকে।"

কিন্তু ব্যাপারটা থাম্‌ল না।

অন্যান্য লোকেরা এবার চেঁচিয়ে উঠল।

"শালা বেইমান্—"

"শালা টাকা খেয়েছে—"

"হারামী কোথাকার—"

"বেইমানটাকে বের করে দাও—"

প্রবীর একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল। এরা দাঙ্গা হাঙ্গামা করে ধর্ম্মঘটটাকে পণ্ড না করে।

"থাম—তোমরা ভাই নিজেদের লোকের সঙ্গে এমন ভাবে ঝগড়া করো না।"

তবু কেউ থামল না।

গণি মিঞা দলবল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। উত্তেজনায়, ক্রোধে তার চোখ দুটো জ্বলছে বাঘের চোখের মত। কটুবাক্য-বর্ষণকারী ক্রুদ্ধ সহকর্ম্মীদের উপর বারকয়েক সে চোখ বুলিয়ে নিল পরে পা বাড়াল।

"গণি ভাই চললে নাকি ?"—প্রবীর এগিয়ে গেল।

"হ্যাঁ বাবু।"

"তাহলে তুমি সত্যি সত্যি আমাদের সঙ্গে নেই ?"

"না বাবু, সঙ্গে আছি কিন্তু এই ধর্ম্মঘটে আমার মত নেই।"

"ভেবে দেখো গণি ভাই"—আবতুল বলল।

"ভেবেছি।"

"কিন্তু এই কজন লোক কাজ করলে কি লাভ হবে ?"—প্রবীর প্রশ্ন করল।

"হয়ত আরও লোক বাড়বে—যারা মুখে বলছে তারাও হয়ত পরে আসবে কাজ করতে। পেট বড় কঠিন ব্যাপার বাবুসায়েব।"

প্রবীর হাসল, "হয়ত তাই। কিন্তু এই কি তোমার শেষ কথা ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা—এসো"

গণি মিঞা দলবল নিয়ে চলে গেল।

পেছনে কোলাহল উঠল।

"আচ্ছা দেখে নেব—"

"বেইমান—বাটপাড় কোথাকার।"

"শালাদের ঠ্যাং খোঁড়া করব কাজে গেলে—"

"থাম"—প্রবীর বাধা দিল, "এমনভাবে চেঁচামেচি আর গালিগালাজ করলে লোকে তোমাদের গুণ্ডা ছাড়া আর কিছু বলবে না ভাই, থাম।"

কোলাহল একটু থামল।

"এবার বল কি করবে তোমরা ? তোমরাও কি কাজে যাবে ?"

সকলের সম্মিলিত উত্তর এল, "না।"

"এর জন্য যদি অনাহারেও থাকতে হয়, তোমরা রাজী ?"

"হ্যাঁ।"

"টাকার লোভে বা হুম্‌কীতে বিপথে যাবে না?"

"না।"

"তাহলে ধর্ম্মঘটই হবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।

"বেশ। কালবাদে পরশু থেকে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হবে। কালকে কাজে যেয়ো. চুপচাপ কাজ করো আর কাউকে কিছু বলো না।"

মিটিং ভাঙ্গল। সবাই একে একে উঠে গেল।

রইল প্রবীর, আবদুল, তাহের, যতীন আর অবিনাশ।

অনেকক্ষণ বসে বসে ওরা ধর্ম্মঘটের, বিষয়ে ও তৎসংলগ্ন ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধক সমূহকে অতিক্রম করার বিষয়ে আর ইউনিয়নের তহবিলে কত টাকা আছে সে বিষয়ে আলোচনা করল।

বেশ খানিকক্ষণ কাটল।

এদিকে শ্রমিকেরা যে যার বাড়ী ফিরেছে। দূর থেকে হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসছে। পাশেই একটা কুড়েতে একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়মের বেলো প্রাণপণে টিপতে টিপতে আমির শেখ ভাঙ্গা গলায় গজল গান ধরেছে"—"দে-খা দিয়ে, কো-থা গেলে-এ—"। দূরের ঝিল্লীমুখর ঝোপঝাড়ে থেকে থেকে শেয়ালেরা ডাকছে। চাঁদ এখনও ওঠেনি, নক্ষত্রের আলোয় আবছা আলোকিত আকাশের স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে মাঝে মাঝে মাতাল শ্রমিকদের মত্ত কোলাহলের রেশ ভেসে বেড়ায়।

অনেক রাতে প্রবীর বাড়ী ফিরল।

টেবিলের উপর একটা কাগজ কে যেন পাথর চাপা দিয়ে রেখে গেছে। প্রবীর তা তুলে নিল।

লিখেছে মাধবী।

লিখেছে—শ্রীশ্রীচরণকমলেষু, প্রবীরদা ('প্রি' কথাটা ভুলে লিখে কেটে দিয়েছে), রবী ঠাকুরের একটা বই লইয়া গেলাম। ইতি সেবিকা—মাধবী।

প্রবীর হাসল চিঠি পড়ে। মাধবীর হাতের লেখা খুব কাঁচা, আঁকাবাঁকা, লেখার অভ্যাস যে নেই তা বেশ ধরা পড়ে।

কিন্তু চিঠি লেখার কি দরকার ছিল? আর প্রবীর লিখতে গিয়ে 'প্রি' লেখাটাই কি স্বাভাবিক ভুল? কে জানে মাধবীর মনে কি ছিল।

অবশ্য প্রবীর এসব কথা ভাবে না। অত সময় নেই। তার এখন অনেক কাজ।

পরদিন সকালবেলাতেই শিবেশ্বর তেতুলখোরায় গেল।

দুপুরের সময় সে আবার ফিরে এল। গৌরদাস অবশ্য ভদ্রতা করে তাকে দুপুরে থাকতে ও খেতে বলেছিল, কিন্তু শিবেশ্বর থাকেনি। কারণ কথাবার্ত্তায় কোন ফল হয়নি।

গৌরদাস তার মেয়ের জন্য আরও অবস্থাপন্ন ঘরের স্বপ্ন দেখে। অবস্থায় না কুলালেও সে যে সে জায়গায় তার মেয়ের বিয়ে দেবে না। মেয়ের রূপের জন্য সে রীতিমত গর্ব্ববোধ করে।

শিবেশ্বর মাথা নেড়ে বলল, "বুঝলে হরি, গৌরদাসের অহঙ্কার শোভা পায়, সত্যি তার মেয়ের রূপের তুলনা নেই, যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।"

হরিচরণ গম্ভীরমুখে বলল, "হুঁ"—

আড়ালে সবাই ছিল। তারা দেখল যে গম্ভীর ও অন্ধকার মুখ নিয়ে নন্দ জামাটা গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এত রদ্দুরে কোথায় যাচ্ছে সে তা জিজ্ঞেস করার ভরসা আজ কেউ পেল না।

সুন্দরী বিলের অজস্র রক্তপদ্মের শোভা আজ ম্লান হয়ে গেছে।

থরথর করে কাঁপছে কাজললতা নন্দর বুকে মাথা রেখে। চোখ ছলছল করছে, বুকটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে ফুলে ফুলে উঠছে, দেহ শিথিল, অবশ হয়ে পড়েছে।

নন্দ পাথরের মত বসে আছে।

"কথা বলছনা যে ?"—কাজললতা জিজ্ঞেস করল।

নন্দ উত্তর দেয় না।

"কথা বল"—নন্দর চিন্তাকুল মুখ, তার নৈঃশব্দ তাকে ভীত করে তোলে।

"কি বলব ?"

"কি হবে এবার ?"

26-11-40

"তাইত ভাবছি।"

"বাবা নাহয় না করল, আমি ত' করিনি"—

"হুঁ"—

"আমায় তুমি নিয়ে চল"—

"এ্যা! যাবে? সত্যি যাবে?" নন্দ হঠাৎ যেন আশা ফিরে পায়।

"যাব।"

"কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে কি এসব হয়—পাশের গাঁয়ে বাড়ী। তোমার বাপ রাজী নয়, আমার বাপ যদি মত না দেয় এবার?"

আবার অন্ধকার দেখে নন্দ।

কাজললতা বোধ হয় এবার কেঁদে ফেলবে আরও নিবিড়ভাবে নন্দকে আঁকড়ে ধরে সে প্রশ্ন করল, "তবে কি হবে—বলনা, কি হবে?"

নন্দ তার মুখের দিকে তাকাল, দুহাতে তার মুখটা তুলে ধরল নিজের দিকে। অপরাহ্ণের সোনালী আলোর স্পর্শে, বসন্ত শেষের উত্তাপে তার মুখটা লালচে হয়ে উঠেছে। সুন্দরী বিলের রক্তপদ্মগুলো এর পাশে নিষ্প্রভ মনে হয়।

সে বলল, "ভয় পেয়ো না কাজললতা, তোমায় আমি নিয়ে যাবই—আজ না হোক, কাল পরশু একদিন না একদিন তোমায় আমি নিয়ে যাবই। একটা কিছু ঠিক হবেই, হতেই হবে, তা নইলে আমার চলবে না। তোমায় ছাড়া আমি ত' বাঁচব না কাজললতা—"

হাওয়া নেই। বাঁশের ডগাগুলো পর্য্যন্ত নিথর নিস্তব্ধ। দু'একটা বক সতর্ক পদক্ষেপে মাছ খুঁজে বেড়াচ্ছে বিলের আনাচে কানাচে, কলমীশাকের দামে। কতকগুলো শালিক আর ছাতারে পাখী কিচমিচ করছে বন অপরাজিতা আর আকন্দ গাছগুলোর আশে পাশে। অপরাহ্ণের সোনালী আলোমাখানো নির্জ্জনতার পাদপীঠে বসে, কোথায় কোন

পাতার আড়ালে, অশ্রান্তভাবে একটা ঘুঘু ডাকছে ঘু—ঘু—ঘু। ওদিকে কয়লার গাঢ় ধোঁয়ার মত একখণ্ড মেঘ পূব দিগন্তের বন রেখার উপর দিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বোধ হয় ঝড় উঠবে।

বিকেলের দিকে বেরোল প্রবীর। ইউনিয়নে যেতে হবে—অবশ্য সময় আছে, মিল থেকে সবাই ফেরেনি এখনও। তবু বাড়ীতে ভাল লাগছে না। নন্দর ওখানে হয়ে একটু সুব্রতর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হল। সুব্রত তার বন্ধু, কংগ্রেস কর্ম্মী। বার তিনেক জেল খেটেছে এ পর্য্যন্ত। তার চেয়ে এক আধবছরের বড় হবে। সে গান্ধীবাদে বিশ্বাসী, চিন্তায় ও কর্ম্মে সেই বিশ্বাসকে রূপ দেয় সে।

নন্দদের বাড়ীর দাওয়ায় হরিচরণ আর, শিবেশ্বর হুঁকে টানছিল। হরিচরণ বড় ভাবনায় পড়েছে। দুপুর বেলায় নন্দ যখন ঘর থেকে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের মধ্যে মুখ অন্ধকার করে বেরিয়ে গেল তখন তার বড় দুঃখ হয়েছিল। অন্যান্য সংকীর্ণমনা বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রবীনদের মত সে নয়, যৌবনের নিয়ম ও প্রেমকে সে অমর্য্যাদা করে না। কিন্তু কি করবে সে? মেয়ের বাপ যদি মেয়ের বিয়ে না দেয়, কি আর করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে? শিবেশ্বরও তাই বলছিলো। উপায় নেই, নন্দ ওসব মোহ ত্যাগ করুক, ফুটফুটে দেখে আর কোনও মেয়েকে হরিচরণ নিয়ে আসুক তার বৌমা করে।

"এসো—এসো বাবা"—হরিচরণ আহ্বান করল।

প্রবীর গিয়ে একটা জলচৌকিতে বসল।

"কেমন আছেন আপনারা?"—

"চলে যাচ্ছে বাবা কোন মতে"—শিবেশ্বর হেসে বলল।

হরিচরণ মাথা নাড়ল, "আমি কিন্তু বড় অশান্তিতে আছি বাবা—"

"কেন?"

"নন্দর বিয়ে নিয়ে ;"

"ওঃ, ঠিক ঠিক। কি হল শিবেশ্বর খুড়ো, আজকে গিয়েছিলেন না তেতুলঝোরায় ?"

"তুমি জান নাকি তাহলে সব ?" হরিচরণ প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ—শুনেছি সব কথা।"

"কিছুই হলো না বাবা, সেই ত' দুঃখু। এদিকে নন্দ ত' একেবারে মুষড়ে পড়েছে। আজকাল ছেলেদের ব্যাপারই আলাদা, আরে আমাদের সময়ে এসব ব্যাপারে আশাভঙ্গ হয়েছে তো আর একটা বিয়ে হলে রোগ সেরে গেছে।"

"কি ব্যাপারটা বলুন ত ?"

শিবেশ্বর সব খুলে বলল।

"নন্দ কোথায় খুড়ো ?"

"কি জানি"—হরিচরণ হুঁকো থেকে মুখ তুলল, "ছেলে মুষড়ে পড়েছে—কিন্তু কি করা যায় বল দেখি বাবা ?"

"তাইত—"

প্রবীরের একটু দুঃখ হল নন্দর জন্য। বেচারা। এত কষ্ট করে একটি রূপসীর চিত্তজয় করেও শেষরক্ষা হচ্ছে না ! সেই সনাতন সমাজ আর ভীরুতাকে এড়াতে পারছে না। কি করে এদের মিলন ঘটানো যায় ? কনের বাপ গররাজী, বরের বাপ অসহায়, পাত্রপাত্রীর সব বাধাকে জয় করার সাহস নেই।

সত্যি ভাবতে লাগল প্রবীর। খানিকক্ষণের জন্য স্বাধীনতা আর ধর্ম্মঘটের চিন্তার মোড় ফিরাল সে।

হঠাৎ সে বলল, "আপনারা বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলুন হরিচরণ খুড়ো—"

"এ্যা ?—"

"হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি হয়—"

"তারিখ ত' ঠিক করেই ছিলাম—৩রা বৈশাখ—কিন্তু তুমি বলছ কি ? তুমি কি এ বিয়ে ঠিক করতে পারবে ?"

প্রবীর হাসল, "সে যা হয় একটা কিছু যে নিশ্চয়ই করব সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে ঐ ৩রা তারিখেই যেন ঠিক থাকে সব। আর একটা কথা, এ খবর যেন আপনারা ছাড়া আর কেউ না জানতে পায়।"

হরিচরণ ও শিবেশ্বর মাথা নাড়ল, "বেশত বাবা, বেশত। আমরা নিশ্চিন্ত হলাম বাবা।"

"আর নন্দ এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন রাতে—"

"আচ্ছা।"

প্রবীর উঠে দাঁড়াল। সামনের দরজার দিকে তার নজর গেল। দরজার পাশে কখন এসে যে মাধবী দাঁড়িয়েছে তা সে টের পায়নি। দেখল যে মাধবী একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টির কোমলতা, স্নিগ্ধতা প্রবীর নিজের সর্ব্বাঙ্গে যেন অনুভব করে। সে হাসল।

"এখনই যাচ্ছ নাকি প্রবীর দা - বোস।"

"না ভাই বড় জরুরী কাজ, যেতেই হবে—পরে আসবখন।

সে দাওয়া থেকে নামল।

মাধবীর একটু অভিমান হল। সে দ্রুতপদে ভিতরে চলে গেল। সে আর দেখবে না প্রবীরের দিকে তাকিয়ে। না।

কিন্তু এ অভিমান কতক্ষণ ?

সুব্রতর সঙ্গে অনেক আলোচনা আছে প্রবীরের। কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরেছে যেন। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের ঝগড়া। সুভাষচন্দ্রের সভাপতি পদে ইস্তফা ও ফরোয়ার্ড ব্লক দল তৈরী করায় অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠ্‌ছে। বাঙালী যুবকেরা অনেকেই সুভাষের অনুরাগী—এ গ্রামেও তাদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি কি করবে এক্ষেত্রে? জাতীয় ঐক্য বজায় রেখে আপোষহীন সংগ্রামকে তাদের ব্যাপক করতে হবে। এসব দলাদলিতে কি যাবে তারা? সুব্রত গান্ধীবাদী, তার কি মত? সুভাষচন্দ্রের দোষ যাই থাক্ বামপন্থীদের শ্বাসরোধ করার যে একটা প্রচেষ্টা চলছে কংগ্রেসের ভিতর থেকে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যাই হোক্ একদলের অবিচার সহ্য করেও তাদের এখন চুপ করে কাজ করে যেতেই হবে। কোন্ পথ দরকার তা লোকেরাই একদিন বেছে নেবে। নিশ্চয়ই নেবে।

সুব্রতর বাড়ীর দিকে এগোতেই নন্দ আর অর্জ্জুনের সঙ্গে দেখা হলো। বেলা পড়ে এসেছে সোনালী আলোতে লালচে আমেজ ধরেছে—একটু বাদেই সন্ধ্যে হবে।

"কোথায় যাচ্ছিস্ নন্দ?"—প্রবীর মুখ টিপে হাসল।

"এই—বাড়ী"—উদাস কণ্ঠে, ম্লানমুখে নন্দ উত্তর দিল।

"আমিও গিয়েছিলাম তোদের বাড়ী—সব শুনলাম।"

"কি শুন্‌লি ?"

"কি আবার—জানিস তো সবই।"

"হুঁ—"

"তোর সঙ্গে বিশেষ কথা আছে—"

"কি এমন কথা ?"

"অমন বৈরাগীর মত ভাব দেখাচ্ছিস্ কেন ? শোন্ এদিকে—"

অর্জ্জুন হাসল।

প্রবীর নন্দকে একটু আড়ালে নিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে কি সব কথা বলল প্রবীর। নন্দর মুখের কালো ছায়া ক্রমে দূর হতে লাগল সেই সব কথা শুনে। অর্জ্জুনকেও কাছে ডাকা হল। তিনজনে মিলে অস্ফুটকণ্ঠে কি যেন ঠিকঠাক করল তারা।

"এবার যা তবে—আর হাহুতাশ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিস্ না বাপু, বুঝলি—"

প্রবীর হো হো করে হেসে উঠল।

"তাহলে এই ঠিক রইল, কি বল অর্জ্জুন ?"

"হ্যাঁ—"

"আচ্ছা—তোমরা এসো। আমি ইউনিয়নেই যাচ্ছি—সুব্রতর কাছে আজ আর যাওয়া হবে না, দেরী হয়ে গেছে।"

প্রবীর চলে গেল।

নন্দ ভাবতে ভাবতে চলছে।

"কিরে ভয় পেলি নাকি ?"—অর্জ্জুন হেসে জিজ্ঞেস করল।

"ভয় ! কিসে ?"

"প্রবীরের কথায় ?"

"না—ভয় কি—প্রবীরের উপর আমার বিশ্বাস আছে।"

সব প্রস্তুত। সব আগুন-লাগানো বারুদের মত তৈরী। বিস্ফোরণ হবে। ধর্ম্মঘট।

প্রবীর মনে মনে খুসী, উৎফুল্ল। গণি-মিঞার দল বাড়তে পারেনি। রজতমুদ্রার প্রলোভনকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করেছে অন্যান্য শ্রমিকেরা। কিন্তু কাল একটা দাঙ্গা না হয়। গণি-মিঞার উপরে বেশীরভাগ লোকই চটে রয়েছে। সেটা হলে কিন্তু বিপদ বাড়বে। পুলিশ প্রভুদের হস্তক্ষেপ প্রবীর পছন্দ করে না। ওতে কাজ পণ্ড হবে। দাঙ্গা না হওয়ার জন্য তাকে সতর্ক থাকতে হবে।

আজ ষষ্ঠী তিথি। একফালি চাঁদ বুঝি পূবদিকে উঠেছে। দেখা যায় না কিন্তু হঠাৎ আলোর স্পর্শে বিক্ষুব্ধ অন্ধকারকে দেখে তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

বড় বড় পা ফেলে প্রবীর বাড়ী ফিরেছে। ক্ষিদে পেয়েছে খুব। নন্দর কথা মনে পড়ল। হাসি ফুটে উঠল প্রবীরের মুখে। যা ঠিক হয়েছে তা বেশ রোমাঞ্চকর। উপন্যাস্যের কাহিনীর মত। কিন্তু এছাড়া উপায় নেই। প্রেম করতে গেলে দুঃসাহস থাকা চাই। কিন্তু এই প্রেমই কি জীবনের সব? আজকালকার যৌবনে কি ঐটিই সবচেয়ে বড় কথা? না। অনেক সমস্যা। অনেক কাজ করতে হবে। সে যেন

প্রেমে না পড়ে। বন্ধনের মধ্যে, দাসত্বের মধ্যে, অসাম্যের মধ্যে ওই জৈব বিলাসে সুখ কোথায়, শান্তি কোথায়? কোথায় যেন একটা পীড়া, একটা দুঃসহ বেদনা নিরন্তর খচ্ খচ্ করে বুকের মধ্যে। না, প্রবীরের ওতে রুচি নেই।

"প্রবীরদা"—

"কে? মাধু—কি ব্যাপার?"

দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে মাধবী তাকে ডাকছে।

"দাদার মুখ দেখে খুসী মনে হচ্ছে—কি ঠিক করেছ তুমি তার বিয়ের সম্বন্ধে?"

"ওরে বাপ্—সে বলবার নয়, বিয়ে হবার সময়ে জানবে।"

"বলবে না?"—মাধবীর ঠোঁট ফুলে উঠেছে।

"না।" প্রবীর হাসল।

"না বল্লে।" মাধবী ছুটে দাওয়ায় উঠল। মাধবী রাগ করেছে। এতটুকু বিশ্বাস তাকে প্রবীর করতে পারে না!

"মাধু—মাধু—শোন, আমার দিব্যি"—

মাধবী দাঁড়াল।

"শোন—বলছি"—

"কি?"

"ঠিক হয়েছে যে বিয়ের রাতে কাজললতাকে চুরি করে নিয়ে আসব আমরা।"

"এঁ্যা!"

"হ্যাঁ।"

মাধবী আবার এগিয়ে এল কাছে। চোখে তার ত্রাস।

"চুরি করে!"

"তাতে ভয় কি—কাজললতা ত' কচি মেয়ে নয় আর সে রাজীও আসতে—"

"যদি তার বাপ-মা পুলিশে খবর দেয়, যদি দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় ?"

"হলেই বা—বেআইনী কিছু ত' হবে না—মন্ত্রপড়ে, রীতিমতো আগুন জ্বালিয়ে বিয়ে হবে।"

মাধবী মৃদু হাসল, তবুও সে যেন আশ্বস্ত হতে পারছেনা।

"তুমি—তুমিও যাবে নাকি কাজললতাকে নিয়ে আসার সময় ?"

"দরকার হলে যেতেও পারি।"

"না"—হঠাৎ মাধবী যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ল, "না, তুমি যেয়ো না।"

"কেন ?" প্রবীর একটু অবাক হল।

মাধবী আবার নিজেকে সাম্‌লে নিল, "মানে—বেশী ভীড় করে গেলে লোক জানাজানি হতে পারে ত।"

"তা বটে—তবে আমায় যেতেও হবে না বোধ হয়।"

মিনতির সুরে মাধবী বলল—"সত্যি তুমি যেও না প্রবীরদা, তুমি গেলে এদিকের ভার কে নেবে ?"

"আচ্ছা—আচ্ছা, সে হবেখন, এবার যাই—ক্ষিদে পেয়েছে।"

মাধবী হাসল। চাঁদের আলো এবার স্পষ্ট হয়ে রূপ নিচ্ছে, তার স্পর্শ লেগেছে মাধবীর মুখে চোখে, তার এলো খোঁপায়।

"খেয়ে যাও না প্রবীরদা, তুমি বলছিলে না খাবে ?"

"বললেই বা কি, ও রকম হঠাৎ খেলে ভাল ভাল জিনিষ বাদ পড়বে যে।"

"সত্যি খাও না চাট্টি—এস—"

"না ভাই—আর একদিন খাব। এবার যাই, কেমন ?"

মাধবী কিছু বলল না। প্রবীরকে সে যেতে বলবে কেমন করে? হাঁ না সে কিছুই বলল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

"বাইরে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে পাগল বলবে মাধু, ভেতরে যাও।"

"বলুকগে যার যা খুসী"—

প্রবীর হেসে চলে গেল।

বলুকগে যার যা খুসী। ভয় করে না মাধবী। ভয়ে ভয়ে ভালবাসা যায় না। মাধবী তা জানে।

আচ্ছা। প্রবীর কি মাধবীকে কোথাও নিয়ে যেতে পারে না? নন্দর মত? হায়, সে আর বলে কি হবে। একবার শুধু হাত বাড়াক না প্রবীর। কিন্তু তা হবার নয়, হবার নয়। প্রবীর, মানুষ নয় যে। কেন যে মাধবী তাকে কাজললতাকে নিয়ে আসতে যেতে নিষেধ করল সে কি প্রবীর বুঝতে পারল? মোটেই না। প্রবীরের অখ্যাতি হওয়ার চেয়ে, তার বিপদের চেয়ে নন্দর বিয়ে না হওয়াই ভাল। দাদার বিয়ে না হলেও মাধবীর সহ্য হবে কিন্তু প্রবীরের গায়ে যেন আচড়টুকুও না লাগে। কিন্তু প্রবীর বুঝবে না এ সব কথা। প্রবীর পাথর।

ধর্ম্মঘট আরম্ভ হলো।

বেলা ন'টা নাগাদ বস্তীতে গিয়ে হাজির হল প্রবীর। প্রায় সবাই আছে।

আবদুল বলল, "গণি মিঞা কিন্তু গেছে তার লোকজন নিয়ে"—

"ক'জন গেল সবশুদ্ধ?"

"গোটা বাইশজন।"

"হুঁ—আচ্ছা, কয়েকজন মিলে চল একবার দুপুরে যাব, আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক, যদি গণিমিঞার মতি বদলায়।"

আবদুল হাসল, "মানুষ চিনলেন না বাবু?"

"চিনেছি—তাই ত' ভরসা হয় যে ও বদলে তোমাদের মত হতেও পারে।"

আবদুল চুপ করে রইল। অবশ্য কথাটায় তার মত যে বদলাল না তা বোঝা গেল।

দুপুরে গিয়ে সব হাজির হলো মিলের সামনে। জন দশেক। প্রবীর, আবদুল, যতীন, তাহের, অবিনাশ, আরও কয়েকজন। সবাই আসতে চেয়েছিল কিন্তু প্রবীর আসতে দেয়নি তাদের।

দুপুরের বাঁশী বাজল।

গণি মিঞা ও তার সঙ্গীরা বেরিয়ে এল।

প্রবীরদের দেখে গণি মিঞার মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আচম্‌কা ভূত দেখার মত ভাব খানিকটা ফুটে উঠল তার মুখে, মুহূর্ত্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে সে ফিরে যাচ্ছিল আবার মিলের মধ্যে।

প্রবীর ডাকল, "গণি ভাই—শোন—"

গণি মিঞা দাঁড়াল, "কি বলছেন?"

তার দু' তিনজন সঙ্গী ভিতরে চলে গেল, প্রবীর তা দেখ্‌তে পেল।

"শোন, আমি যা বলি তা মন দিয়ে শোনো ভাই—"

"বলুন"—গণি মিঞার চোখে সন্দেহ, কণ্ঠে বিরক্তি।

"তোমরা স্বাধীন—তোমাদের বাধা দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই, কিন্তু একটা জিনিষ মনে রেখো—পৃথিবীতে পরের কথা না ভাবলে তোমার কথাও কেউ ভাববে না। এই নিয়ম।"

"কি বলতে চান আপনি ?"

"তুমি তোমার সঙ্গীদের জন্য একটু আত্মত্যাগ কর ভাই। এতে ওদেরও ভাল হবে, তোমারও হবে।"

"আমি ত' আপনাদের বলেছি আমার মত :"

"তুমি কি একবার ভেবে দেখবে না ব্যাপারটা ?"

"আজ্ঞে না।"

"আমার অনুরোধ ভাই, শ্রমিক হয়ে তুমি অন্য ভাইদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।"

"বিশ্বসঘাতকতা নয় বাবু, মালিকের সঙ্গে নিমকহারামী করতে পারব না। আমায় মাফ করবেন।"

"এই তাহলে শেষ কথা ?"

"জী।"

"আচ্ছা চল আবদুল।"

যতীন আর তাহের রাগে' ফুলছিল, কিন্তু প্রবীর বারংবার নিষেধ করে দিয়েছিল বলে চুপ করেই রইল।

ইতিমধ্যে কলের ম্যানেজার মিঃ সেন এসে হাজির হল। মাঝারী বয়সের ভদ্রলোক। গণি মিঞার কয়েকজন সঙ্গীর ভেতরে যাওয়ার তাৎপর্য্য বোঝা গেল।

সাহেবী পোষাক পরা মিঃ সেন গট্‌গট্‌ করে এসে দাঁড়াল সামনে মুখে তার জ্বলন্ত সিগারেট।

প্রবীরের দিকে দিকে কটমট করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে মিঃ সেন বলল, "আপনিই সেই notorius প্রবীর চৌধুরী—এদের লীডার?"

প্রবীর হাসল, "হয়ত notorious কিন্তু লীডার নই—আমি এদের একজন বন্ধু।"

"বন্ধু! Rot—কাজ নেই তাই বনের মোষ তাড়াচ্ছেন!"

"তাতে ক্ষতি কি? পরের রক্ত খেয়ে জোঁক না হয়ে বনের মোষ তাড়ানো ঢের ভাল।"

"যাক্‌ ওসব কথা—আপনি এখানে এসেছেন কেন?"

"দেখতেই পাচ্ছেন।"

"আপনি একে ত' এদের incite করেছেন তাছাড়া আবার এদের মধ্যে এসে উস্কাচ্ছেন—এর ফল ভাল হবে না।"

"তা জানি—কিন্তু আমার ভয় নেই।"

"বাধ্য হয়ে আমাকে আজকে পুলিশে report করতে হবে।"

"পুলিশদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে তা ছাড়া report ত' করেছেনই। লুকোচ্ছেন কেন?"

"যাক্‌—I have no spare time to waste on you, আপনি আর এদের উস্কাবেন না এই বলে দিলাম।"

"আপনার যা বলবার বলুন, আমার যা করবার আমি করব।"

"Da—rot"—মুখের সিগারেট ছুড়ে ফেলে মিঃ সেন গণি মিঞার দিকে তাকিয়ে বলল, "দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, ভেতরে যাও—go and work—"

মিঃ সেন গণি মিঞাদের নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে আবদুল

প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে সে একবার বলল, "I thought as much, যাক্—তবু তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি—এখনও সময় আছে। ভাল চাও ত' কাজে এসো"—

আবদুল হাসল, উত্তর দিল না।

মিঃ সেন চলে যাওয়ার পর যতীন ফেটে পড়লো, "ইচ্ছে করছিলো গণি মিঞার ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে আসি।"

তাহের সায় দিল।

প্রবীর বলল, "সাবধান, অশান্তি যেন কোন মতেই না হয়। চুপচাপ শান্তভাবে তোমরা থাকবে। এটা জেনো যে ও কুড়ি বাইশজন লোক দিয়ে মিল চলবে না। আমি এখন, বাড়ী যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের আবার বলে যাচ্ছি—কোনো রকম উত্তেজনা দেখিয়ে, ঝগড়াঝাটি করে কাজ পিছিয়ে দিও না।"

বিকেল হতেই অবিনাশ ছুটে এলো।

"মুস্কিল হয়েছে বাবু।"

"কি হলো আবার? প্রবীর জিজ্ঞেস করল।

"আপনি চলে আসার পর যতীন, তাহের ও আরও অন্যান্য জন পঞ্চাশেক লোক গিয়ে মিলের সামনে খুব চেঁচামেচি করেছে, পরে গণি-মিঞা ওরা যখন ফেরৎ আসছিলো তখন ওদের ধরে খুব মারধোর করেছে।"

"এ্যাঁ! সেকি!"

প্রবীর ছুটল।

আবদুলকে নিয়ে প্রথমেই গেল সে গণি মিঞার ওখানে।

গণি-মিঞা তাকে দেখেই কাৎরে উঠল, "আপনি শেষে এই করলেন বাবু?"

"সে কি গণিভাই! বিশ্বাস করো, আমার অগোচরে হয়েছে এসব, আবদুলও এসব জানত না।"

গণি মিঞা বিশ্বাস করলো না তার কথা, "আমাকে ভাল করে সবাই বললে কি আমি আর যেতাম ফেলে—কি দরকার ছিল মারপিটের? দেখুন—কি রকম চাম্‌ড়া ফেটে ফেটে রক্ত বেরিয়েছে—"

গণি-মিঞা দেহের ক্ষত ও প্রহারের চিহ্নগুলো দেখাতে দেখাতে প্রায় কেঁদে ফেললো।

প্রবীর মনে মনে ক্রুদ্ধ হলো যতীন ওদের ওপর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে একটু হাসলও। অনেক লোক থাকে যারা শক্তের ভক্ত, মিষ্টিকথা কানে তুলবেই না। গণি-মিঞা সেই দলের।

"আমায় বিশ্বাস করো গণিভাই, আমি মিথ্যে কথা বলিনা। আমি এসব জানতাম না, যাই হোক—এর বিহিত আমি করবই। ধর্ম্মঘট চলুক, এরি মধ্যে আমি এর বিচার করাব, তুমি সে বিচারের ফলাফলে যাতে খুশী হও, সে দায়িত্ব আমি নিলাম।"

গণিমিঞা কাৎরাতে লাগল।

এমনিভাবে যারা যারা প্রহৃত হয়েছিল তাদের সবার কাছে যেতে হল প্রবীরকে।

সন্ধ্যার পরে সকলে ইউনিয়নে জড় হল। যতীন, তাহের ও বিক্ষোভ-প্রকাশকারী অন্যান্য'সকলকেই কঠিনভাবে তিরস্কার করেছিল প্রবীর। তারা অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইল।

প্রবীর সকলকে বলল, "আজ যা ঘটেছে তা মেটেই আমায় খুশী করেনি। আমি যা চাইনি, যা করলে তোমাদের নিজেদের ক্ষতি হবে

তাই তোমরা করেছ। আমার এবং তোমাদের সকলেরই দুর্ণাম রটল আমাদের গুণ্ডা ভাবলেও কিছু বলবার নেই। কিন্তু একথা তোমরা মনে রেখো যে শ্রমিকদের জীবনে আজ এই ধর্ম্মঘট আর মারামারিটাই শেষ কথা নয়। একদিন দেশের শাসনভার আসবে তোমাদের হাতে, একদিন দেশের সব কিছু তৈরী করবে, বদলাবে তোমরা। সে কথা তোমরা বিশ্বাস না করলেও তা একদিন ফলবে। সুতরাং তোমাদের কি এসব সাজে?"

সকলেই চুপ্‌চাপ্। অখণ্ড নিঃশব্দতা।

"যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। কাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে যেন ধর্ম্মঘট চলে, নইলে—নইলে—দুঃখের সঙ্গেই বলছি আমি—আমায় তোমরা হারাবে।"

নিস্তব্ধতা। একটা ছুঁচ পড়লেও যেন আওয়াজ শোনা যাবে।

জমিদারের পাইক হারাণ মণ্ডল এসে সামনে দাঁড়াল। শশাঙ্কবাবু নমস্কার জানিয়েছেন প্রবীরবাবুকে।

প্রবীর বেরোল।

আবার সেই খাস্ বৈঠকখানা।

অভ্যর্থনা জানাল শিখা। জড়ির পাড়ওয়ালা আকাশের মত নীল শাড়ীতে তার রূপচর্চ্চাকে আরও প্রকট, আরও জ্বালাময় করে তুলেছে সে।

"বসুন, বাবা কাছারীতে গেছেন—এখুনি আসবেন।"

প্রবীর বসল।

"ধন্যবাদ। আশা করি ভাল আছেন?"—প্রবীর বলল।

শিখা হাসল, "ধন্যবাদ। ভালই আছি—আপনি?"

"বেশী ভাল না, কেন বুঝতেই পারছেন।"

শিখা মাথা নাড়ল, "বুঝতে পারছি। কিন্তু ভাল কাজ করে যারা তাদের এই ত' অদৃষ্ট-লিপি।"

প্রবীর একটু বিস্ময় বোধ করল, "আমি তাহলে ভাল কাজ করছি বলছেন!"

"তাইত বলছি।"

"আপনি আমার কার্য্যকলাপে বিশ্বাস করেন?"

শিখা আবার হাসল, মেমসাহেবদের মত ঠোঁটটা বেঁকিয়ে একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "বিশ্বাসের কথা বলতে পারিনা কিন্তু I have sympathy for it, I don't know why."

প্রবীর বুঝল সব। অভিজাত্যের আধুনিক মুখোস। সে চুপ করে রইল।

ঘরে একটা মৃদু সৌরভ। জমিদার-তনয়ার দেহ-নিস্থৃত বিলাতী এসেন্সের গন্ধ।

শিখা এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়েছিল প্রবীরের দিকে। যেমন করে চিত্রানুরাগীরা তাকিয়ে থাকে ভাল ছবির দিকে। উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল সে প্রবীরের প্রতিটি কথা আর তার কণ্ঠস্বরের ওঠানামা। যেমন করে গীতোন্মাদ শ্রোতা সব ভুলে ওস্তাদ গায়কের গান শোনে। গভীর উৎসাহের সঙ্গে সে লক্ষ্য করেছিল প্রবীরের হাত-পা নাড়া, আঙুলের চঞ্চলতা, তার চোখের তারার ইতস্ততঃ নড়াচড়া। যেমন করে

নৃত্যচ্ছন্দোমুগ্ধ দর্শক কীর্ত্তিমান নর্ত্তকের প্রতিটি দেহভঙ্গিমা নিষ্পলকনেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করে।

"আপনার বাবা ত' আসছেন না—দয়া করে"—

"আপনি দেখছি ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন ?" শিখার মুখ অন্ধকার হল।

"না, সত্যি অনেক কাজ আছে।"

"বাবা আপনার আসবার খবর পেয়েছেন। আর একটু ধৈর্য্য ধরুন"—

গ্রামের জমিদার, মিলের মালিক, তাঁর কথাই আলাদা অগত্যা রহু ধৈর্য্যং।

"আচ্ছা প্রবীরবাবু, আপনার বুঝি গ্রাম খুব ভাল লাগে ?"

"হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?"

"কারণ শিক্ষিত ছেলেরা কাজের জন্য সহর ছাড়তে চায় না; তাছাড়া রুচির দিক থেকেও একঘেঁয়ে লাগে।

"আমার ত' কাজের—মানে চাকুরীর মোহ নেই আর গ্রামও আমার একঘেঁয়ে লাগে না। আমি নিজেকে দেশসেবক বলে ভাবতে চাই, আর আমাদের দেশ মানে গ্রাম, সহর নয়, তাই গ্রামেই আমাকে থাকতে হবে।"

"আপনি কি সত্যি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন সম্পূর্ণভাবে ?"

"চেষ্টায় আছি।"

"ওঃ"—

"আপনার কি গ্রাম ভাল লাগে না ?"—প্রবীর প্রশ্ন করল।

"লাগত না আগে, খুব dull লাগত, তবু যে এসে থাকতে হয় সে বাবার জন্য। কাজের জন্য বাবা এসে থাকেন আর তিনি একা থাকতে পারেন না বলেই আমাদের আসতে হয়।"

"বুঝেছি," প্রবীর হাসল, "মানে সহরকে যতই ভাল লাগুক, অন্ন ও জীবনের খোরাক জোগাচ্ছে এই গ্রাম।"

শিখার চোখমুখ খানিকটা লজ্জায়, খানিকটা অপমানে কালো হয়ে উঠলো।

"কিছু মনে করবেন না আমার কথায়। যাক্—আগে লাগত না হয়ত, কিন্তু এখন? এখনও কি ভাল লাগে না?"

শিখা ক্ষণকাল চুপ করে প্রবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব সামলে নিচ্ছে তা বেশ বোঝা গেল। তারপরে আস্তে আস্তে তার মুখের ম্লানিমা দূর হয়ে গেল, চকচকে ধারাল ছুরির ফলার মত শানিত ও দীপ্তিময় হয়ে উঠল তার সারা মুখমণ্ডল, দেহে আসল একটা চাঞ্চল্যের স্রোত।

নিচের ঠোঁটের একটা কোন একটু চেপে ছেড়ে দিয়ে. একটু হেসে, শিখা বলল, "লাগছে। I am now changed—গ্রামকে এখন আমার সত্যি ইণ্টারেষ্টিং মনে হচ্ছে।"

"খুশী হলাম আপনার কথা শুনে।"

"দিদিমণি"—ট্রেতে করে চায়ের পেয়ালা ও জলখাবারের প্লেট নিয়ে চাকর এসে দাঁড়াল।

"বাবুর সামনে রাখ্"—শিখা হুকুম করল।

"এসব কি?"—প্রবীর প্রশ্ন করল।

"দেখতেই পাচ্ছেন—চা আর জলখাবার।"

"কিন্তু আমায় মাফ্ করতে হবে।"

"কেন?"

প্রবীর চুপ করে রইল।

"কেন বলুন ত'?"—শিখা প্রশ্ন করল।

"শুনবেন ? আমি এখানে এসেছি দশজনের হয়ে—কাজে, চা আর জলখাবার খেতে নয়।"

"খেলেই বা দোষ কি ? কাজ না হয় বাবার সঙ্গে, আমার সঙ্গেত সে সম্পর্ক নয়। বন্ধুত্ব কথাটায় কি বিশ্বাস নেই আপনার ?"

"আছে। কিন্তু আপনাতে আমাতে অনেক প্রভেদ। গরীবের সঙ্গে ধনীর বন্ধুত্ব কোন কালে টেঁকে না। যাই হোক্, অভদ্রতারও সীমা আছে, আমি চা খাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ।" একটু শ্লেষ যেন মেশানো আছে শিখা'র কণ্ঠস্বরে।

প্রবীর হেসে চায়ের কাপ তুলে নিল। খাবার ছুঁল না।

শিখা গম্ভীরভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

নিঃশেষিত চায়েব কাপ সশব্দে ট্রের উর্পর রক্ষিত হল।

প্রবীর শিখার দিকে তাকাল। কেন এই মেয়েটি এত গায়ে পড়ে তার সঙ্গে আলাপ করে, তাকে খুশী করার চেষ্টা করে ? এ সাধারণ গৃহস্থ-কন্যা নয়, মাধবী নয়, তবু কেন এই আগ্রহ ? বিলেতের আব-হাওয়ায় পরিপুষ্ট এই যুবতী, ঐশ্বর্য্যের সুখ-বিলাসে অভ্যস্ত এই বাস্তববাদী, শিক্ষিতা ও আধুনিকা কি প্রত্যাশা করে তার কাছে ?

কারণটার আভাস পায় প্রবীর। সে একবার শিউরে উঠল। না, তার অত সখ নেই, সময় নেই, রুচি নেই।

দূরে থাক। প্রবীরের মন,. প্রবীরের আদর্শ তাকে জানাল। সে মনে মনে মাথা নাড়ল। তাই থাকবে সে, ওসব চাকচিক্যের মোহ থাকলে নায়েবের ছেলে জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করত না, জমিদার হবারই চেষ্টা করত।

চটি জুতোর শব্দ শোনা গেল।

"বাবা আসছেন"—শিখা বলল।

শশাঙ্কবাবু ভিতরে ঢুকলেন।

"নমস্কার"—প্রবীর উঠে দাঁড়াল।

"নমস্কার—বোস, ওঃ, চা খাচ্ছ ?"

"আজ্ঞে না, ও শেষ হয়ে গেছে।"

"বেশ, বোস।"

"আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন—বোধ হয় ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে ?"

"হ্যাঁ।"

"কি বলতে চান ?"

"বলছি। তার আগে একটা কথার জবাব দাও।"

"বলুন।"

"তুমি কি জীবনে প্রতিষ্ঠা চাও না ?"

"চাই না বললে হয়ত মিথ্যে কথা বলা হবে। চাই বৈকি। তবে তার জন্য চেষ্টা করার সময় নেই আমার।"

"তাহলে এম্‌নি অর্থ-হীন ভাবেই ভেসে বেড়াতে চাও ?"

"আমি যে কাজ করে বেড়াই তা যদি ভেসে বেড়ানোই হয় তাতে আমার কোনো অনিচ্ছা নেই, বরঞ্চ আমি তাতে নিজেকে ধন্য মনে করব।"

শিখা চুপ করে বসে আছে। তার নজর এবার বাইরে নয়, প্রবীরের মুখের উপর।

"শোন"—শশাঙ্কবাবু মৃদু হেসে বললেন, তোমাকে যদি মিলের ম্যানেজার করে দিই—কাজ করবে ?"

বলেই তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন প্রবীরের দিকে। শিখাও এবার তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দু'জনেই দেখতে চায় কি ভাবান্তর হয়।

প্রবীর হাসল, "ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। সরকারের পররাষ্ট্র নীতির একটা প্রধান প্যাঁচ হচ্ছে দেশের সবচেয়ে ভাল মাথাগুলোকে কিনে অকেজো করা—আপনি সেটার মর্ম্ম উপলব্ধি করেছেন মনে হচ্ছে। আপনি আমায় বড় চাকরী দিয়ে ঘুস দিতে চাচ্ছেন ?"

"ধর তাই"—

"তবে শুনুন, আমার রক্তে বিশ্বাসঘাতকতার বিষ নেই।"

"ভেবে দেখ।"

"ভাববার কিছু নেই। এই সব কথা ছাড়া অন্য কিছু যদি আলোচনার না থাকে তবে আমি উঠ্‌ছি।"

"উঠো না —বোস।"

শিখার মুখ ম্লান। সে যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

"তোমার সঙ্গে আমার আঁপোষ হবে না মনে হচ্ছে।" শশাঙ্কবাবু ললাটদেশ কুঞ্চিত করে বললেন।

"আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

"দেখ—তোমাদের ধর্ম্মঘটে আমার যে বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে তা আমি স্বীকার করছি কিন্তু তোমাদেরও যে ক্ষতি হচ্ছে তাও তোমাকে স্বীকার করতে হবে।"

"স্বীকার করতেই যে হবে তার কোন অর্থ নেই। যাদের আছে তাদেরই ক্ষতি হয়, যাদের কিছুই নেই তার লাভও নেই ক্ষতিও নেই। বরঞ্চ লাভই যে হতে পারে এই আশাটাই বেশী করা যায়।"

"সে যাই হোক্, তোমার প্যাঁচালো কথা সত্ত্বেও আমি বলছি যে ব্যাপারটাকে আর টেনে বাড়ানো সুবিধের হবে না।"

"আমি তা স্বীকার করি। এখন আপনিই বলুন কি করবেন, কারণ দাবী আমাদের এবং আমাদের দাবী বজায় থাকবেই তা না মেটা পর্য্যন্ত।"

"কিছুই কি বদলাবে না? আমি ঘরবাড়ী অবিলম্বে মেরামত করিয়ে দিচ্ছি—একস্ট্রা খাটুনীর জন্যও একটা অতিরিক্ত মজুরীর ব্যবস্থা হবে। কিন্তু আপাততঃ এই পর্য্যন্ত—"

"আমি তাতে রাজী নই। আমাদের সবগুলো দাবীই সমান গুরুত্বপূর্ণ—"

"তোমার মনোভাব বিরক্তিকরভাবে আপোষ-বিরোধী—"

"না, আপোষ-বিরোধী নয়, হার স্বীকারের বিরোধী।"

"তাহলে তুমি রাজী নও?"

"আজ্ঞে না।"

শিখা অগ্নি-স্পৃষ্ট বারুদের মত এতক্ষণ পরে ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল, "তুমি জোর করে নিজেকে এত ছোট করো না বাবা—তুমি কি চুরি করেছ নাকি যে এত মাথা নীচু করবে?"

শশাঙ্কবাবু মাথা নাড়লেন, "তুই চুপ কর্ মা।"

প্রবীর উঠে দাঁড়াল, "তাহলে আসি?—"

"ভেবে দেখবে কথাগুলো।"

"সব দাবী মেটাতে রাজী না হলে ভাবার মত কিছু নেই। এতে আপনি রাগ করছেন হয়ত কিন্তু আমার উপায় নেই—"

"উপায় নেই কেন? তুমিই ত লীডার এদের—"

"লীডার বলেই ত মুস্কিল। দশের লীডার হতে গেলে দশজনকে যে মানতে হয়। না মানলে লীডারেরা যা হন তার বিরুদ্ধেও ত' আমাদের অভিযান।"

"তাহলে এসো।" শশাঙ্কবাবু উঠে দাঁড়ালেন, একটু হেসে বললেন, "তুমি অনমনীয় কর্ম্মী দেখছি। কাল বদ্‌লেছে তাই, নইলে যদি

আগেকার দিন থাকত তবে তোমার মুণ্ডুটা বোধ হয় কাঁধের উপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটীতেই লুটাত।”

প্রবীরের মুখ মিষ্টি হাসিতে ভরে উঠলো, “কাল বদ্‌লেছে, নিজেই স্বীকার করলেন, তাই বলছি আমাদেরও স্বীকার করুন আপনি।”

“স্বীকার করব! তোমার শিষ্যদের বোলো যে তাদের না খাইয়ে শুকিয়ে মারব আমি।”

প্রবীর আবার হাসল, “তারা বেশী ঘাব্‌ড়াবে না, কারণ তারা জানে যে আপনিও ক্ষুধার্ত্ত। তবে তফাৎ এই যে তাদের ক্ষিদে একমুঠো ভাতের আর আপনার ক্ষিদে ঐশ্বর্য্যের, প্রতিপত্তির, খ্যাতির—”

“তুমি এসো এখন”—প্রচ্ছন্ন ক্রোধের ও নিষ্ফল আক্রোশের আগুনে চক্‌চক্ করছে শশাঙ্কবাবুর চোখ ছুটো। হাত দিয়ে তিনি দরজাকে নির্দ্দেশ করলেন।

“স্বচ্ছন্দে”—হেসে বলল প্রবীর, “আচ্ছা নমস্কার। ধর্ম্মঘট তবে চলবে।”

“চলুক।”

প্রবীর মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শশাঙ্কবাবু বোধ হয় দাঁতে দাঁত ঘষছিলেন, প্রবীরের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “হয়ত, হয়ত ওর কাছে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে হার মানতেই হবে, ষ্ট্রাইক সফল হবে। কিন্তু তারপর? আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু—দেখা যাক্।”

“তারপর কি?—কি বলছিলে বাবা?” শিখা প্রশ্ন করল।

“কিছু না।” শশাঙ্কবাবু একটি বই খুলে বসলেন।

ছুটো হাত কঠিনভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে শিখা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছে। যেন কোনও একটা অদৃশ্য বস্তুকে সে তার হাতের তালুতে পিষে ফেলতে চায়।

খানিক পর।

ইউনিয়নে সবাই এসেছে। ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ, সবাই আশঙ্কায়, আগ্রহে ওদের বুক ধুক্‌ধুক্ করছে অনুক্ষণ।

আবদুল বলল, "এরা একটু ঘাব্‌ড়ে পড়েছে"—

"কেন?" প্রবীর প্রশ্ন করল। প্রশ্ন করে সকলের মুখের দিকে তাকাল।

গিজ্‌গিজ্ করছে শ্রমিক নরনারীর দল। ইউনিয়নের ঘরের বারান্দায় বসেছে মুরুব্বিরা, সামনের উঠোনটায় বাকী সকলে—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। এত ভীড়, অথচ একটিও টুঁ শব্দ নেই। সবাই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছে ফলাফল ও পরিণতি সম্বন্ধে জানবার জন্য।

আকবর আলি প্রাচীন লোক। রাশভারী অথচ নম্র। সে হেসে বল্ল, "মজুরের ত' জমানো টাকা থাকে না বাবু, হাতে পেটে টান লেগেছে যে—"

প্রবীর বলল, "সব কথা ত' শুনলেই তোমরা। আজ না হয় দু'দিন বাদে যে রফা হবেই এ বিশ্বাস আমি রাখি। তবে তোমাদের ধৈর্য্যের উপর এর সাফল্য নির্ভর করছে। কষ্ট করতেই হবে ভাই—জিতলে সে কষ্ট ভুলে যাবে।"

আকবর মাথা নাড়ল, "আমি তা মানি বাবু, কিন্তু ছেলেপিলে, মাগ্‌বৌদের নিয়েই যে মুশ্‌কিল"—

"আবদুল"—

"এঁ্যা ?"

"ফাণ্ডে কত টাকা আছে এখন ?"

"যা আছে তাতে দিন দুই সকলকে সাহায্য করা যায়।"

"বেশ। শোন ভাই সব—কষ্ট আমাদের কর্ত্তেই হবে। যথাসম্ভব টেনে তোমরা আরও দু'একদিন কাটাও, নিতান্ত প্রয়োজনে ইউনিয়নের টাকা তোমাদের ভাগ করে দেওয়াও হবে কিন্তু একথা জেনে রেখো যে যদি তোমরা হার মনো তবে তোমাদের গলায় দড়ি দেবার পথটাই পাকা হবে।"

সকলে নিরুত্তরে কথাগুলো শুনল।

হঠাৎ সমবেত লোকদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। তাদের ভেদ করে দারোগা প্রিয়তোষবাবু দুজন কনষ্টেবল নিয়ে এগিয়ে এল প্রবীরদের সামনে।

"প্রিয়তোষবাবু যে—আসুন, বসুন।" প্রবীর হেসে বলল।

প্রিয়তোষবাবু মাথা নাড়ল, "বসব না প্রবীরবাবু। আমি এসেছি on duty—"

"কি ব্যাপার ?"

"ব্যাপার কিছু নয়, এ মিটিং ভেঙ্গে দিন—"

"কেন ? আর এত ঠিক মিটিং নয়, ঘরোয়া আলোচনা"—

"আমি তা বুঝলেও সরকারের তা মত নয়। দাঙ্গার ফলে situation আরও খারাপ হয়ে গেছে"—

শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে।

প্রবীর বলল, "মিটিং ভেঙ্গে দিতে আপত্তি নেই কারণ আমাদের এতে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। হ্যাঁ, দাঙ্গার তদন্তের কতদূর এগোল ?"

"এগিয়েছে অনেক দূর কিন্তু তাতে আপনার ক্ষতিই সবচেয়ে বেশী হবে।"

"সে জানি।"

"কিন্তু আমার একটা কথা মনে রাখবেন। আপোষের সময় এই দাঙ্গার বিষয়েও নিষ্পত্তি করে নেবেন। একে বাড়তে দেবেন না।"

"ধন্যবাদ প্রিয়তোষবাবু, আপনার কথাগুলো আমি নিশ্চয়ই মনে রাখব।"

মিটিং ভেঙ্গে গেল।

বাড়ী ফিরবার ঘণ্টাখানিক পরেই সুব্রত এল। খদ্দরধারী, শান্ত, সমাহিত ভাব তার, মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত। বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিটাকেই বড় করে দেখে ও, আকাশের চেয়ে মাটীকেই বেশী বিশ্বাস করে। তাই বলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা যে তার কম তা নয়।

হেসে বলল, "তোকে অভিনন্দন জানাতে এলাম রে—"

প্রবীর হাসল, "আয় ভাই, আয়"—

সুব্রত বলল "তোদের ধর্ম্মঘট খুব জোর চলছে—সবাই সহানুভূতি জানাচ্ছে।"

"সবাই?" প্রবীর প্রশ্ন করল।

সুব্রত বুঝল, বুঝে হেসে মাথা নাড়ল, "সবাই নয় বটে, কিন্তু তারা ক'জনই বা? সবাই বলতে গরীব আর চাষীদের কথাই বলছি আমি।"

"তা বটে।"

"জমিদারবাবু কি বলছেন?"

"জোর যার মুল্লুক তার।"

"বটে!"—সুব্রত একটু গম্ভীর হয়ে উঠল।

"হ্যা।"

"কিষাণ সভার রামনাথের সঙ্গে ঠিক হয়েছে যে শশাঙ্কবাবুর অধীনস্থ চাষী প্রজাদের একটা মিছিল বেরোবে কাল সকাল বেলায়—ধর্ম্মঘটীদের অভিযোগ দূর করার জন্য। কংগ্রেস সমিতির তরফ থেকে আমি আর যদুপতিবাবুও যাব। যে ভাবে হোক তোমাদের এ প্রচেষ্টাকে সফল করতেই হবে ভাই।"

প্রবীর সুব্রতর একটা হাত চেপে ধরল, আবেগে তার কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে উঠল, "সব কিছুতেই আমরা কি এমনিভাবে কাঁধে কাঁধ মেলাতে পারব না?"

সুব্রত হাসল, "পারব না কেন রে—সাময়িকভাবে মনান্তর বা মতান্তর হলেও এটা মনে রাখতেই হবে যে সবাই একসঙ্গে মিলে কাজ না করলে আমাদের মুক্তি নেই।"

প্রবীরের চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

ঠিক সেই সময়েই নন্দ ফিরে আসছিল জমিদারের কাছারী থেকে। চোত্ কিস্তি শোধ করে। সে যেত না, এখুনি সে যাবে কাজললতার সঙ্গে দেখা করতে, নেহাৎ হরিচরণের বাতের বেদনা আবার শুরু হয়েছে বলেই তাকে যেতে হয়েছিল। ধৈর্য্য ধরছে না তার, দ্রুতগামী তীরের মত সোজা তেতুলঝোরায় গিয়ে হাজির হতে ইচ্ছে হয়। এখন সে সোজা যাবে ধলেশ্বরীর ধারে, তারপরে নৌকো ভাসাবে পাল তুলে দিয়ে। তারপরেই সুন্দরী বিল আর পদ্মের স্বপ্ন। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের স্বর্ণ-দীপ্তিকে ম্লান করে দিয়ে এক অপরূপ মোহিনীমূর্ত্তি এসে তখন সামনে দাঁড়াবে।

হঠাৎ কে যেন ডাকল, "ওস্তাদজী—"

নন্দ থমকে দাঁড়াল। আর একটি মোহিনী মূর্ত্তি! কিন্তু এ মূর্ত্তি পুলকের শিহরণ জাগায় না, জাগায় একটা এড়িয়ে যাবার অনুভূতি। আলেয়া দেখে প্রাণভয়ে যেমন নাবিকেরা সতর্ক হয়, নিশ্চিত মৃত্যুর দীপ্ত শিখার আমন্ত্রণকে যেমন তারা এড়িয়ে চলতে চায়—সেই অনুভূতি।

ডানদিকে খালের দিকের সংকীর্ণ পথটা বেয়ে ললিতা আসছে। সিক্ত-বসনা, বাঁ হাতে কয়েকটা ধোয়া শাড়ী। অত্যাচার, অনিয়মের মধ্যেও তার যে দেহসৌষ্টব পঙ্কমগ্ন পদ্মের মত যৌবনশ্রীতে অপরূপ রয়েছে, গায়ের যে রঙে এখনো স্বর্ণচাঁপার ছায়া আছে—সেই দেহরেখা, সেই রূপ তার সিক্ত বসনের অন্তরাল থেকেও উদ্ধতভাবে আত্মপ্রকাশ করছে।

"কি ভাবছ গো ওস্তাদজী?" ললিতা হাসল, দাঁতগুলো তার ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

আলেয়া!

"ভাবব আবার কি—যাচ্ছি বাড়ী।" নন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করে এগোতে গেল।

ললিতা মাথা নাড়ল, ওর চোখের তারায় ফুটে উঠল প্রচ্ছন্ন হাসি,

"তা ত' যাচ্ছই কিন্তু তবু কি যেন ভাবছ তুমি। কাউকে ভালবেসেছ নাকি ওস্তাদজী ?"

"এঁ্যা !"

"বলি কাউকে নিশ্চয়ই ভালবেসেছ—সে কে ?"

"দেখ, ঠাট্টা ভাল লাগে না ললিতা"—নন্দর কান লাল হয়ে উঠল, চোখে ঘনাল ক্রোধের কালো ছায়া।

"তা ত' লাগবেই না। কিন্তু ভেবে দেখ, আমায় ভালবাসনি তো ?"

নন্দ জ্বলে উঠল, "আস্পর্দ্ধা তোমার তো কম নয় ললিতা। আমার ঐ মিলের ইতরদের মত মনে কোরোনা তুমি—"

ললিতা জিভ্ কাটল, "তুমি চটেছ ওস্তাদজী—মাফ্ করো বাবা। ওকি, চল্লে ? শোন—"

"কি ?"

"একদিন এসো না আমার বাড়ী—তোমার গান অনেক দিন শুনিনি—"

"যেদিন যাত্রা হবে—শুনো।"

"তার জন্য যে তর্ সয় না গো।" ললিতা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

নন্দ ললিতার এই গায়ে-পড়া ভাব আর সহ্য করতে পারছিল না। দেখা হলেই ললিতা এমনিভাবে তাকে ঠাট্টা করে, নির্ল্লজ্জার মত আমন্ত্রণ জানায়।

সে এবার গর্জ্জে উঠল, "আমি তোর দালাল নই, বেশ্যা কোথাকার— আবার যদি দেখা হলেই ইয়ার্কি করবি তো মেয়েলোক বলে রেহাই দেব না।"

মিনিটখানিক। ললিতার হাসি থেমে গিয়েছিল। অবাক হয়ে সে

নন্দর মুখের দিকে তাকাল। নন্দর চোখ দুটোতে ঘৃণা আর রাগ যেন দুটো বিষাক্ত সাপের মত ফণা মেলে রয়েছে, আর উত্তেজনায় নাকটা তার ফুলে ফুলে উঠছে।

পরক্ষণেই মৃদু হেসে, মৃদু কণ্ঠে ললিতা বলল, "সব সময়ে মনে থাকে না যে আমি বেশ্যা, মাইরি বলছি—"

নন্দ ছুটে চলে গেল।

হঠাৎ ললিতার রূপান্তর হল। ক্ষুধার্ত্তা বাঘিণীর পিঙ্গল চোখের হিংস্রতা যেন তার চোখের তারা দুটোতে আত্মপ্রকাশ করল। উত্তেজনায় খাড়া হয়ে দাঁড়াল সে, হাড়মাংস চিবোনোর সময় যেমন কড়মড় শব্দ হয় তেমনি শব্দ হল তার দাঁতে দাঁতে লেগে।

যেন হাওয়াকে বলল সে, "এই বেশ্যার কাছে একদিন তোমায় গড়াগড়ি দেওয়াব ওস্তাদ—মাইরি বলছি—"

পশ্চিমের হাওয়া উদ্দাম হয়ে উঠেছে। মধ্যাহ্নের আকাশটা থেকে যেন চুঁয়ে চুঁয়ে আগুন পড়ছে। গলিত আগুন।

মনটা বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল। মন্দিরে যাবার পথে অশুচি-স্পৃষ্ট হলে যেমন মনে হয়।

কিন্তু মন্দিরে গেলে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে একটা পবিত্রতা বোধ হয় তেমনিভাবে আবার সব যেন মুহূর্ত্তে সুন্দর, ভালো, পবিত্র হয়ে উঠল। মাথার উপরকার সূর্য্যের দীপ্তি যেন ম্লান হয়ে গেল। সুরসভা থেকে যেন কোন অপ্সর-কন্যা নেমে এসেছে। তার অপরূপ মোহিনী মূর্ত্তি ইন্দ্রাণীকেও লজ্জা দেবে।

বুকের উপর এলিয়ে আছে সেই মোহিনী। নিজের রক্তের তালে তালে সেই অপ্সর-কন্যার কম্প্র-বক্ষের ভীরু স্পন্দন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ওদিকে পশ্চিমের বাতাস উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বর্ষশেষের রিক্ততার বাণী, বিরহের বাণী, বিদায়ের বাণী চারদিকের গাছপ্যালায়, লতায় পাতায় মর্ম্মরিত হচ্ছে। সুন্দরী বিলের শুষ্কপ্রায় জলের উপরকার নিবিড় পদ্মের বনে একটা বিদেশী সুর গুঞ্জরিত হচ্ছে। মধুলোভী ভ্রমর-গুঞ্জন। একটা জামরুল গাছের তলায় ক্লান্ত পক্ষ ছড়িয়ে দিয়ে দুটো ঘুঘু বিশ্রাম করছে—আলস্যমন্থর গতিতে গ্রীবা নেড়ে নেড়ে মাঝে মাঝে তারা এদিকে ওদিকে চকিত দৃষ্টি হানছে।

যে কান থেকে দুলছে একটা সোনার দুল, যার উপরে লতার মত ভীড় করে রয়েছে কয়েকগুচ্ছ অলক, তার কাছে মুখটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল নন্দ।

"শুনছ?"

"উঁ?"

"আর আটদিন বাদে।"

"উঁ?"

"তেরা বৈশাখ।"

"উঁ?"

"সন্ধ্যার পরে, রাত হোতেই—"

"হুঁ—"

"তোমায় নিয়ে যাব—"

"হুঁ—"

"তারপরে কি হবে জান?"

"উঁহুঁ—"

"চন্দন আর চেলী—মন্ত্র আর আগুন—"

"হুঁ—"

"তারপর? তারপর কি হবে বলতে পার?"

"উহুঁ—"

চোখে স্বপ্ন ঘনায়। কঠিন ও কোমল বুকে ঝড় ওঠে, নিঃশ্বাস ভারী হয়, দেহে শিহরণ জাগে, আর একটা জলন্ত পিপাসায় ওদের ঠোঁটগুলো কাঁপে থর থর করে।

মাথার উপরে, আতপ-দগ্ধ শূন্যতার কোন প্রান্তে যেন একটা চিল ডাকছে। কর্কশ কণ্ঠে।

তারিণী চৌধুরী ছেলেকে ডাকলেন।

"এই ধর্ম্মঘট কবে থামবে?"

"কি করে বলব"—প্রবীর হাসল।

"জমিদার শক্তিশালী লোক, তার সঙ্গে পারবে কি করে?"

"পারতেই হবে।"

"ওরা সব কালসাপের জাত প্রবীর—ওদের চটিয়ে লাভ নেই।"

"কালসাপকে নির্ব্বীষ করবার মন্ত্র আমরা শিখেছি বাবা।"

তারিণী চৌধুরী চুপ করলেন। চোখের সামনে গোটা পৃথিবীটা কেমন দ্রুতগতিতে রূপ বদ্‌লাচ্ছে সেই কথাই ভাব্‌তে লাগলেন তিনি। সে যুগ আর নেই।

তবু একটু ভেবে তিনি বললেন, "যদি ধর্ম্মঘট অনেকদিন ধরে চলে তখন কিকরে চালাবে সবাই? ধর্ম্মঘট যারা করছে তারা তো আর সবাই জমিদার নয় যে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত না খেয়ে লড়াই করবে।"

প্রবীর হেসে বলল, "কেন আপনারা চালাবেন—গ্রামের সব উদার লোকেরা সাহায্য করবেন।"

"আমরা ?"

"হ্যাঁ, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে ? যারা ন্যায়ের জন্য, অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের কি আপনারা সাহায্য করবেন না ? না খেয়ে ওদের মরতেই দেখবেন ?"

তারিণী চৌধুরী নিঃশব্দে ছেলের দিকে তাকালেন। ছেলে বড় হোক, লেখাপড়া শিখুক, হাকিম হোক—এই তিনি চেয়েছিলেন। ছেলে আর পড়বে না, চাকরী করবে না, দেশ সেবায় দিন কাটাবে জেনে কিছু না বললেও তিনি খুব খুশী হন নি, মনের মধ্যে তার একটা অভিযোগ, একটা বেদনা-বোধ রয়েই গিয়েছিল। এই একমাত্র সন্তানই পৃথিবীতে তাঁর একমাত্র অবলম্বন বলে তিনি কিছুই বলেন নি। কিন্তু অন্তরে রক্ষিত সেই অভিযোগ ও উষ্মা, নিরাশা ও বেদনা যেন হঠাৎ অকারণে, এক মুহূর্ত্তে এখন উড়ে গেল। ইতিহাসের দুরন্ত স্রোতে তিনি ভেসে গেলেন, যে মহান ও অনিবার্য্য পরিণতির দিকে সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে আপাতদৃষ্ট বৈষম্য ও দুর্দ্দশার ভিতর দিয়েও তাকে তিনি আবার নূতন করে উপলব্ধি করলেন।

প্রবীর পিতার চিন্তাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে, একটু হেসে, তিক্ত-তার সঙ্গে বলল, "হয়ত আপনারা ওদের সাহায্য করবেন না, মানুষে মানুষে ভাই ভাই যে একটা সম্পর্ক আছে তা হয়ত আপনারা স্বীকার করবেন না। কিন্তু তাতে দুঃখ নেই—কিছু লোক না হয় মরবেই।"

তারিণী চৌধুরীর প্রশান্ত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, "দশ বছর আগে হয়ত তাই বলতাম—বলতাম ওরা মরলে আমার কি। আজ

তা বলবার উপায় নেই। প্রাকৃতিক জগতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের মত মনের মধ্যেও নিরন্তর একটা পরিবর্ত্তন হয়, বাহ্য জগতের ঢেউ অন্তরেও ভাঙ্গন ধরায়। আমিও বদলেছি, তাই আজ বলছি যে ওরা মরতে-পারে না—ওদের বাঁচাতে হবে—"

"বাবা! আপনি বলছেন!" প্রবীর উল্লাসে সোজা হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, আমি বলছি। অনেক ভেবে চিন্তে আজ প্রাণ খুলে তোকে আশীর্ব্বাদ করছি প্রবীর। তুই যে পথ বেছে নিয়েছিস্ তা অমানুষের পথ নয় বলে আজ তোকে বারংবার আমি আশীর্ব্বাদ করছি।"

অনির্ব্বচনীয় আনন্দে প্রবীরের মুখ ভরে উঠল, দেহের মাংসপেশী গুলোতে যেন নূতন শক্তির জোয়ার এল আর ধমনীতে ধমনীতে যেন অস্ত্রের ঝনৎকার ধ্বনিত হল।

বাপের পায়ে প্রণাম করে প্রবীর যখন নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ তার নজর পড়ল পিছনের জানালার দিকে। মাধবী তাকিয়ে আছে।

মুহূর্ত্তমাত্র। সেই এক মুহূর্ত্তেই মাধবীর মুগ্ধ দৃষ্টি আর তার লজ্জারুণ রঙীন রূপের ছবিটাকে প্রবীর দেখে নিল। তারপরেই তাকে আর দেখা গেল না।

বাইরে গেল প্রবীর। না, মাধবী পালিয়েছে। কিন্তু কেন?

লজ্জা। দিনান্তে প্রবীরকে একবার না দেখলে মাধবীর যে কিছুতেই চলবে না তা একমাত্র শিবঠাকুরই জানেন। প্রবীর জানবে কি করে? শুধু দেখার লালসা, কারণে অকারণে অন্ততঃ একবারও দেখার কামনা। তার জন্যই এসেছিল সে। তারিণী জ্যাঠার সঙ্গে প্রবীরকে কথা বলতে দেখে সে আর সাহস করে এগোতে পারে নি, তাই আড়াল থেকে, চুরী করে সে প্রবীরকে দেখছিল। হঠাৎ প্রবীর তাকে দেখতে

গেল, মাধবীর চৌর্য্যবৃত্তি ধরা পড়ে গেল। তাই চলে গেল মাধবী। চলে গেল নয়, পালাল। লজ্জা, লজ্জা।

সেদিনও ধর্ম্মঘট চালু রইল।

মিঃ সেনের সিগারেটের ছাই টেবিলের উপর স্তূপীকৃত হয়ে উঠল।

তার পরের দিন। একশ চাষী মিছিল করে গেল জমিদার বাড়ী। জানাল যে পাটকলের শ্রমিকদের দাবী মানা হোক। শশাঙ্কবাবু তাদের তাড়িয়ে দিলেন।

সেদিনও কলের বাঁশী বাজল না। ভেড়ার মত শ্রমিকেরা ভীড় করল না কারখানায়।

শশাঙ্কবাবু শুধু কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে রইলেন মিঃ সেনের দিকে। মিঃ সেন তাকাল অন্য দিকে।

সুব্রত আর যদুপতিবাবু সন্ধ্যাবেলায় আবার শশাঙ্কবাবুর কাছে গেল। তিনি বললেন তিনি ভেবে দেখবেন তাদের কথা। চাকা ঘুরচে।

তার পরের দিন।

একই ইতিহাস। নিথর যন্ত্রগুলো ঠাণ্ডা হয়েই রইল। মাঝে মাঝে শব্দ শোনা যায়। জুতোর মস্‌মস্‌ শব্দ। শ্রমিকদের নয়। মিঃ সেনের আর ভজুয়ার আর অন্যান্য কয়েকটা চাকরের

প্রান্তরের গান

শ্রমিকদের ইউনিয়নের তহবিল শূন্য হয়ে গেছে। অনেকেরই পেটে টান লেগেছে। তবু ওরা চুপচাপ, নির্বিকার।

শশাঙ্কবাবু মিঃ সেনকে বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন। ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে কি সব আলোচনা করলেন যেন। চাকা আরো ঘুরছে।

সারা গ্রামে, ঘরে ঘরে, দাওয়ায় দাওয়ায় উত্তেজিত আলোচনা। সবাই ভাবছে।

তারও পরের দিন।

পাটকলের চিম্‌নী বেয়ে কালো ধোঁয়া আর বেরোল না। এবার যন্ত্রগুলোর উপর ধূলোর একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ জমল। কলের বাঁশী আর বাতাস কাঁপিয়ে বাজল না। শ্রমিকেরা আর ভেড়ার মত হুড়মুড় করে কারখানায় এল না। যন্ত্রের শব্দে, কলগুঞ্জনে, চীৎকার আর কর্ম্ম-ব্যস্ততায় গ্রামের মাটী সেদিনও কাঁপল না। ধর্ম্মঘট চালু রইল।

শ্রমিকদের পেটে টান লেগেছে। তাতে কি? পেট থাকলেই ও হয়। তাই বলে হার মানতে হবে! পেট ত' কুকুরদেরও আছে। কিন্তু মানুষ ত' আর কুকুর নয়।

সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত প্রবীর করছে ছুটোছুটী। আবদুল আর তাহের, যতীন আর রামসিং, আতাউল্লা আর অবিনাশ সবাই মিলে ঘোরাঘুরি করছে প্রতি শ্রমিকের বাড়ী। সবাই মাথা নাড়ছে। না, কেউ হার মানবে না।

ওদিকে মিঃ সেন যাচ্ছে দারোগা প্রিয়তোষ বাবুর কাছে, ডাক্‌ছে গণি মিঞাকে চুপি চুপি। সবাই মিলে আবার শশাঙ্কবাবুর কাছে

যাচ্ছে। অনেক আলোচনা, অনেক তর্ক, অনেক বিতর্ক। কণ্ঠে তাঁদের ক্রোধ, উত্তেজনা। ক্রমে তাতে ভাঁটা পড়ে, সুর নীচু হয়, নরম হয়।

চাকা ঘুরে গেছে

চাকা সত্যি ঘুরে গেল। ভেড়ার পালের কাছে হিংস্র বাঘকে মাথা নত করতে হল। স্বার্থ। হয়ত আত্মসম্মানে লাগল, কিন্তু অনিবার্য্য ঘটনাকে আজ উপেক্ষা করলেও কাল তো করা যাবে না। আজ কষ্টেসৃষ্টে চাকার উপরে থাকলেও কাল চাকার নীচে পিষে যেতে হবেই। তার চেয়ে খানিক অপমান না হয় সহ্য করাই যাক্, আত্মমর্য্যাদা না হয় খানিকটা কমলই, কাজ উদ্ধার হোক ত। হয়ত ভেড়ার পালকে জব্দ করা যেত—কিন্তু তাতে ক্ষতিও ত' কম নয়। নূতন লোক আমদানী করাও ত' চারটি কথা নয়। আপাততঃ রফা হোক—আপোষ হোক্—কাজ চলুক। সময় আছে, সুযোগও হবে, তখন না হয় ধারালো নখের তীক্ষ্ণতাকে আবার দেখানো যাবে। সময় বদ্‌লেছে একথা সত্যি, তাই নিয়মের পরিবর্ত্তনকেও আজ মানতে হবে।

সকাল বেলাতেই ডাক এলো।

জমিদার শশাঙ্ক রায়ের চিঠি সমেত লোক এসেছে। ধর্ম্মঘট স্থগিত করার বিষয়ে আলোচনা করতে চান। তিনি শ্রমিকদের দাবী মেনে নিয়েছেন। এখুনি যেতে হবে প্রবীরকে।

তারিণী হেসে বললেন, "কালসাপকে পদানত করলে শেষে! ভাল, দেখো, বিষটুকু নিংড়ে ফেলো কিন্তু।"

প্রবীর হাসল।

আবদুলকে নিয়ে প্রবীর গেল।

ঘরের ভিতর শশাঙ্কবাবু, প্রিয়তোষ বাবু ও মিঃ সেন।

"বোস"—শশাঙ্কবাবু নির্দ্দেশ করলেন প্রবীরকে।

প্রবীর বসল।

আবদুলও বসল।

মিঃ সেন ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, আবদুলকে বললেন, "তুমি দাঁড়িয়েই থাক, বুঝলে?"

প্রবীর তাকাল মিঃ সেনের দিকে, অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত দুটো চোখ যেন জ্বলতে লাগল তার, সে বলল, "না, ও বসেই থাকবে। আর যদি তা সত্বেও 'না' বলেন তাহলে আমি বলব যে আপনাদের অন্তরের কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি। অন্তরের পরিবর্ত্তন না হলে আপোষ অসম্ভব।"

প্রিয়তোষ বাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, শশাঙ্কবাবু বাধা দিলেন, বললেন, "থাক্, বসেই থাক্ না লোকটা। যাক্—এখন কাজ সুরু হোক। শোন প্রবীর। আজ থেকে ষ্ট্রাইক্ বন্ধ করো, আমি তোমাদের সমস্ত দাবী মেনেই নিচ্ছি। বাড়ীঘরের মেরামত এখুনি হবে—অন্যান্য দাবী মেনে নিচ্ছি। কিন্তু কারখানার কাজ বেড়ে গেছে—এক ঘণ্টা উপরি খাটুনীটাকে শ্রমিকদের মানতেই হবে।"

প্রবীর মাথা নাড়ল, "আপোষ করতে গেলে দু'পক্ষকেই খানিকটা খানিকটা স্বার্থত্যাগ করতে হয়। বেশ, তারা না হয় তাই খাটবে, কিন্তু তার জন্য তাদের অতিরিক্ত কিছু দিতেও হবে।"

অনেকক্ষণ আলোচনা হল। শেষে ঠিক হল যে আজ থেকেই কাজ শুরু হবে, বাড়ীঘর কয়েকদিনের মধ্যেই মেরামত করা হবে—বেতন আপাততঃ শতকরা দশ টাকা করে বৃদ্ধি করা হবে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য ঘণ্টা ও বেতনের হিসাবানুযায়ী অতিরিক্ত পারিশ্রমিকও দেওয়া হবে। আরো কথা হল। শশাঙ্কবাবু ফৌজদারী মোকদ্দমাটা প্রত্যাহার করলেন প্রবীর ও শ্রমিকদের উপর থেকে। প্রত্যাহার-পত্র লিখে প্রিয়তোষবাবুকে দিয়ে দিলেন তিনি।

প্রবীর আবদুল ও প্রিয়তোষবাবু চলে গেল। তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে।

কড়া চুরুট ধরিয়ে শশাঙ্কবাবু ক্লান্তভাবে টানতে লাগলেন। ভয়ার্ত্ত ইঁদুর যেমন করে তাকিয়ে থাকে শিকারী বিড়ালের দিকে তেমনিভাবে মিঃ সেন তাকিয়ে রইল শশাঙ্কবাবুর দিকে। লজ্জায় ও ভয়ে মুখটা তার ফাঁসা বেলুনের মত হয়ে গেছে আর অসহায় আতঙ্কে ও বিস্ফোরণের প্রত্যাশায় চোখ দুটো তার নিরন্তর মিট্‌মিট্ করছে।

গাঢ়, নীলচে ধোঁয়ার কুণ্ডলী নিঃশব্দ-সঞ্চরণশীল সরীসৃপের মত শশাঙ্কবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। তার মনের অন্তরালে যে সাপগুলো নিৰ্জ্জীব হয়ে এসেছিল তারা যেন আবার বাতাসের সংস্পর্শে জীবনীশক্তি ফিরে পাচ্ছে, ফণাবিস্তার করে ক্রূর কামনায় যেন তারা মাথা দোলাচ্ছে।

খানিকটা অৰ্দ্ধ-স্বগতভাবে শশাঙ্কবাবু বললেন, "আজ না হয় হারই মানলাম, কিন্তু কাল? কাল—"

বিস্ফোরণ নয়, বাঁচল মিঃ সেন, মনিবের কথার পরিপূরণ করে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—কাল আমরা ওদের পিষে মারবই"—

খিল খিল হাসি শোনা গেল।

হাসছিল শিখা, হাসতে হাসতে ঢুলছিল সে। পেছনে, দরজার পর্দ্দার সামনে সে দাঁড়িয়েছিল, একটু আগেই এসেছিল সে, নীরবে ধর্ম্ম-ঘটের অবসানকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

হাসতে হাসতে সে বলল, "রাইট্ মিঃ সেন। কি বল বাবা, আজ না হয় হার মেনেছি, কিন্তু কাল? কাল ওদের পিষে মারতেই হবে, হেরেও আমরা হারব না।"

আর একবার হাসির হিল্লোল তুলে সে ঘর থেকে চলে গেল।

শশাঙ্কবাবু মাথা নীচু করলেন। কিন্তু সেই নীচু মাথায় যে চোখ দুটো ছিল, তা কিন্তু জ্বলতে লাগল। আহত বাঘের মত।

মিঃ সেনের তৃষ্ণা বোধ হয়। সিগারেটের তৃষ্ণা।

ইউনিয়ন।

শত কণ্ঠের ধ্বনি উঠল—"ইনক্লাব জ়িন্দাবাদ্"—

বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক। অন্যায়, অবিচার, প্রতারণা, নীচতা, লোভ ও শঠতার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চলুক। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।

একঘণ্টা পর।

পাটকলের বাঁশী বাজল। কু—উ—উ—কু—উ—উ—

সারা গ্রাম চমকে উঠল।

যন্ত্রের উপরকার ধুলো অপসৃত হল, তৈলাক্ত মসৃণতায় আবার তা ঝক্ ঝক্ করতে লাগল। আবার তা চলতে লাগল। শত কণ্ঠের আনন্দোচ্ছ্বাস-পূর্ণ কলগুঞ্জন আর চীৎকার; ব্যস্ত পদক্ষেপ আর বলিষ্ঠ বাহুর আন্দোলন। প্রাণের জোয়ারে সারা কারখানাটা যেন কাঁপছে।

বাঁশীটা বেজেই চলেছে। কু—উ—উ—উ—। যেন অনেকদিন বাদে বেজেছে বলে আনন্দাতিশয্যে আর থামতে চাইছে না।

কারখানার চিম্‌নী থেকে ধোঁয়া উঠ্‌ছে আবার। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া। যেন উপরকার বিরাট আকাশকে ধূপের ধোঁয়া দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানানো হচ্ছে।

আলোচনার একটা নূতন বিষয়বস্তু জুটল। পাটকলের মজুরেরা জমিদারকে কাবু করেছে—সবাই খুশী হল। কিন্তু এ খুশী হওয়াটা বুদ্ধি-প্রণোদিত নয়, অন্যায়ের উপর ন্যায় জয়ী হল বলে নয়। সবলের উপর, ধনীর উপর, দুর্ব্বল ও দারিদ্রের যে ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ আছে তারি জ্বালা খানিকটা প্রশমিত হল বলেই এই খুসী হওয়া।

ইউনিয়নের দিকে যাচ্ছিল প্রবীর।

আখড়ার নিকটবর্ত্তী তারক বাড়ুয্যের চাতালের উপর প্রবীণদের জমায়েৎ দেখা যায়। জোতদার হরিভূষণ গাঙ্গুলী, বুড়ো মোক্তার দীনেশ রায়, অঘোর পণ্ডিত, নিমাই বাড়ুয্যে আর কৃষ্ণদাস বসু। দুটো

খেলো হুঁকো সেই রস-চক্রে রস পরিবেশন করছে। থেকে থেকে হস্তান্তরিত হচ্ছে সেগুলো, কল্‌কের আগুন টানের চোটে জ্বলে জ্বলে উঠছে, লালচে আভা বিকীরণ করছে। অবচ্ছ অন্ধকারকে আরো আব্‌ছা করে তুলেছে সেই তামাকের ধোঁয়া।

প্রবীর হাসল। জীর্ণতার ধ্বংসস্তূপ। অতীতের প্রেত।

বুড়োরা প্রবীরকে দেখল। উৎসুক হয়ে উঠল সবাই।

"ওহে প্রবীর—শোনো শোনো—" অঘোর পণ্ডিত ডাক দিলেন।

প্রবীর দাঁড়াল তাদের সামনে।

"কোথায় যাচ্ছ বাবা ?" পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন।

"যাচ্ছি মজুরদের ইউনিয়নে"—

"খাসা কাণ্ড করেছ বাবাজী"—গাঙ্গুলী হেসে বলল, "বাবুসায়েব একেবারে জব্দ হয়ে গেছেন—হেঁ হেঁ হেঁ—" হাসির প্রাবল্যে তার গজাননকেও হার মানানো ভুঁড়িটি নেচে উঠতে লাগল।

কৃষ্ণদাস সায় দিল, "খাসা বলে খাসা, খোদার উপর খোদ্‌কারী হয়েছে বাবা"—

অর্থহীন কথাবার্ত্তা।

"আচ্ছা, আমি তা হলে এবার আসি, আমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে।" প্রবীর বলল।

"আচ্ছা বাবা, এসো—" অঘোর পণ্ডিত মাথা নেড়ে বললেন।

প্রবীর চলে গেল।

আবার তামাকের ধোঁয়া।

প্রবীরের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে তারক বাড়ুয্যে এতক্ষণে কথা বলল, চোখ দুটো কুঞ্চিত করে, টাকের উপর একবার হাত বুলিয়ে বলল, "খাসা খাসা ত' বলছ সবাই কিন্তু ছেলেটার আচরণ লক্ষ্য

করলে? এতগুলো বুড়ো লোকের সঙ্গে কথা বলার কায়দাটাও জানে না! একটা প্রনামও ত' করতে পারত! আমাদের না হয় না-ই করল, অঘোরদার মত প্রবীণ, বিজ্ঞ লোককেও কি একটা প্রনাম জানানো যায় না!"

নূতন একটা উত্তেজনার সঞ্চার হল। তাই তো, ছেলেটা তো সত্যি অর্ব্বাচীন!

হরিভূষনের কণ্ঠে শ্লেষ ধ্বনিত হল, "হুঃ, দেশোদ্ধার করছে—যত্ত সব—। তারিণী চৌধুরী ছেলেটাকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছে। যত সব বখাটে ছোঁড়াগুলো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে ফিরছে, কাজ নেই কম্ম নেই মজুর আর চাষীদের খালি খেপিয়ে তুলছে"—

অঘোর পণ্ডিত হাসতে লাগলেন, শাস্ত্র আর তন্ত্রের অধিকারী ব্যক্তি তিনি, তিনি কি আর এসব কিছু জানেন না? জানেন, এবং সব জানেন বলেই তিনি মৃদুমন্দ হাসতে লাগলেন। মানেটা এই যে কি তোমরা বল্লে, ও আমি বহুদিন আগে থেকেই জানি।

অতি প্রশান্ত হাসি হেসে তিনি বললেন, "কলি—কলির প্রকোপ ভায়া—ও ত' হবেই। ধর্ম্মঃ সংকুচিতস্তপো বিরহিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং। পাপ, অধর্ম্ম আর অসত্য যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি বৃদ্ধি পাবে ঔদ্ধত্য উচ্চের প্রতি নীচের অবজ্ঞা, ব্রাহ্মণের প্রতি শূদ্রের ঘৃণা এবং প্রবীণের প্রতি নবীনের বিক্ষোভ।"

নিমাই বুড়ো যেন ত্রাসে কেঁপে উঠল সেই বর্ণনা শুনে, মাথা নেড়ে সেও সায় দিল, বলল, "ঠিকই বলছেন দাদা। এই প্রবীর ছোঁড়া যে দলের তারা নাকি সাম্য চায়—বামুন আর শুদ্দূর, ধনী আর গরীব সবাইকেই নাকি ওরা এক করে দেবে"—

তারক বাড়ুয্যে অনুকম্পার হাসি হাসল, অর্থাৎ নিমাই বাড়ুয্যে

আরো অনেক কিছুই জানে না, চোখ নাচিয়ে সে বলল, "শুধু কি তাই ভায়া ? আরো আছে। জানোইত দেশোদ্ধার করার পথ এক গান্ধীই দেখিয়েছে—ভগবানকে সহায় করে ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করে। কমই বা কি করল ভায়া ? দেশের কত জায়গায় মন্ত্রীত্ব করছে তার লোকেরা—এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস করেছে বলেই ওটুকু হয়েছে। কিন্তু এই সব সাম্য বাদীরা কি বলছে জানো ? বলছে ভগবান নেই ?"

আবার উত্তেজনার সঞ্চার হলো।

অঘোর পণ্ডিত হাসলেন, "ভগবানের বিধান উলটে যারা সবাইকে সমান কর্ত্তে চায় তারা যে ভগবানকে মানবে না এ এমন কি নতুন কথা ? কিন্তু সব ঠিক হয়ে যাবে ভায়া। কাল পূর্ণ হলে, সত্যসন্ধিসময়ে, আবার কল্কির্ভবিষ্যতি"—

ঠিক ঠিক। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগবানকে বাদ দিনে কি কিছু চলে !

আবার আলোচনার মোড় ঘুরে যায়। নূতন করে তামাক সাজা হয়। ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে মিলায়। অন্ধকার গাঢ় হয়, পিছনের বাঁশবনে মর্ম্মরধ্বনি উত্থিত হয় আর সামনের নারকেল গাছগুলোকে অতিকায় দৈত্যের মত দেখায়। রাত হলো।

প্রান্তরের গান

ইউনিয়নে সবাই এসেছে। ছেলে বুড়ো থেকে মেয়েরা পর্য্যন্ত। মায় গণি-মিঞার দল। তারা দোষ স্বীকার করেছে, মাফ চেয়েছে। এসেছে কৃষক সভার তরফ থেকে কয়েক জন লোক, এসেছে সুব্রত আর যদুপতি বাবু। সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে।

প্রবীরকে ওরা মালা পরিয়ে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় চোখ ওদের চক্‌চক্‌ করছে।

ঘরোয়া আলোচনা চলল। হাসি গল্প। জয়ের আনন্দে সবাই বিভোর। তারা গরীব হয়েও ধনী, দুর্ব্বল হয়েও আজ সবল।

সুব্রত ওদের অভিনন্দন জানাল। বলল যে তাদের বিজয়লাভ গুরুত্বপূর্ণ। এই সব যুদ্ধে তাদের শক্তি বাড়বে বটে কিন্তু সেই শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে, সঞ্চিত রাখতে হবে বৃহত্তর যুদ্ধের জন্য। সে স্বাধীনতার যুদ্ধ। কবে ডাক আসবে ঠিক নেই, তবে ডাক আসবেই। পশ্চিম দেশে ওলোট পালট চলছে, হয়ত কিছুদিন বাদেই যুদ্ধ লাগবে। পৃথিবীতেও একটা বিপ্লব ঘনিয়ে আসছে। তাদেরও তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সব দলকে মিলতে হবে। একতার ফলে যেমন আজকে সবাই জয়ী হয়েছে তেমনি সর্ব্বদলের একতার ফলে সেই আগামী যুদ্ধেও তারা বিজয়ী হবে। অস্ত্র নাই-বা থাকল, সত্য আর ন্যায় হবে তাদের অস্ত্র—অস্ত্রহীনতাই হবে তাদের বর্ম্ম। তাদের স্বাধীনতার সূর্য্য আবার উদিত হবে, তাদের জীবনের অন্ধকারকে বিদূরিত করবে। শেষ কথা এই যে আগামী কালের পৃথিবী তাদের—শ্রমিকের, কৃষকের, নির্য্যাতিতের।

সবাই হয়ত সব কথা বুঝল না। কিন্তু এটা বুঝল যে তারা শক্তিমান। আর বুঝল যে এখনো তাদের অনেক কাজ বাকী আছে—অনেক কাজ।

একটা রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় সকলের শরীর মন ভরে উঠল, দুরন্ত শক্তির একটা উন্মত্ত উল্লাস তাদের বুকের ভিতর ফুলে ফুলে উঠল, যে সূর্য্য আজকের মত অস্ত গেছে তা যেন তাদের চোখে আবার উদিত হল।

"ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ"—শতকণ্ঠে ধ্বনিত হল।

বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক। অন্যায়, অবিচার, প্রতারণা, নীচতা, লোভ ও শঠতার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চলুক। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক্।

ঘণ্টা দু'য়েক বাদে প্রবীর বাড়ী ফিরছিল। বেলফুলের মালাটা পকেটের ভিতর রয়েছে, একটা মৃদু সৌরভ পাচ্ছে সে চলতে চলতে। হঠাৎ তার মনে পড়ল যে ৩রা বৈশাখ নন্দর বিয়ে। এ কয়-দিন ওসব কথা তার মনেই ছিল না।

নন্দদের বাড়ীতে গিয়ে সে হাজির হল।

দাওয়ার উপর ছিল হরিচরণ আর শিবেশ্বর।

হরিচরণ ডাক দিল, "এসো বাবা এসো। তোমার জন্যই এখানে বসে আছি, নন্দকে তোমার বাড়ী পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তুমি ছিলে না।"

"হ্যাঁ—মজুরদের ওখানে ছিলাম।"

শিবেশ্বর উৎসাহিত হয়ে উঠল, "বড় ভাল কাজ করেছ বাবা, বড় ভাল কাজ করেছ। মানুষকে মানুষ বলে মানে না বড়রা—সব সহ্য হয় কিন্তু ও সহ্য হয় না—"

হরিচরণ মাথা নাড়ল, আবেগে কণ্ঠটা তার কেঁপে উঠল একটু, "মানুষকে মানুষ করার কাজ নিয়েছ, মানুষকে সুখী করার, স্বাধীন করার ব্রত নিয়েছ তুমি—এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে? ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

খানিক্ষণ নিঃশব্দতায় কাটল।

প্রবীর নৈঃশব্দ ভাঙ্গল, "তাহলে কাকা, বিয়ে ঠিক তো?"

হরিচরণ ব্যস্ত হয়ে উঠল, "হ্যাঁ বাবা, ঐ কথাই ত বলতে চাই। তা হলে কি করব—সব জোগাড় করব?"

"নিশ্চয়। কালই সহরে যান, জিনিষপত্তর কিনুন, তৈরী থাকুন।"

"কিন্তু পুরুত? তারক বাড়ুয্যে বা আর কাউকে বললেই কথাটা হয়ত ফাঁস হয়ে পড়বে"—

"ও ভার আমায় দিন—আমি ঠিক করে রাখব। আর দেখুন, বেছে বেছে মাত্র কুড়ি পঁচিশ জনকে নেমন্তন্ন করবেন' বেশী নয়। আর একটা কথা, কনে কে সেকথা কিন্তু প্রাণ স্তেও বিয়ের আগে বলবেন না।"

শিবেশ্বর সায় দিল, "আমিও তাই বলছি বাবা।"

"নন্দ কোথায়?"

"ভিতরে—যাওনা।"

প্রবীর ভিতরে গেল।

দরজার পাশেই নন্দ দাঁড়িয়ে ছিল, আর ছিল মাধবী।

নন্দ আড়ি পেতে শুনছিল বিয়ের কথা আর মাধবী আড়ি পেতে দেখছিল প্রবীরকে।

প্রবীর চোখ পাকাল, "কি হচ্ছে—এ্যাঁ?"

সবাই মুখে হাতচাপা দিয়ে হেসে উঠল।

"বোস্"—নন্দ বলল।

"বস্‌ছি, কিন্তু তোর খবর কি—সব ঠিক ?"

নন্দ মাথা নাড়ল।

"বেশ তাহলে আমি পুরুত ঠিক করছি, কেমন ?"

নন্দ নিঃশব্দে হাসল।

মাধবীও মুখ টিপে হাসল, "দাদার যে কনের মত লজ্জা হল, না প্রবীরদা ?"

নন্দ কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল, "যাক্, ও সব ত' হল—তোর ধর্ম্মঘটের ত' জয় জয়কার—"

"আমার নয়, শ্রমিকদের।"

"তাই—সবাই ধন্য ধন্য করছে।"

আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে, মাধবী প্রবীরের দিকে তাকাল। বিজয়ী বীরের দিকে মুগ্ধ জনতা যেমন সশ্রদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকায় তেমনি ভাবে। শত শত লোক প্রবীরকে শ্রদ্ধা করে, তার কথায় ওঠে বসে, তার প্রতাপের কাছে প্রতাপশালী জমিদারেরও মাথা নত হয়েছে। প্রবীর, যে প্রবীরকে মাধবী ভালবাসে, মাধবী'র প্রবীর।

মাধবী হঠাৎ বলল, "কোত্থেকে যেন ফুলের গন্ধ আসছে, না ? বেলফুল"—

প্রবীর পকেট থেকে মালাটাকে বের করল।

"ঠিক ধরেছ মাধু—"

মাধবী ভারী খুশী হয়ে উঠল, ওর চোখের তারা দুটোয় গর্ব্ব দেখা দিল, "বেশ সুন্দর ত, ওরা তোমায় দিয়েছিল বুঝি ?"

"হ্যাঁ—তুমি নেবে ?"

"দূর—তোমায় দিয়েছে আমি কেন"—সে মাথা নাড়ল। কিন্তু তার কণ্ঠের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন কামনাও যেন ধ্বনিত হল।

বাধা দিয়ে প্রবীর বলল, "তাতে কি, নাও"—

মাধবীর প্রসারিত হাতের উপর সে মালাটা দিল। মাধবী যেন অঞ্জলি পেতে দেবতার আশীর্ব্বাদ নিল, লজ্জার রক্তিমাভায় গাল দুটো তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চোখে একটা কৃতজ্ঞতার দীপ্তি ঘনিয়ে এল। সে ধন্যা।

প্রবীর ফিরে দাঁড়াল, "এবার তা হলে যাই নন্দ। ওরা বৈশাখের সন্ধ্যের সময় আমিও যাব তোদের সঙ্গে"—সে থামল, একটু হেসে নন্দ'র পিঠ ঠুকে দিয়ে আবার বলল—"সুভদ্রা-হরণ করতে, কেমন?"

নন্দ মিষ্টি হেসে বলল—"আচ্ছা আচ্ছা"—

"চল্লাম মাধু—"

কম্পিতকণ্ঠে মাধবী বলল—"এসো"—

বাইরে হরিচরণকে প্রবীর বলল—"সব ঠিক কাকা। যা যা বললাম সেইমত সব ঠিক করে ফেলুন। কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা বাবা—" হরিচরণের কণ্ঠস্বরে নির্ভরতা ধ্বনিত হল। পারে, প্রবীর সব পারে। জমিদার শশাঙ্কবাবুকেও যে হার মানায় সে সব পারে।

প্রবীর চলে গেল।

নন্দ নিজের শয্যায় শুয়ে কাজললতার স্বপ্ন দেখে।

একটু আড়ালে আবছা অন্ধকারের মধ্যে মাধবী দাঁড়াল। বাইরে সব সুন্দর দেখাচ্ছে, ভারী সুন্দর। নিঃশব্দতা আর চাঁদের আলোর কুহেলিতে মোড়া গ্রামের মধ্যে এখন কোনো কোলাহল নেই। বাতাস

পড়ে গেছে, স্থির চিত্রপটের মত বিরাট আকাশটা মাথার উপরে চন্দ্রালোকে ঝক্‌ঝক্ করছে। নক্ষত্র-সমারোহ আছে কিন্তু ম্লানায়িত, পাণ্ডুরবর্ণ। ভারী ভালো লাগল মাধবীর।

উগ্র রসায়ণ পান করলে যে মত্ততা আসে, যে আবেশে আচ্ছন্ন হয় সমস্ত শিরাস্নায়ু তেমনি মত্ততা, তেমনি আবেশ হয়েছে মাধবীর। হাতের মধ্যে ধরা রয়েছে বেলফুলের মালাটা। একটা দুর্লভ সম্পদ। হাতের তালুর অদৃশ্য রন্ধ্রপথগুলো দিয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি যেন ফুলগুলো থেকে তার দেহে সঞ্চারিত হচ্ছে, তার সমস্ত অন্তস্তল যেন ক্রমেই সুরভিত হয়ে উঠছে। আঃ—

মালাটা সে পরল। সেই মালা—যে মালা ছিল প্রবীরের কণ্ঠকে বেষ্টন করে, যে মালা ছিল প্রবীরের বক্ষ-সংলগ্ন হয়ে। সেই মালা এখন মাধবীর কণ্ঠদেশকে বেষ্টন করেছে, সেই মালা এখন মাধবীর কম্পিত-কোমল বক্ষের হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে উঠছে, নামছে। একটি মালা দুজনকেই যুক্ত করেছে। আর এ মালা দিয়েছে প্রবীর—প্রবীর। কিন্তু তবু—প্রবীর তাকে মালাটা পরিয়ে দিল না কেন? নন্দ? তাতে কি, একটু আড়ালে এসেও ত সে তা করতে পারত! হে মা কালী, প্রবীর তা কেন করল না?

পরদিন বিকেলে প্রিয়তোষবাবুর সঙ্গে গিয়ে প্রবীর দেখা করল।

"কি ব্যাপার প্রবীরবাবু—আসুন"—

"দরকার আছে।"

"তা ত' বুঝছিই, বিনা দরকারে আমাদের মত পাষণ্ডদের সঙ্গে ত' লোকেরা দেখা করেনা। কি দরকার?

প্রবীর হাসল, "অভয় পাই ত' বলি"—

"দিচ্ছি অভয়—বলুন না মশাই।"

"সাহায্য করতে হবে।"

"কি ব্যাপারে?"

"হৃদয়গত ব্যাপারে?"

"মানে?"

"বলছি।"

প্রবীর সব বলল। নন্দ আর কাজললতার বিয়ের কথা।

প্রিয়তোষবাবু শুনে হেসেই আকুল। বেশ লোক এই প্রিয়তোষবাবু, দারোগাসুলভ ভয়ঙ্করত্ব একটুও নেই।

"যত রাজ্যের ঝামেলা নিয়ে আপনি থাকেন দেখছি।" প্রিয়তোষবাবু বলল।

"ঘাড়ে এসে পড়ে যে—তাছাড়া দুটো জীবনের ভাল মন্দ—উপেক্ষার বস্তু নয়।"

"তা ত' বুঝলুম, কিন্তু আমার চাকুরীটি কি খেতে চান?

"কেন?"

"আমাদের দেশের বাপমায়ের অবাধ্যতা করা যে বে-আইনী ব্যাপার—তারপরে এত রীতিমত ইলোপমেন্ট্ মশাই।"

প্রবীর হাসল, "আইনের গণ্ডী থেকে বাঁচবার এক আধটা

নির্গমন-পথ সব সময়েই থাকে—এক্ষেত্রেও আছে। অসবর্ণ বিয়ে নয়, তা ছাড়া পাত্রপাত্রী দু'জনেই প্রাপ্তবয়স্ক ও বয়স্কা।"

প্রিয়তোষবাবু ক্ষণকাল চুপ করে কি ভাবল, পরে মুখ তুলে হাসল "আপনার অন্তঃকরণকে প্রশংসা করছি মশাই। যাই হোক্,—আমার যথাসাধ্য সাহায্য করব। তবে একথা মনে রাখবেন—আপনার উপর আক্রোশ রয়েছে অনেকের—মায় আমাদের"—

"তা জানি—অজস্র ধন্যবাদ প্রিয়তোষবাবু।"

চৈত্র সংক্রান্তির দিন। বর্ষশেষের বাজনা বাজছে; গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত বুড়ো শিবের মন্দিরের কাছে ছোট একটা মেলা বসেছে। একটা নাগরদোলাও এসেছে। কোলাহলের রেশ ভেসে আসছে। হাসি, চীৎকার, বাঁশী আর ভেপুর আওয়াজ আর ঢাকের শব্দ।

মেলার দিকে না গিয়ে আর একটু পুবদিকে গেল প্রবীর। ক্ষেতের উন্মুক্ত আবহাওয়াটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বেলা পড়ে এসেছে, রৌদ্রের তেজ হয়েছে মন্দীভূত, বাতাসের স্পর্শে এখন আর জ্বালা বোধ হয় না বরং স্নিগ্ধতা অনুভূত হয়।

চার পাঁচটা নারকেল গাছ ভিড় করে আছে একটা ঢিপির উপর। প্রবীর বসল সেখানে। সামনের দিকে তাকাল সে। স্থানে স্থানে কর্ষিত রিক্ত প্রান্তর ধূ ধূ করছে। দূরে দক্ষিণ দিগন্তের কোলে, একটা

প্রান্তরের গান

ঘন মসী-রেখার মত ময়নাগঞ্জ গ্রামটাকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণে ঝোপঝাড়, বেতবন আর জায়গায় জায়গায় পানায় ভরা শুকনো বিলের বিস্তৃতি। উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত অগ্নিরাশির মত রক্তবর্ণ মেঘখণ্ডগুলো দিগন্তের উপরে স্থির হয়ে আছে। জানা অজানা নানা পাখী উড়ে চলেছে। সূর্য্যাস্তের রক্তলিপিতে ওদের বিশ্রামের নির্দ্দেশ ঘোষিত হয়েছে। মাথার উপরকার শূন্যতাকে আলোড়িত করে ওদের ক্লান্ত-পক্ষ যে শব্দ সৃষ্টি করছে তা অনবরত ভেসে আসছে—দূরাগত পূরবীর আলাপের মত।

অপরূপ এই পটভূমিকা, অপূর্ব্ব এই দেশ। কিন্তু দেশের মানুষেরা? মুষ্টিবদ্ধ করে প্রবীর মাটীকে স্পর্শ করল। অনেক কাজ—অনেক কাজ করতে হবে। দুরূহ কাজ। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে, দুর্গম অরণ্য আর প্রান্তর ভেদ করে, অতিকায় দৈত্য ও হিংস্র দানবদের বধ করে অচিন্ দেশের রাজকন্যাকে উদ্ধার করার মতই ভয়ানক দুরূহ কাজ। কিন্তু তবু তা করতেই হবে, করতেই হবে।

দূরে আলের উপর একটিনারীমূর্ত্তি দেখা গেল। গোলাপী রঙের শাড়ী-পরিহিতা আধুনিকা। শিখা।

প্রবীর উঠে দাঁড়াল। পালাতে হবে। শিখার সঙ্গ তার ভাল লাগে না। তার কথাবার্ত্তায়, হাবভাবে কি যেন একটা আবেদন লুকিয়ে থাকে। সে পা বাড়াল, লুকিয়ে পালাবার জন্য।

কিন্তু শিখা তাকে দেখে ফেলেছে।

"প্রবীরবাবু নাকি?"

অভদ্র হওয়া যায় না। প্রবীর দাঁড়াল।

"নমস্কার"—কাছে এসে শিখা হেসে বলল।

"নমস্কার। বেড়াতে বেড়িয়েছেন দেখ্ছি।"

"তাতে সন্দেহের কোন কারণ আছি নাকি ?" শিখার কণ্ঠে যেন একটু শ্লেষ মিশ্রিত আছে।

প্রবীর একবার শিখার দিকে তাকাল, একটা কঠিন কথা এসেছিল ওষ্ঠাগ্রে, তা দমন করে সে বলল, "তেমন কিছু নেই বটে তবে . সুশিক্ষিতা ও আধুনিকা ধনীর দুলালীদের এই সব গ্রাম্য পারিপার্শ্বিক সাধারণতঃ ভাল লাগে না।"

"ব্যতিক্রম কি থাকতে পারে না ?"

"এখন তাই মনে হচ্ছে। সে বিষয়ে আপনার প্রশংসা কর্ত্তেই হবে আমাকে, আপনি ত' দিনের পর দিন এখানে বেশ কাটিয়ে দিচ্ছেন।"

শিখা নিরুত্তরে হাসল।

প্রবীর আকাশের দিকে তাকাল। অন্ধকার হয়ে এসেছে।

"বাড়ী ফিরবেন না শিখাদেবী ?" সে প্রশ্ন করল।

শিখা প্রবীরের দিকে আড়নয়নে একবার তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, "আপনি কি তাই চান ?"

"সন্ধ্যা হয়ে এল কিনা, তাই বলছি।"

"তাতে কি, আপনি ত' চোর ডাকাত নন।"

প্রবীর আবার তাকাল শিখার দিকে, আসন্ন সন্ধ্যার আবছা আলোতেও সে দেখতে পেল যে উত্তেজনার একটা গাঢ় ছায়া তার মুখে চোখে থম্‌থম্ করছে।

সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "মাফ্ করবেন শিখা দেবী, আমায় এবার ফিরতে হবে, কাজ আছে।"

প্রবীরের কণ্ঠস্বরের কাঠিন্য উপলব্ধি করে শিখার চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে এল, পা বাড়িয়ে সে বলল, "চলুন তবে।"

নিঃশব্দতা নেমে এল দুজনের মাঝে।

মেলার কোলাহল আর ঢাকের বাজ্‌না শোনা যাচ্ছে। ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে, নিকটবর্ত্তী হচ্ছে।

জোর করে হাসবার একটা দুর্ব্বল প্রচেষ্টা করে শিখা বলল, "আমার অভিনন্দন জানবেন প্রবীর বাবু।"

"কি জন্য বলুন ত?"

"আপনাদের ষ্ট্রাইকের সাফল্যের জন্য।"

"ধন্যবাদ শিখা দেবী।"

আবার নিঃশব্দতা।

মাঝে মাঝে শিখা মুখ ঘুরিয়ে প্রবীরের দিকে তাকায়। প্রবীরের দৃষ্টি সামনের দিকে, তার ললাটে দুটো রেখা।

ডানদিকে মেলা বসেছে; তার কাছাকাছি গিয়ে তারা থামল। দুজনে এবার দু'দিকে যাবে। ডানদিকের রাস্তার শেষে শিখাদের অট্টালিকা দেখা যাচ্ছে। প্রবীর যাবে বাঁ দিকে।

"কাল আসবেন প্রবীর বাবু"—শিখার কণ্ঠে মিনতিপূর্ণ আবেদন।

"কোথায়?"

"আমাদের বাড়ী। কেন আসেন না বলুনত? বাবার কথা বলবেন? বাবা'র ত' কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই আপনার উপর।"

প্রবীর মাথা নেড়ে বলল, "তবু তা হয় না শিখা দেবী। আমরা দু'জনে দু'পক্ষের—তেল আর জল জাতীয়—বাদী আর বিবাদী—আপোষ আমাদের হবে না।"

শিখার চোখ জ্বলে উঠল, "এ আপনার অন্যায় ধারণা প্রবীর বাবু—শিক্ষিত লোকের মুখে এ কথা শোভা পায় না। মতের বিরোধ ঘটলেই যে মানুষে-মানুষে কায়েমী শত্রুতা হবে এ একটা কথাই নয়।"

প্রবীর কঠিন হয়ে উঠল. শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে সে কেটে কেটে বলল, "পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়—কথাটা ভাল হলেও আমি মানি না শিখা দেবী। মানলেও কাজের সময় তা পারি না। তা'ছাড়া আপনার বাবার সঙ্গে শুধুই মতের বিরোধ হলে অন্য ব্যাপার ঘটত—আমাদের বিরোধ যে স্বার্থের। যাক্ ওসব কথা, এবার আসি, কেমন ?"

নির্ব্বাপিত দীপের মত অন্ধকার মুখ তুলে শিখা প্রশ্ন করল, "তা'হলে সত্যি আসবেন না ?"

প্রবীর এবার স্বর নরম করল, "তবু বলছেন ? আমার দৃঢ়তাকেও আপনি সহ্য করলেন ! আচ্ছা যাব, যাব একদিন।"

"আপনি ভারী নিষ্ঠুর প্রবীর বাবু!" শিখার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

প্রবীর চমকে উঠল সে কণ্ঠস্বর শুনে। শিখার মুখের উপর চকিতে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বলল, "আচ্ছা, নমস্কার।"

দ্রুতপদে সে এগিয়ে চলল। শিখা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল চিত্র-পুত্তলীর মত। নিস্পন্দভাবে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে প্রবীর। এতদিনে সব সংশয় কেটে গেছে। সব স্বচ্ছ হয়ে গেছে দিবালোকের মত।

কিন্তু তা হয় না। না।

৩রা বৈশাখ।

সব ঠিক্‌ঠাক। মাত্র কয়েকজন লোককে খবর দিয়েছে হরিচরণ। আগের দিন সহরে গিয়ে সব নিয়ে এসেছে সে। শাড়ী, কাপড় আর টোপর—সব। রাসমণির গহনা দিয়েই কনেকে সাজানো হবে আপাততঃ, পরে আস্তে আস্তে গড়িয়ে দেওয়া যাবে। বাড়ীর উঠোনের ভিতরে বিয়ে হবে, কলাগাছ আর মঙ্গলকলসও রেখেছে হরিচরণ। একদল বাজনদারদেরও বলা হয়েছে। কনে এলে পর তাদের আওয়াজ পাওয়া যাবে, তার আগে নয়।

এক কথায় সব ঠিক।

কিন্তু একটা 'কিন্তু' আছে। যদি শেষ মুহূর্তে সব ভেস্তে যায়? যদি মেয়েটি না আসে?

মনের এই আশঙ্কাকে হরিচরণ প্রবীরের কাছে ব্যক্ত করল।

প্রবীর দমবার পাত্র নয়, সে উৎসাহ দিয়ে বলল, "কিছু ভাব্‌বেন না, বিয়ে হবেই কাকা।"

হরিচরণ আর কিছু বলল না। কিন্তু তবু শঙ্কা দূর হয় না। রাত না হলে, শাঁখের আওয়াজ আর উলুধ্বনির মাঝে শুভকার্য্যটা না হওয়া পর্য্যন্ত বুক তার দুরু দুরু কাঁপবেই, অস্বস্তিতে সব কিছু বিস্বাদ লাগবেই, সময়কে মন্থর ও দীর্ঘ মনে হবেই। তারপরও অনেক ব্যাপার হবে হয়ত। গৌরদাস হয়ত এসে মারামারিই বাধিয়ে দেবে। না, কাজটা ভাল করেনি হরিচরণ। হঠাৎ দমে যায় সে। ছোক্‌রাদের আস্কারা দিয়ে নিজেকে হয়ত সে খুবই বিপদগ্রস্ত করে ফেলেছে। কে জানে কি হবে। না, হরিচরণ ভারী ছেলেমানুষী করে ফেলেছে।

অন্ধকার মুখ নিয়ে হরিচরণ দাওয়ার উপর বসে থাকে।

সেই ঘাটে, যেখানে মানকেতনের অদৃশ্য শায়ক এসে নন্দলালের বুককে অশোক মঞ্জরীর মত লাল করে তুলেছিল, সেইখানে এসে দুটো নৌকো ভিড়ল। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, অন্ধকারের মধ্যে আব্‌ছা আব্‌ছা দেখা যায় আরোহীদের। একটা নৌকোতে আছে প্রবীর, নন্দ আর অর্জ্জুন। অন্যটিতে গ্রামের দুটি যুবক, দীনেশ ও নারায়ণ, প্রবীরের নতুন শিষ্য-শ্রেণীয়।

"নাম্"—প্রবীর নন্দকে বলল।

নন্দ নামল। আশায় আশঙ্কায় নন্দ'র বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেছে।

"দীনেশ"—প্রবীর ডাকল।

"কি প্রবীরদা ?"

"তুমি নন্দ'র সঙ্গে যাও, ওর শ্বশুরের বাড়ীটা দেখে ফিরে এসো, তারপরে আমরা চলে যাবার ঘণ্টা তিনেক বাদে গৌরদাসকে খবর দেবে যে তার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, তাকে যেতেই হবে। ঘড়িটা ঠিক আছে ত ?"

"হ্যাঁ—"

"আচ্ছা, তোমরা এসো।"

নন্দ আর দীনেশ এগিয়ে চলল। ঘাটের উপর উঠে বৃক্ষ-সমাকুল পথের অন্ধকারে তারা পরমুহূর্ত্তেই মিলিয়ে গেল।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটতে লাগল।

অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীতটে জোনাকিরা জ্বলছে নিভ্‌ছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের তীব্র ঐক্যতানের সঙ্গে জলকল্লোলের সুগম্ভীর শব্দ নিরন্তর ভেসে আসছে, নৌকো দুটো দুলছে এপাশ ওপাশ, নদীপথে চলমান নৌকোর ভিতরকার লণ্ঠনটা বহুদূরবর্ত্তী স্পন্দমান নক্ষত্রের মত মনে হচ্ছে। মাদকতাময় পারিপার্শ্বিকে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটছে। উদ্‌গ্রীব উত্তেজনায় কম্পমান মুহূর্ত্তগুলি।

"অর্জ্জুন"—প্রবীর ডাকল।

"এ্যা ?"

"দেরী হচ্ছে, না ?"

অর্জ্জুন একটু হাসল, "তা হবেই ত', ব্যাপারটা ত' সহজ নয়। ইংরেজ রাজত্বে এমন কাণ্ড যে ঘটে তা জানতাম না।"

প্রবীরও মৃদু হাসল, "ইংরেজ রাজত্বে আরো কাণ্ড ঘটে এবং ঘটছে, তা ত' জানন।—একদিন জানাব। কিন্তু আজ যা কাণ্ড ঘটছে তা চিরদিনই ঘটেছে এবং ঘটবেও। এটা যে একটা চিরন্তন ব্যাপার—"

জলের দিকে তাকিয়ে অর্জ্জুন চুপ করে গেল। প্রেম। তা ঠিক। জলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে যেন কি ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তার পেশীগুলো হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল।

আধঘণ্টা পরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল।

সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠল।

পরমুহূর্ত্তেই তিনটি ছায়ামূর্ত্তি দেখা গেল। তার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক।

"এসেছিস্ ?" প্রবীর উৎসুকভাবে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ—" নন্দর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। উত্তেজনায় কাঁপছে তা।

কাছে এল তারা। কাজললতার হাত ধরে নন্দ নৌকোয় তুলে দিল, তারপরে নিজেও চড়ল।

প্রবীর তাকাল দীনেশের দিকে, "তাহ'লে আমরা আসি দীনেশ। নারায়ণ, তোমরা তাহ'লে অপেক্ষা কর ভাই। একটু কষ্ট হবে হয়ত কিন্তু তা সইতেই হবে।"

দীনেশ আর নারায়ণের হাসি শোনা গেল।

"নৌকো ছেড়ে দাও অর্জ্জুন—"

"হুঁ"—লগির খোঁচায় নৌকো এগিয়ে গেল, তারপর স্রোতের মুখে, ভাঁটার টানে তরতর করে ভেসে চলল।

একটা মৃদু ঠাণ্ডা ভাব নদীর জলের আবহাওয়ায়, কিন্তু হাওয়ায় জোর নেই, পাল ফুলবেনা। দাঁড় বাইতে হবে।

নন্দ দাঁড় টেনে নিচ্ছিল, প্রবীর বাধা দিল।

"কেন?" নন্দ জিজ্ঞেস করল।

"বরকে আজ চুপ্‌চাপ্‌ কনের পাশে বসে থাকতে হয়, বুঝলি?"

দাঁড়টা টেনে নিল প্রবীর। অর্জ্জুন আর সে দুজনে দাঁড় বাইতে লাগল। একে স্রোতের টান তায় দুটো দাঁড়, নৌকা যেন ময়ূরপঙ্খী হয়ে উঠল, তীরবেগে এগিয়ে চলল।

প্রবীর তাকাল কাজললতার দিকে। কেমন দেখতে মেয়েটি যার জন্য নন্দ সব কিছু করতে রাজী? ভাল করে তাকাল সে। অন্ধকার হাল্কা হয়ে এসেছে। খানিক পরেই চাঁদ উঠবে, দ্বাদশীর চাঁদ। উপরের নক্ষত্র-শোভিত জ্যোতিঃষ্মান আকাশের প্রতিচ্ছায়ায় জলের উপর একটা অস্পষ্ট আলোর সৃষ্টি হয়েছে। সেই আলোকে সে কাজললতাকে দেখল। সেজে গুজে আছে কাজললতা। গলুইয়ের কাছে পা দুটো মুড়ে বসে বাঁ হাতে ভর দিয়ে বাঁদিকের জলরাশির উপর সে তাকিয়ে ছিল। মুখের সম্পূর্ণটা দেখা গেল না, শুধু পার্শ্ব দেশটুকু দেখা গেল। আবছা অন্ধকারের সুবিশাল পটভূমিকায় একটি সুবর্ণরেখা। কাজললতা সুন্দরী।

প্রবীর হেসে বলল, "বৌঠান্, আগে থেকেই আলাপ হয়ে গেল, ভালই হল।"

কাজললতা একটু নড়ে উঠল। কিন্তু নিরুত্তরে এক দৃষ্টিতে,

।পস্থয়মান জলরাশির দিকেই সে তাকিয়ে রইল, শুধু মাথাটা তার আর ।কটু ঝুঁকে পড়ল।

অর্জ্জুন বলল, "না, নন্দর পছন্দ আছে, তারিফ্ করতেই হবে। ক্ষ্মীর মত দেখতে আমাদের বৌঠাকরুণ।"

নন্দর দিকে তাকাল প্রবীর। নন্দ কাজললতার হাতখানেক রে বসেছে। আরো আলো থাকলে হয়ত দেখা যেত যে সে কাঁপছে ।ার প্রতি রোমকূপের মুখে স্বেদকণা সঞ্চিত হয়েছে, চোখের তারায় ।কটা স্তিমিত আবেশ আসন্ন হয়ে এসেছে।

"কোনো গোলমাল হয়নিত' রে?" প্রবীর প্রশ্ন করল।

"না।" নন্দর গলার স্বর এখনো কাঁপছে, আনন্দোচ্ছ্বাসে ওর ণ্ঠনালী যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে।

"তোর শ্বশুর কোথায়?

অর্জ্জুন হাসল একটু।

"আড্ডা দিতে গেছে কোথাও।"

"শ্রীমতী একেবারে রেডি ছিলেন তবে?"

"হ্যাঁ"—একটু হাসবার চেষ্টা করল নন্দ।

নিঃশব্দতা।

শব্দ উঠেছে দাঁড়ের আর জলের। বাঁশের উপর দাঁড়ের ঘর্ষণে ক্যাঁচ্ কোচ্ আওয়াজ হচ্ছে।

শব্দ আর নৈঃশব্দের মাঝে তাদের বুকে চিন্তার ঝড় চলেছে।

কাজললতা ভাবছে কি হবে? বাবা কি বলবে, কি করবে? মা। কি ভাববে, কি হবে? বিয়ে হবে! ভয় আর লজ্জা, আশঙ্কা আর আশা, বেদনা ও আনন্দে তার বুক দুলছে ঘড়ির দোলকের মত। এদিক আর ওদিক।

নন্দর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এসেছে। অনেক বিপদ হয়ত আছে, হয়ত ঝগড়া বিবাদ বাঁধবে, অনেক কেলেঙ্কারীও হবে। কিন্তু তবু পরম সম্ভাবনা আর পরম আনন্দের আশ্বাস আছে। আরো দু'ঘণ্টা বাদে পাশের এই রূপসীটি হবে তার বধূ—একান্ত তারি। রঙীন স্বপ্নে অন্ধকারেরও যেন রূপান্তর ঘটে। আনন্দের প্রাবল্যে বুকটা ফুলে ওঠে তার। তর সইছে না নন্দর, অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে সে একটু স্পর্শের জন্য। সকলের অলক্ষ্যে কম্পিত বাম হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সে কাজললতার ডান হাতটিকে চেপে ধরল। আকাশের বিদ্যুৎ যেন দুজনকে স্পর্শ করল।

ছপ্ ছপ্ দাঁড় পড়ছে, ক্যাঁচ্ক্যোচ আওয়াজ হচ্ছে, দাঁড় উঠছে আর পড়ছে। বাঁধা তালে, ত্রিতাল ছন্দে।

অর্জ্জুনের মাংসপেশীগুলো কঠিন হয়ে উঠেছে, কপাল বেয়ে ঘাম নেমেছে। নন্দ আর কাজললতার দিকে তাকাল সে। প্রেম। ওদের জীবন সার্থক হ'তে চলেছে। একটা জ্বালা বোধ হয় অর্জ্জুনের বুকে, একটা আকুল তৃষ্ণায় সে ছট্ফট্ করতে থাকে, চোখের সামনে আলেয়ার মত একটা সুশ্রী মুখের ছবি বারংবার ভেসে ওঠে। না, এবার প্রকাশ করতে হবে তাকে, মনের কথা মনে রাখলে আর চলবে না, তাহ'লে তার দিন আর কাটবে না!

প্রবীর ভাবে। বিস্তীর্ণ নদীর কি অপরূপ রূপ! দুপাশের গ্রামে প্রসন্ন রাত্রি নেমেছে। দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা, পরাধীনতা আর নীচতা, কুসংস্কার আর ব্যাধির দেশের শীর্ণ, নিরীহ, অজ্ঞান মানুষেরা তৈরী হচ্ছে বিশ্রামের জন্য। মড়ার মত খানিক পরে তারা ঘুমিয়ে পড়বে। আবার কাল জাগবে, ক্লান্ত জানোয়ারের মত ক্ষতবিক্ষত কাঁধের উপর জীবনের গুরুভার বোঝাটাকে বয়ে অন্ধভাবে এগিয়ে চলবে একটি সংকীর্ণ

পথের বন্ধুরতার উপর দিয়ে। ওদের জাগাতে হবে। প্রবীরের অনেক কাজ। ভালবাসবে নন্দ, ভালবাসবে অর্জ্জুন, ভালবাসবে শিখা আর কাজললতা। প্রবীরের সে অবকাশ নেই। পতঙ্গের মোহ তার হবে না।

যাদের যাদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল তারা সবাই এসেছে। অর্জ্জুনের মা এবং আরো দু'তিনজন মেয়ে রান্নার উদ্যোগ করছে। লুচি তরকারীই হবে। মেয়েরা ভিতরের দাওয়ায় ভীড় করেছে, বাইরের দাওয়ায় পুরুষেরা। নবীন কুণ্ডুর দোকান থেকে দু'খানা গ্যাসলাইট ভাড়া করে আনা হয়েছে, বাজনদারেরা বাইরের উঠোনে চাটাইয়ের উপর বসে বিড়ি ফুঁকছে। ঘরের মধ্যে বারান্দায় ও ছাদনাতলায় মনোরমা আর মাধবী আলপনা এঁকেছে। কলরব শোনা যাচ্ছে। কিন্তু উত্তেজিত কলরব।

উত্তেজনাটা পাত্রী সম্পর্কে।

মেয়েরা প্রশ্ন করছে রাসমনিকে, মনোরমাকে আর মাধবীকে।

"হ্যাগা নন্দ'র মা, বলি কনেটি কে? এ্যাঁ? পাত্রের বাড়ীতে এনে মেয়ে বিয়ে দিচ্ছে এত' ভূভারতেও শুনিনি বাছা!"

"হ্যাঁরে মনু, কনে কে রে? কখন আসবে? বল্‌না লো"—

"এই মাধু—কখন আসবে তোর দাদার বৌ? এখানে কেন বিয়ে হচ্ছেরে, এ্যাঁ? বল্‌না ছুঁড়ি"—

তিনজনেই আব্‌ছা আব্‌ছা এলোমেলোভাবে উত্তর দেয়, "এখুনি দেখবে, এখুনি জানতে পারবে। নাম ধাম এখন বলতে পারছি না—মানা আছে।"

"মানা ? কার মানা ?" বহুকণ্ঠের প্রশ্ন। ঔৎসুক্যে, কৌতূহলে, রহস্যভেদের দুর্নিবার আকাঙ্খায় সবাই জর্জ্জর করে তোলে তাদের তিনজনকে।

ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে ওরা তিনজনে বাইরের দিকে ঘন ঘন তাকায়। এল না—এখনও এল না ?

বাইরে হরিচরণের অবস্থা আরো কাহিল। জনদশেক লোক সেখানে রয়েছে। শিবেশ্বর, নীলমনি ঘোষ, কান্ত মণ্ডল, বেনী সাহা, মথুরা দাস, এমনি কয়েকজন।

সকলেরই এক প্রশ্ন। অন্তঃপুরের অভ্যাগতাদেরই প্রশ্ন। পাত্রীটি কে হে ? কার মেয়ে ? এখানে বিয়ে হচ্ছে কেন ? কখন আসবে ?

হরিচরণের কণ্ঠ শুষ্কপ্রায়, গলাটা সিক্ত করে নেবার চেষ্টা করতে করতে শুষ্ক হাসি হেসে সে সবাইকে বলে, "ওসব বলার এখন নিষেধ আছে ভাই। জানবে, এখুনি সব জানবে ”

শিবেশ্বর বলে, "আসলে ব্যাপার কি জান ভাই ? তোমাদের একটু চমক লাগিয়ে দেব—দেখই না মজাটা।"

ভয়ে, আশঙ্কায় হরিচরণের দুর্ব্বলবোধ হয়, বুকের ভিতরে অনবরত কাঁপতে থাকে। শিবেশ্বরও কম চিন্তিত নয়। ছেলেগুলো এখনো ফিরছে না কেন ? ব্যাপার কি ? অধীর আগ্রহে ওরাও রাস্তার দিকে বারংবার তাকায়। কাদেরও কি দেখা যাচ্ছে রাস্তার উপর ?

হঠাৎ চারটি মূর্ত্তি রাস্তা বেয়ে এগিয়ে এল। দৃষ্টি বিস্ফারিত করে ওরা তাকাল। হ্যাঁ, এসেছে, কনে-সমেত সবাই ফিরে এসেছে।

অর্জ্জুন নন্দকে নিয়ে এগিয়ে এল।

প্রবীর কাজললতাকে নিয়ে খিড়কির দিকে গেল।

সেখান থেকে সে ডাকল, "মাধু"—

সঙ্গে-সঙ্গেই মাধবী ছুটে এল। হাজার কোলাহলের মধ্যেও এ ডাক তার কানে পৌঁছোবেই।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে মাধবী প্রশ্ন করল, "এই আমাদের বৌদি?"

"হ্যাঁ—ভিতরে নিয়ে যাও চুপি চুপি—শিগ্‌গীর সাজ গোজ করিয়ে দেও—আর আধঘণ্টা পরেই কিন্তু লগ্ন"—

মাধবী ছুটে এসে কাজললতাকে জড়িয়ে ধরল, "তুমি! আমার সোনা বৌদি! এসো, এসো ভাই। আচ্ছা, আচ্ছা প্রবীরদা, যা বললে ঠিক তাই হবে।"

মিনিট তুয়েক বাদেই শঙ্খধ্বনি শোনা গেল আর শোনা গেল উলুধ্বনি। বাইরের বাজনদারদের চমক ভাঙ্গল। হঠাৎ শঙ্খধ্বনি শুনে তাদের হুঁস হল, এতক্ষণ চুপচাপ বসে বসে তাদের ক্লান্তি এসেছিল। সজোরে বাজনা বাজাতে সুরু করে এতক্ষণের সঞ্চিত ক্লান্তিকে তারা দূর করে দিল। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বৈশাখী আকাশের বায়ুতরঙ্গে বাঁশী আর ঢোলের আওয়াজ ভাসতে লাগল মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত।

সুরের ইন্দ্রজাল মুহূর্তে সব কিছুকে বদলে দিল, গ্যাসলাইটের আলোতে সকলের মুখে চোখে একটা ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হল। হরিচরণের গায়ে বল ফিরে আসছে, রাসমণি, মনোর মা আর মাধবীর চোখ চক্‌চকে হয়ে উঠেছে।

এঘরে নন্দ ওঘরে কাজললতা।

অর্জুন সাজাচ্ছে নন্দকে। মাধবী সাজাচ্ছে কাজললতাকে।

মেয়েরা কাজললতার খুঁত বের করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছেনা। না পারার জ্বালায় তারা ছটফট করে, নিজেদের মধ্যে কানাকানি করে। কে জানে কার মেয়ে, চেহারা থাকলই বা, অজাত কুজাত কিনা কে জানে।

"কার মেয়ে গা নন্দর মা ?"

"কার মেয়ে রে মনু—এ্যাঁ ?"

"কার মেয়ে ? বাপের নাম কি ?"

কাজললতাকে দেখে রাসমণির চোখে জল এসেছে। আনন্দাশ্রু। পুত্রবধূকে দেখে আনন্দে তার বুক ভরে উঠেছে।

এবার সে বলল, "তেতুলঝোরার গৌরদাসের মেয়ে গো—গৌরদাসের মেয়ে।"

"ওঃ!"—প্রতিকণ্ঠে ধ্বনিত হল। নামটা যে চেনা চেনা।

ওদিকে এখানকার উত্তেজনা আর রহস্যভেদের কৌতূহল গ্রামের মধ্যেও ইতিমধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। কৌতূহলী লোকদের উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা যাচ্ছে। কয়েকজন অনাহূতভাবেই এগিয়ে এল মোড়লী করার জন্য। তারক বাড়ুয্যেও এল।

এমনভাবে এল তারক বাড়ুয্যে যে দেখে মনে হয় না সে কিছু জানে। যেন সে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আলো দেখে আকৃষ্ট হয়েছে

"কি হরিচরণ, ব্যাপার কি ?"

"আসুন ঠাকুরমশায়—আসুন।" হরিচরণ হাত জোড় করে সম্ভ্রম জানাল।

"কিন্তু ব্যাপার কি হে ? এত আলো, বাদ্যি আর লোকজন কিসের জন্যে ?" তারক বাড়ুয্যে চোখ নাচাল চারদিকে।

"আজ্ঞে বিয়ে হচ্ছে।"

"কার ?"

"আমার ছেলের ?"

"এ্যাঁ!" যেন আকাশ থেকে পড়ল তারক বাড়ুয্যে, যেন এই পতনের জন্য সে তৈরী ছিল না।

"এঁ্যা !" বল কি—তা এখানে কেন, পাত্রীর বাড়ীতে না গিয়ে ?—"

"আজ্ঞে পারিবারিক কারণ।"

"কার মেয়ে ?"

"তেতুলঝোরার গৌরদাসের মেয়ে।"

"সে কোথায় ?"

"আসবেন—একটু বাদেই আসবেন—শরীর একটু অসুস্থ কিনা"—আম্‌তা আম্‌তা করে মিথ্যে কথাগুলোকে বলল হরিচরণ।

তারক বাড়ুয্যের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কানও খারাপ নয়। হরিচরণের আম্‌তা আম্‌তা ভাব, তার কণ্ঠস্বরের কম্পনকে সে লক্ষ্য করে ভ্রূকুঞ্চিত করল, মাথায় হাত বুলিয়ে, শিখায় একবার স্পর্শ করে, ধারালো হাসি হেসে সে বলল, "উঁহু, ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, আরো কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে। বলই না হরিচরণ, কি ব্যাপার ?"

প্রবীর দাওয়ার উপর ছিল, এবার এগিয়ে এসে বলল, "কিন্তু আপনার এত কৌতূহল কিসের জন্য বলুন ত ? ব্যাপার যা তা বলতেও আপনি খুশী হচ্ছেন না কেন ?"

তারক বাড়ুয্যে রোষকষায়িত লোচনে প্রবীরের দিকে তাকাল, "তুমি এর মধ্যে শিং গলাচ্ছ কেন হে ?"

"আপনার শিং গলানো দেখে। আপনার ছেলেমেয়ের বিয়ে ত' হচ্ছে না !"

এক পোঁচ্ কালি যেন তারক বাড়ুয্যের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল, শ্লেষতিক্তকণ্ঠে টেনে টেনে সে বলল, "কুলিদের সর্দার হয়ে বড় মাতব্বর হয়ে গেছে দেখছি যে।"

প্রবীরের চোখের তারা দুটোতে স্ফুলিঙ্গের আলো খেলে গেল, একটু হেসে বলল, "আপনি কি ঝগড়া কর্ত্তে চান নাকি ?"

শিবেশ্বর বাধা দিল তারক বাড়ুয্যেকে, "আপনার পায়ে পড়ি ঠাকুর মশাই, এই সব ছেলেদের কথায় মাথা খারাপ কর্ত্তে নেই। আপনি বসুন"—

হরিচরণও হাত জোড় করে বিপন্নভাবে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ যখন পায়ের ধূলো দিয়েছেন। থাকলেই দেখবেন গৌরদাস আসবে আর ব্যাপার কি। বিয়ে ব্যাপারটাই যে জটিল তা ত' জানেনই।"

তারক বাড়ুয্যে কিছু বলল না বটে কিন্তু রাগে যে সে জ্বলে যাচ্ছে তা বেশ বোঝা গেল।

অর্জ্জুন এল ভেতর থেকে। প্রবীরকে সে কি যেন বলল।

প্রবীর পুরোহিতকে ডাক দিল, "বসুন পণ্ডিত মশাই—এবার বিয়ে সুরু হোক"—

এককোনে পাঠশালার পণ্ডিত রামময় ভট্টাচার্য্য বসে ছিলেন। নিরীহ, নিরভিমান পণ্ডিত লোক। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

তারক বাড়ুয্যে ব্যঙ্গভরে বলল, "তুমিই তাহলে বিয়ে দিচ্ছ পণ্ডিত ?"

"হ্যাঁ দাদা।" অমায়িক হাসি হেসে রামময় বললেন।

"ব্রাহ্মণের অপমানটা ব্রাহ্মণ হয়েও সহ্য করলে ?"

রামময় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, প্রশান্তদৃষ্টি মেলে তারক বাড়ুয্যের দিকে তাকালেন, হেসে বললেন, "ছেলেমানুষের কথায় রাগ করতে নেই দাদা।"

"ছেলেমানুষ! কাকে ছেলেমানুষ বলছ তুমি ?"

রামময় এবার গম্ভীর হয়ে উঠলেন, "কিন্তু ও ত' তোমার কোনো অপমান করেনি দাদা, আর যদি করেই থাকে তবে ওকে ক্ষমা করুন।"

তারক বাড়ুয্যে কুটিল হাসি হাসল, "বটে! বড় বড় কথা বলছ যে! বেশ, যাও, মন্তর পড়গে। তবে মনে রেখো বামুনকে বামুনদের নিয়েই থাকতে হয়।"

"চলুন পণ্ডিত মশাই"—প্রবীর অসহিষ্ণু ভাবে ডাক দিল।

রামময় সেদিকে মুখ না ফিরিয়ে স্থিরদৃষ্টি মেলে তারক বাড়ুয্যের দিকে তাকালেন, "ভয় দেখাচ্ছ দাদা? কিন্তু আমি তো কোনো অন্যায় কাজ করছি না তাই আমার ভয়ও নেই।"

"আচ্ছা বেশ, তবে এসো।" তারক বাড়ুয্যে পা বাড়াল যাবার জন্য।

হরিচরণ বাধা দিয়ে অনুরোধ জানাল, "যখন পায়ের ধূলো দিয়েছেন তখন বিয়েটা দেখে যান ঠাকুর মশাই"—

প্রবীর হাসল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যাপারটা দেখেই যান বাড়ুয্যে মশাই।"

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি মেলে প্রবীরের দিকে তাকাল তারক বাড়ুয্যে। সত্যযুগ হলে বোধ হয় প্রবীরের জায়গায় খানিকটা ভস্মাবশেষই থাকত। তার পরেই সে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল।

ওদিকে শঙ্খধ্বনি হল, তার সঙ্গে উলুধ্বনি। বাইরে বাঁশী মন্দিরা আর ঢোল বেজে চলেছে। অর্জ্জুনের মা এবং অন্যান্য বয়স্কারা তখন গান ধরেছে। সে গান পুরাতন, গ্রাম্য, একেবারে মাটির মত।

রামময় প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু কন্যা সম্প্রদান করবেন কে?"

শিবেশ্বর এগিয়ে গেল, "আমিই করব পণ্ডিত মশাই।"

বিয়ে সুরু হল। খানিক পরে শুভদৃষ্টি হয়ে গেল।

প্রবীর গিয়ে দাঁড়াল ভিতরের দাওয়ার একপাশে। তার চোখ জুড়িয়ে গেল। আনন্দে, অপরূপ একটি স্নিগ্ধতায় তার অন্তর ভরে উঠল। সুন্দর মানিয়েছে এই দম্পতিকে। যেন ইন্দ্র আর ইন্দ্রাণী। নন্দ যেন আবার কোথাও অভিনয় করবে বলে রাজপুত্রের সাজ পরেছে। আর কাজললতা। এখন ত' আর আবছা আলোর অস্পষ্টতা নয়। মুখের একাংশ-দর্শন নয়। এখন আলোর অপ্রাচুর্য্য নেই, আকাশে রয়েছে শুভ্র আলোর মশাল, নীচে রয়েছে গ্যাসলাইট। জরির কাজ করা লাল রঙের

একটা জামদানী শাড়ি পরেছে কাজললতা, হাতে রাসমণির অনন্ত আর বালা, কানে দুল, গলায় তার নিজের হারটা। লজ্জাবনত শুভ্র ও চন্দন-চর্চ্চিত মুখমণ্ডলে একটা রক্তোচ্ছ্বাসের আরক্ত দীপ্তি ঝক্ ঝক্ করছে। ঘনপক্ষ্ম চোখ দুটো নীমিলিত, মাথায় চুম্‌কি বসানো টোপর। সুন্দর। ওরা সুখী হোক্, সুখী হোক্।

মাধবী এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, চাপা কণ্ঠে ডাকল, "প্রবীরদা"—

"কি ?"

"পালিওনা না যেন"—একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যে মাধবী যেন অস্থির হয়ে উঠেছে, সঞ্চারিনী বিদ্যুল্লতার মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে।

"কেন ?" প্রবীর তাকাল তার দিকে। চূর্ণ অলক তারে বাম চোখের বাঁকা ভুঁরুর উপর এসে পড়েছে, ললাটে, নাসিকাগ্রে আর চিবুকে মুক্তা বিন্দুর মত চক্‌চকে ঘাম, চোখের তারায় প্রখর দীপ্তি। মাধবী যেন বদলে গেছে।

প্রবীরের গা ঘেষে দাঁড়াল মাধবী, যেন কাকে সে খুঁজছে, দেখছে চার দিকে চেয়ে চেয়ে। হঠাৎ মাধবী প্রবীরের একটা হাত চেপে ধরল। একটা সুখস্পর্শ অনুভূতি। আকস্মিক। কোনো কিছু ভাববার আগেই প্রবীরের শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মাধবীর দেহটাতেও একটা মৃদু কম্পন চলেছে সে তা অনুভব করল। ঝঙ্কারের পর সেতারের তারে যেমন একটা কম্পন থাকে তেমনি।

কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র।

মাধবী আরক্তিম মুখ তুলল, ঝক্‌ঝকে দাঁত মেলে দুষ্টামীর হাসি হেসে বলল, "কেন ? বাঃ রে, বিয়ে দেখবে না ? খাবে না ?"

প্রবীর সস্মিত দৃষ্টি মেলে মাথা নাড়ল, "দেখছিই ত' আর খাবও নিশ্চয়ই।"

"বাঁচালে"—মাধবী খুশী হয়ে উঠল। বলেই সে চলে গেল মায়ের কাছে। তার এখন অনেক কাজ।

কিন্তু বাবার সময় হঠাৎ তার নজর পড়ল অর্জ্জুনের উপর। বিবাহ মণ্ডপের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে সে নিষ্পলনেত্রে তারি দিকে তাকিয়ে আছে। আহত দৃষ্টি। শুধু তাই নয়, বেদনার আভাসও যেন তার উপর টলমল করছে। নিশ্চল পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে তারি দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হল যেন সে অনেকক্ষণ ধরেই তাকে লক্ষ্য করছে, প্রবীরের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতেও দেখেছে। একটু অবাক হয় মাধবী। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অর্জ্জুনদা অমন করে কি দেখছে! আর কি-ই বা দেখবার আছে?

রামময় পণ্ডিত মন্ত্র আওড়াচ্ছেন।

কুমারীরা আর ছেলেমেয়েরা দুচোখ বড় বড় করে নবদম্পতির দিকে তাকিয়ে আছে।

বয়স্কা ও প্রৌঢ়ারা তখন গান গাইছে। কলগুঞ্জন, মন্ত্রোচ্চারণ। বাঁশী, ঢোল আর মন্দিরার তান ও শব্দ—সব কিছুর মধ্যে সেই অলঙ্কার-হীন সাধারণ সুরের রেশটা মিশে এক হয়ে যাচ্ছে। সপ্তবর্ণের তৈরী ইন্দ্রধনুর মতই বহু শব্দ ও সুরের এক বিচিত্র ও মিলিত শব্দ মনের মধ্যে মোহ ঘনায়, রক্তস্রোতে শিহরণ জাগায়।

মেয়েরা গান গাইছে—কৌশল্যার উক্তি—

"রাম আমার বিয়া করবার যায়রে,
বিয়া করবার যায়।
কার টানে রাম যায়
ফিরাও না চায় হায়,

অভাগিনী মা যে তার

ধুলায় লুটায় রে

ধুলায় লুটায় ॥"

মিলিতকণ্ঠে সবাই গাইছে। ভাঙ্গা, মোটা, কন্‌কনে, বেসুরো, সব রকম কণ্ঠস্বর মিলে এক নূতন সুর। সে গানে রাগ রাগিনীকে চেনা যাবে না; তান নয়, আলাপও নয় বরঞ্চ অনেকটা বিলাপের মত তা। একঘেঁয়ে, হাস্যকর, কিন্তু তবু মিষ্টি, আবেগময়, প্রাণস্পর্শী।

প্রবীর হঠাৎ নিজের মনে হাসল। নন্দকে দেখে। কুশণ্ডিকা হচ্ছে তখন। যজ্ঞাগ্নির সামনে বসে মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে হতভাগা মাঝে মাঝে কাজললতার দিকে চোরা চাহনি নিক্ষেপ করছে। হঠাৎ মাধবীর স্পর্শকে মনে পড়ল প্রবীরের। মুহূর্ত্তে গম্ভীর হয়ে গেল সে। নিজেকে শাসন করে, নিজেকে ধিক্কার দিয়ে মনে মনে সে বলল, প্রবীর তুমি পাষণ্ড, তুমি আদর্শহীন; মনকে সংযত করো, ভুল ভেবো না, ভুল করো না, শান্ত হও, শুচি হও।

যজ্ঞাগ্নির দীপ্ত শিখার দিকে চেয়ে সে যেন নিজেকে অগ্নিশুদ্ধ করে নিতে চাইল।

কুশণ্ডিকা-পর্ব্ব শেষ হয়েছে। বর কনে বাসর ঘরে গেছে। হাসি তামাসা চলছে মেয়েদের মধ্যে। ঠিক সেই সময়েই গণ্ডগোল বাঁধল। বহু-প্রত্যাশিত বিস্ফোরণ ঘটল।

দীনেশ আর নারায়ণ এসে উত্তেজিত কণ্ঠে ডাক দিল, "প্রবীরদা, প্রবীরদা—শিগ্‌গীর আসুন—"

প্রবীর ভিতরে ছিল, ছুটে বাইরে এল।

"কি? কি ব্যাপার দীনেশ?"

"গৌরদাস আসছে লোকজন আর দারোগাকে নিয়ে—"

"বেশত—আসুন না"—প্রবীর হাসল।

প্রবীর হাসল বটে কিন্তু উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল আর সকলের মধ্যে। হরিচরণের চোখে মুখে ভয়জনিত বিবর্ণতা ঘনিয়ে এল। বাড়ীর ভিতরে বাসর-ঘরের হাসি তামাসা স্তব্ধ হয়ে গেল, কাজললতার পাংশু মুখমণ্ডলে অসহায় বেদনা ফুটে উঠল, তার ললাটের চন্দনরেখা ঘামের সঙ্গে গলে গলে পড়তে লাগল। নন্দও ছুটে এল বাইরে। অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়ার পালা চুকে গেছে, পান দেওয়াও তাদের হয়ে গেছে। তবু তারা গেল না। শেষ অঙ্কের নাটকীয় দৃশ্যটাকে উপভোগ করার জন্য তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান চিবোতে লাগল।

মৃদুকণ্ঠে শিবেশ্বর বলল, "কি হবে বাবা, দারোগাকে নিয়ে আসছে যে!" আতঙ্ক বিহ্বলতার ছাপ শিবেশ্বরের চোখে মুখেও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

গৌরদাস এলো। ভয় পাবারই কথা। এলো যেন ঝড়ের মত। কৃতান্তের মত ভয়াল ভ্রূকুটি করে, রোষকষায়িত চোখের দৃষ্টি দিয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে। অনুচরেরাও কম নয় সংখ্যায়, বারো চোদ্দ জন হবে। সঙ্গে প্রিয়তোষবাবু।

প্রিয়তোষবাবু প্রবীরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল একবার। অর্থাৎ এইবার কাণ্ডখানা দেখুন মশায়।

গৌরদাস হরিচরণের সামনে দাঁড়াল, গর্জ্জন করে বলল, "কৈ, আমার মেয়ে কই?"

হরিচরণ শুকনো জিভকে ভিজিয়ে নিয়ে ঢোক গিলে বলল, "আসুন, আসুন বেয়াই মশাই, আসুন সবাই"—

এই সম্ভাষণে গৌরদাস হঠাৎ ক্রোধের প্রাবল্যে স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপরেই বিকৃত মুখভঙ্গি করে বলল, "বেয়াই না শ্বশুর—শা—"

প্রিয়তোষবাবু এগিয়ে এল, "থামুন মশাই, ঢের হয়েছে। গালি গালাজ করে আর কেলেঙ্কারী বাড়াবেন না। চুপ করুন, শুনি ব্যাপার কি?"

সে হরিচরণের দিকে তাকাল, "গৌরদাসের মেয়ে এখানে?"

হরিচরণ কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"কে নিয়ে এসেছে?"

প্রবীর হেসে বলল, "আজ্ঞে, তিনি নিজেই এসেছেন, তবে সঙ্গে আমরাও ছিলাম বটে।"

"হু—সে কোথায় এখন?"

"ভিতরে।"

"কি করছে?"

"বিয়ের পর বাসর ঘরে বসে আছে।"

"তার কাছে যাব আমরা।"

"হ্যাঁ, আমি যাব তার কাছে, তাহলেই সব জারিজুরি ধরা পড়বে দারোগাসাহেব"—গৌরদাসও ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে সায় দিল

দর্শকজন নিরুদ্ধনিঃশ্বাসে নাটক দেখছে।

হরিচরণ আর শিবেশ্বর এগিয়ে চলল। পিছনে চলল সবাই

বাইরের ঘরে ঢুকতেই প্রবীর নন্দকে ইসারা করল। নন্দ এসে গৌরদাসের সামনে ঢিপ্ করে একটা প্রনাম করল।

"মানে?" গৌরদাস চোখ দুটো ছোট করে প্রশ্ন করল। নন্দর দিকে সুস্নেহ আর ক্রোধমিশ্রিত দৃষ্টি মেলে সে তাকাল।

"মানে ও আপনার জামাই—"

যেন সাপে ছোবল মেরেছে। ছিটকে এগিয়ে গেল গৌরদাস।

বাসর ঘর। বাইরে দাঁড়াল সবাই। গৌরদাস আর প্রিয়তোষ ভিতরে গেল।

ফুল আর আল্‌পনা। অলঙ্কার আর আলো। তারি মধ্যে কাজললত দাঁড়িয়ে আছে। সোজা, ঋজুভঙ্গীতে, উদ্ধত, গর্ব্বিত দৃষ্টি মেলে। সুগৌর মুখের রেখায় রেখায় একটা সুকঠিন দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে, ললাটের ও সীমন্তের সিন্দুর-চিহ্ন রক্তবর্ণ প্রবালের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। মেয়েকে আর গৌরদাস চিনতেই পারে না।

থম্‌কে, বিস্ফারিতনেত্রে সে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়ের এই মহিমময়ী মূর্ত্তি, তার এই রূপান্তর দেখে সে অভিভূত হয়ে পড়ল; ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় ক্রোধের যে প্রচণ্ড আবেগ পাথরের মত জমাট হয়ে উঠেছিল তা যেন হঠাৎ গলে যেতে লাগল। চারদিকে তাকাল সে। তক্‌তকে, ঝক্‌ঝকে। প্রাচুর্য্য নেই, তবে দৈন্যও নেই। স্বাচ্ছন্দ্য আর শুচিতা ঘরবাড়ীর সর্ব্বত্র। নন্দর দিকে তাকাল সে। মুহূর্ত্তের জন্য। সবল, রূপবান যুবক, দেখেই মায়া জন্মায়। হঠাৎ গৌরদাস ভারী দুর্ব্বল বোধ করে।

"কাজল"—তবু গম্ভীরকণ্ঠে সে ডাকল।

"বাবা"—কাজললতা এগিয়ে এল, হাঁটু গেড়ে বসল, বাপের পায়ের কাছে মাথা লুটিয়ে প্রনাম করল।

গৌরদাস নড়ল না, কথা বলল না। অন্তর্দ্বন্দ্বে কেবল মাথার বিরল কেশে হাত বুলোতে লাগল।

উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে সবাই। দেখ্‌ছে সবাই। নিঃশব্দতা। শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায় আর চুড়ার টুংটাং।

কাজললতা মাথা তুলল, "বাবা, আমায় আশীর্ব্বাদ কর। রাগ করো না বাবা, কারো দোষ নেই। আমি নিজেই এসেছি। আর কোথাও গেলে যে সুখী হতাম না তাই তোমার অবাধ্যতা করেছি। এবার তুমি আশীর্ব্বাদ করলেই আমার সব সাধ মিটে যাবে বাবা। বাবা—"

গৌরদাস নিঃশব্দে মেয়েকে বুকে টেনে নিল।

প্রবীর হাসল। জয় হয়েছে। হরিচরণ হাসল, শিবেশ্বর হাসল, রাসমণি হাসল, মাধবী হাসল, সবাই হাসল। কেবল হাসল না তারা যারা ভেবেছিল যে বেশ কয়েকটা মাথা ফাটবে, লাঠি ভাঙবে, হাতকড়া পরিয়ে দারোগাবাবু গোঁফে তা দেবে। কিন্তু কিছুই হল না! আশা-ভঙ্গের কষ্টে তারা মুখ বিকৃত করল শুধু।

প্রিয়তোষ বাবু গম্ভীরভাবে বলল, "কি ফ্যাসাদ বলুন দেখি—কেস্‌টা যে বিগ্‌ড়ে গেল! কি মশাই—কি করব? ফিরে যাব, না এখনো কিছু করতে চান?"

গৌরদাস নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

প্রিয়তোষ বাবু হাসল, "কিন্তু যাই বলুন, লাভ আপনারই হল। পাত্র পাত্রীকে কি সুন্দর মানিয়েছে বলুন দেখি, তাছাড়া বেশ ত' ঘর বাড়ী, অজাত কুজাতও নয়। কোলাকুলি করে ফেলুন মশাই, কোলাকুলি করুন।"

ভিতরে আবার একচোট শঙ্খধ্বনি হল, তার সঙ্গে [illegible] বাজনদারেরা পান চিবোচ্ছিল, হঠাৎ হকচকিয়ে উঠল সে আওয়াজে, ভাবল কোনও ক্রিয়াকর্ম্ম বোধ হয় বাকী আছে। তারাও আবার আর একদফা বাজনা সুরু করল।

হরিচরণ এগিয়ে এল, সহাস্যে দুহাত বাড়িয়ে বলল, "বেয়াই, মাফ করো—"

গৌরদাস যেন কেমন বেকুব হয়ে গেছে, হরিচরণকে সে আলিঙ্গন করল বটে কিন্তু নীরবে। মুখের মধ্যে তখনো একটা থম্‌থমে ভাব।

প্রবীর প্রিয়তোষবাবুর হাত চেপে ধরল, "ধন্যবাদ—অনেক ধন্যবাদ। শুধু ধন্যবাদ না, কৃতজ্ঞতাও জানাচ্ছি প্রিয়তোষ বাবু। কিন্তু বুড়োটার মুখ যে পেচকের মতই রইল মশাই?"

"ওসব ঠিক হয়ে যাবে মশাই, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ওসব যাক্. একটু মিষ্টিমুখ করান দেখি। খেয়ে বাড়ী যাই। ঘুম পেয়েছে।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। অর্জ্জুন, ব্যবস্থা করো ভাই—"

বাসর ঘরে আবার বর-কনে বসল। হাসি তামাসা সুরু হল।

অতিথিদের মধ্যে যাদের খাওয়া হয়েছিল তারা এবার বিদায় নিল। যবনিকা-পতনের পরেও কি ভাঙ্গা আসরে থাকতে হয়? কুরুক্ষেত্র পর্ব্বের পর শান্তিপর্ব্বের মতই বৈচিত্র্যহীন। বীররসের পরে আর কোনো রসই জমে না।

"বেয়াই, খেতে আসুন"—শিবেশ্বর এসে মিনতি জানাল।

গৌরদাস গম্ভীরভাবে তার দিকে তাকাল শুধু, কথা বলল না।

হরিচরণ অনুরোধ জানাল, "এসো ভাই"—

এতক্ষণ গৌরদাসের মুখে কথা ফুটল, বলল, "কালই আমি মেয়ে জামাইকে নিয়ে যাব বেয়াই"—

হরিচরণ যেন কৃতকৃতার্থ হয়ে গেল, "বেশত, নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে। এখন খেতে চল"—

শিবেশ্বর মুচকি হাসল।

গৌরদাসের সঙ্গীদের মধ্যে একজন বয়স্ক লোক, নাম নিতাই পাল, হেসে বলল, "যাই বল গৌর, পাত্রটি মন্দ হয়নি"—

গৌরদাস মুখবিকৃত করল, হরিচরণের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বলল, "ছাই ভাল, আমার মেয়ের কাছে কোথায় লাগে?"

হরিচরণ সবেগে মাথা নাড়ল, যেন অপরাধী দোষ স্বীকার করছে এমনিভাবে বলল, "নিশ্চয়ই, ঠিক কথা, ঠিক কথা। তোমার মেয়ে সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা বেয়াই—ঘর আমার আল্লায় আলো হয়ে গেছে সে আসায়।"

"হুঁ—"গৌরদাস একটু খুশী হয়ে উঠছে, "কিন্তু ব্যাপার কি বলত ?"

হরিচরণ ফিস্ ফিস্ করে বলল, "ভালবাসা বেয়াই।"

"এঁ্যা"—গৌরদাস চোখ বড় করল, "তাই তো—তাই—ওঃ"—কাজললতা যে প্রায় দুপুরেই বাড়ীতে থাকত না তার কারণ আজ সে খুঁজে পেল।

"ভাবছ কি বেয়াই, আমাদের দিন গেছে। ছোঁড়া ছুঁড়ীরা আমাদের আর গেরাহ্যিই করে না। শহর আর গ্রাম আজ এক হয়ে গেছে।"

"হুঁ"—গৌরদাস মাথা নাড়ল, পরে হরিচরণের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গভরে বলল, "কিন্তু এত সাধু সেজে কি আমায় ভোলাতে পারবে ভাবছ ? তুমিও তো এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলে বেয়াই।"

"না থাকলে মা অন্নপূর্ণাকে পেতাম কি করে ?"

"নিজে গেলেই পারতে আমার কাছে।"

"পাত্রের বাপের একটা অহঙ্কার থাকবে না ?"

"হয়ত ছিল, এখন ছাই আছে। এমনভাবে আমার সঙ্গে এখন কথা বলছ যেন তুমিই মেয়ের বাপ আর আমি ছেলের বাপ।"

"কিন্তু তাই নয় কি ?"

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

শিবেশ্বর ডাক দিল, "চল বেয়াই—পাঁত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

গৌরদাস নিজের সঙ্গীদের দিকে তাকাল, "চলহে সব—পড়েছি মোগলের হাতে—বুঝছ না ? কিন্তু বেয়াই"—

"এঁ্যা"—

"তেতুলখোরায় লোক পাঠাও, সব খবর জানাও—বাড়ীতে সবাই চিন্তিত আছে।"

"এখুনি পাঠাচ্ছি ভাই।"

প্রবীর উঁকি মারল বাসর ঘরের জানালায়।

যাত্রার অর্জ্জুন মেয়েদের ঠাট্টা বিদ্রূপে লালচে হয়ে উঠেছে।

রাজকন্যারও মুখে রক্তজ্যোতি।

একটি মেয়ে বলল, "একটা গান গাও নন্দদা"—

নন্দ বলল, "ইস্, বললেই যেন গান গাইব—না? ওসব হবে না বাপু, বড় কষ্ট করে বিয়ে করেছি, আমাকেই বরঞ্চ গান শোনান উচিত।"

হি হি হি! মেয়েরা মুখে আঁচল দিল। কাজললতা ঘোমটাটা বাড়িয়ে দিল। ঘোম্‌টার আড়ালে হাসতে সুবিধে হবে।

ওরা সুখী হোক্।

পা টিপে টিপে প্রবীর বাইরের দিকে যাচ্ছিল। এতক্ষণে ক্লান্তিবোধ হচ্ছে। জামায় টান পড়ল।

"কোথায় পালাচ্ছ শুনি?" মাধবী চোখ রাঙাল।

"পালাচ্ছি আবার কোথায়?"

"খেয়ে যাও—"

"বেশ দাও

পাতে বসল প্রবীর। বাইরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় সব উদ্ভাসিত। নিঃসীম আকাশে পাণ্ডুরবর্ণ নক্ষত্র-সমারোহ। সাম্‌নে মাধবী বসে দেখছে। রাসমণি তত্ত্বাবধান করে যাচ্ছে, হরিচরণ ঘুরে গেল। প্রবীর একবার তাকাল মাধবীর দিকে। হরিণীর কালো চোখের আড়ালে অরণ্যের যে রহস্য লুকানো থাকে তা যেন তাকে ঘেরাও করছে। অনেক দূরের নক্ষত্রের মত স্থির দৃষ্টি মেলে মাধবী চেয়ে আছে। প্রবীর চোখ নামাল। আর তাকাবে না সে।

বয়স্করা তখন আবার গান ধরেছে—

"বিয়া কইর‍্যা রাম আমার
আইল ফির‍্যা ঘরে রে,
আইল ফির‍্যা ঘরে।
তোরা দেইখ্যা যা লো দেইখ্যা যা,
রাম কারে আনিল ঘরে।
"এযে রাজার ঝিয়ারী
এযে সোনার পুতুলী,
এ যে আকাশের চাঁদ আইন্যাছে ধইর‍্যা রে॥"

"প্রবীরদা"—মাধবী ডাকল।

"উঁ?"

মাধবী চুপ করে রইল।

"কি বলছ মাধু?" খেতে খেতে নতমুখেই প্রবীর প্রশ্ন করল।

"কিছু না—এমনি। তুমি খাও।"

নীচের ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল মাধবী।

খেয়ে দেয়ে প্রবীর চলে গেল। হঠাৎ এমন তাড়াতাড়ি গেল যেন কেউ তাকে তাড়া করেছে বলে পালিয়ে গেল। নিমন্ত্রিত মেয়েরা ও পুরুষেরা চলে গেল। ক্রমে বাড়ীর কাজকর্ম্ম কমে আসল। বরকনে এবং প্রায় আর সবাই শুয়ে পড়ল। হরিচরণ আর রানীমণি ছাড়া রাত হল।

মাধবীও শোয়নি।

দাওয়ার অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে ছিল সে, বাইরের দিকে তাকিয়ে। চাঁদের আলোর অস্পষ্ট একটা রেশ এসে তার শরীরের উপর পড়েছিল। ভাল করে কেউ যদি লক্ষ্য করত তবে হয়ত সে দেখতে পেত যে তার বুকের সঙ্গে মিশিয়ে আছে একটা শুক্‌নো মালা,

আর তার চোখের মধ্যে টলমল করছে জল। কেউ কি জানে মাধবীর কি হয়েছে?

কলির সন্ধ্যাতেও ব্রহ্মণ্যতেজ কমেনি। তারক বাড়ুয্যে সেদিন যে অপমান মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরেছিল, ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণের কাছ থেকে নিজের অন্যায় কৌতূহলের দাবী করে নিরাশ হওয়ার যে জ্বালায় জ্বলছিল, তারই প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল তিন দিন পর, সন্ধ্যার একটু আগে।

যদুপতি বাবুর বাড়ী থেকে সুব্রত'র সঙ্গে প্রবীর ফিরে আসছিল। পথে রামময় ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে দেখা হল।

"নমস্কার পণ্ডিত মশাই।" প্রবীর আর সুব্রত হাত তুলল।

রামময় শীর্ণ হাসি হাসলেন। উত্তর দিলেন না, নীরবে প্রতি নমস্কার জানালেন শুধু।

তাঁর অবসন্ন ভাব, হাসির কৃপণতা ও রেখাকুল ললাটকে প্রবীর লক্ষ্য করল।

"মনমরা কেন পণ্ডিত মশাই?"

রামময় একটু কাশলেন, গলাটা পরিষ্কার করে বিষণ্ণ ভঙ্গীতে বললেন, "শুনবে?"

"বলুন—"

"আসছি পঞ্চায়েৎ থেকে, গ্রামের ব্রাহ্মণদের পঞ্চায়েৎ থেকে, আমার বিচার হচ্ছিল—"

"মানে?" সুব্রত বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

"মানে সুস্পষ্ট—আমি দুর্ব্বল, আমি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই নি। প্রবীরকে ন্যায্য কথা বলার জন্য ধমকাই নি, তারক বাড়ুয্যের অশোভন কৌতূহলের সমর্থন করিনি, নন্দর আসুরিক বিবাহে পৌরহিত্য করতে অস্বীকৃত হইনি। প্রবীর যুবক, তাকে কিছু বলার সাহস ওঁদের নেই, হরিচরণের ব্যাপারটার শেষরক্ষা হয়েছে বলে তাকেও জবাই করা গেল না, তাই কোপাগ্নিতে ভস্ম হলাম আমি।"

"তারপর ?" প্রবীরের কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা।

"তারপর আর কি—অনেক শাস্ত্রোক্তি আর তীব্র সমালোচনা, অবশেষে একঘরে করবার হুম্‌কী —"

"কি করলেন আপনি ?"

"ক্ষমা চেয়ে এলাম। গরীব বামুন পণ্ডিত, দুচারটি ছাত্র ঠেঙিয়ে যা পাই তাও বন্ধ হয়ে গেলে খাব কি বাবা ?" ক্লিষ্টহাসি হাসলেন রামময় ভট্টাচার্য্য।

"আমি এখুনি যাচ্ছি সেখানে"—প্রবীর রুদ্ধকণ্ঠে বলল।

রামময় মাথা নাড়লেন, "না বাবা, ওসব করো না। অন্তরের পরিবর্ত্তন না হলে চেঁচামেচি বৃথা, ওতে যেও না। ক্ষমা চেয়েই কি আমি ছোট হয়েছি ? একজনও কি আমায় বুঝবে না ?"

সুব্রত মাথা নাড়ল. "পণ্ডিত মশায়ের কথাই ঠিক প্রবীর। অবশ্য আপনাকে একঘরে করবার ক্ষমতা আমরা থাকতে হতে দিতাম না, সেদিন গেছে। তবু নিষ্পত্তি যখন এত অল্পেই হয়েছে. এতটুকুতেই যখন দেবতারা খুশী হয়েছেন তখন আর এর জের টেনে লাভ নেই।"

প্রবীর চুপ করে রইল।

রামময় বললেন, "পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন—আজ ভাব্‌ছি যে শূদ্র-কুলোদ্ভব কোনো পরশুরাম কি

জন্মাবেন না যিনি একবারেই পৃথিবীকে ব্রাহ্মণহীন করে দিতে পারেন ? যদি জন্মান তবে কুঠারের নীচে আমার মাথাটাই সর্ব্বাগ্রে এগিয়ে দিতাম। যাক্, এবার তাহলে আসি বাবারা।”

রামময় চলে গেলেন ভিন্ন দিকে।

খানিকক্ষণ দুজনে নিঃশব্দেই পথ অতিক্রম করল।

“এই হয়”—প্রবীর মৃদুকণ্ঠে বলল, “মানুষের তৈরী দেবতা যেদিন মানুষের শ্বাসরোধ করে, দেবতার নির্দ্দেশের দোহাই পেড়ে পদবী যখন কায়েমী হয়, বংশগত বৃত্তিকে যখন পাপপুণ্য আর জন্মান্তরবাদের নজির দেখিয়ে ছোট আর বড় করে ভেদাভেদ করা হয় তখন এই হয়, এইভাবেই তখন মানুষ মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমানিত করে।”

সুব্রত নিরাশ হতে চায় না, পথ খুঁজে বের করবেই সে একটা। সে বলল, “একটি বিষবৃক্ষের অজস্র বিষফল। পরাধীনতাই এর কারণ, স্বাধীনতা এলেই এ ভেদাভেদ কমে যাবে।”

প্রবীর মাথা নাড়ল, “স্বাধীনতা দেশের স্বাধীনতাই আনবে শুধু—ভেদাভেদ কমবে বটে কিন্তু দূর হবে না। স্বাধীনতারও পরে এর রফা হবে—এই ভেদাভেদ আর মনুষ্যত্বের অপমানের জন্য চক্রবৃদ্ধি হারে, সুদের সুদ-সমেত আসলকে আদায় করা হবে। সেদিন রক্ত পড়বে।”

মানতে রাজী নয়। রক্ত! রক্ত কেন? হিংসা, শুধু হিংসাই কি শেষ পথ ? অস্ত্র দিয়ে জয় না করলে স্থায়ী জয় কি হয় ?”

প্রবীর হাসল, “তুই ভুল করছিস সুব্রত। এ ত' জয় পরাজয়ের কথা নয়—এযে ব্যাধি, বিকার, বিষ। কিন্তু থাক্, তর্ক বাড়িয়ে আর লাভ নেই, বাড়ী এসে গেছে তোর।”

“আচ্ছা, আর একদিন ও নিয়ে আলোচনা হবে।”

“আচ্ছা।”

সুব্রত চলে গেল। প্রবীর এগিয়ে চলল।

আখ্‌ড়ার কাছাকাছি হতেই পথের বাঁকে শিখার সঙ্গে মুখোমুখী দেখা। শিখার সঙ্গে দারোয়ান আছে একজন।

"নমস্কার"—প্রবীর বলল। অপ্রত্যাশিত এই সাক্ষাৎ।

"নমস্কার"—কোথায় যাচ্ছেন?" শিখার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সুযোগ পেল প্রবীর। তাড়াতাড়ি পালাবার একটা অজুহাত পেল সে।

"যাচ্ছি একটু কাজে—বিশেষ কাজে—"

"তা বিশেষ কাজ ত' হবেই। আমায় এড়াতে হবে যে।" শিখা ধারালো হাসি হাসল।

প্রবীর চমৎকৃত না হয়ে পারে না। শিখা নিঃসন্দেহে তীক্ষ্ণবুদ্ধি-শালিনী। কিন্তু তবু শিখাকে এড়াতে পারলেই যেন বাঁচে প্রবীর। শিখা এখানে বেমানান, মনে প্রাণে সে সহরের জীব, তবু কেন সে এখানে পড়ে আছে? এই গ্রাম্য পারিপার্শ্বিকে ওর রুজ পাউডার আর জর্জেট বড় খাপছাড়া, বড় বেমানান। বেসুরো সুরের মত, তালহীন তালের মত, বিশ্রী, অসহ্য।

"কি চুপ করে রইলেন যে?"

"আপনি আমায় লজ্জা দিচ্ছেন কেন? সত্যি কাজ আছে, আমার।" প্রয়োজনে মিথ্যা বললে পাপ নেই। 'পথের দাবীর' সব্যসাচীকে প্রবীর স্মরণ করল।

"বেশ আজ না হয় কাজ আছে, কিন্তু কাল, তারপর? আপনার রাগ মেটে নি, মিটবেওনা, কিন্তু আমাদের ওখানে আপনার যাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল—আপনি নিজেও যাবেন বলেছিলেন, মনে আছে?"

"আছে। যাব, সত্যি যাব এবার একদিন।"

"তবু অনির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি!" শিখার কণ্ঠস্বর একটু কাঁপল, হঠাৎ হাত জোড় করে সে বলল, "আচ্ছা এবার তবে যাই, আপনার হয়ত দেরী হয়ে যাচ্ছে। চল বিপিন"—শেষের কথাগুলোকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল শিখা।

ওরা চলে গেল।

একটু লজ্জা হল প্রবীরের।

মেয়েটির বুদ্ধি আছে, রুচি আছে, শিক্ষা আছে। পাউডার আর ঢিলেতার অন্তরালে খানিকটা রূপও আছে। কিন্তু তবু ওর সামনে যেতে ভয় করে। ও বড় বুভুক্ষু, ওর চোখে মুখে তারই ছায়া যে নিরন্তর ফুটে ওঠে। প্রবীর তা সহ্য করতে অক্ষম। তাছাড়া সোনা আর ধূলো, তেল আর জল, অন্ধকার আর আলোর মতই অনেক ব্যবধানের প্রাচীর রয়েছে প্রবীর আর শিখার মাঝে। দুই মেরুর ব্যবধান আর পার্থক্য। তাছাড়াও কারণ আছে। প্রবীর পতঙ্গ হবে না। না।

চলতে লাগল সে। সন্ধ্যার অন্ধকার এল। গাছপালার আড়ালে সোনার থালার মত পূর্ণিমার চাঁদকে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়।

বাড়ী ফিরল সে। আখড়ার পিছনকার রাস্তা দিয়ে।

আলো জ্বালতেই টেবিলের উপর একটি চিঠি নজরে পড়ল। মাধবীর অপটু হাতের আঁকাবাঁকা লেখা, লিখেছে—'শ্রীচরনেষু' প্রবীরদা আজ দুবার আসিয়াছিলাম। দাদা বৌদি বিকেলে এসেছে। আজ ফুলশয্যা, আপনি অবশ্য আসিবেন। অন্যথা না হয়, দাদাও আপনাকে ডাকিতে এসেছিল। আর এক কথা—আপনি আর এ ক'দিন আসেন নাই কেন? আমার উপর কি রাগ করেছেন?—ইতি আপনার মাধবী।"

"আপনার মাধবী" কথাটার উপর দু'তিনবার কালি বুলিয়েছে মাধবী।

প্রবীরের মুখ একটু গম্ভীর হয়ে উঠল। কিন্তু মাধবীর মুখচ্ছবি মানসনেত্রে ভেসে উঠতেই সে নিজের মনে হাসল। ছেলে মানুষ, ভারী ছেলে মানুষ মাধবী, ওকে ভয় নেই। মাধবী দহন করে না, মাধবীর মধ্যে শিখার মত সর্ব্বগ্রাসী আগুনের বুভুক্ষা সমাহিত নেই। কিন্তু মাধবী কি চায়? এর অর্থটা কি?

এমনি ধরণের কথা ভাবল প্রবীর। কিন্তু সে কি ঠিক বিচার করতে পেরেছে মাধবীকে? ভাবতে ভাবতে নন্দর বিয়ের রাতের কথা মনে পড়ল প্রবীরের। মাধবীর হাতের চাপ, তার যাওয়ার সময় মাধবীর নিষ্পলক চোখের চাহনি। প্রবীরের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

যাবে কি যাবে না? দুটো মন হয়ে গেছে প্রবীরের। একটা ডান দিকের, একটা বাঁ দিকের। একটা ওপরের আর একটা ভিতরের একটা চোখ রাঙিয়ে নিষেধ করে অপরটা বলে যেতে। একটা বলে, নির্ম্মম হও; আর একটা বলে সহজ হও, তোমার ভয় কেন?

হঠাৎ ঠিক করে ফেলল প্রবীর। সে যাবে নন্দদের বাড়ী। মনের দুর্ব্বলতাকে দমন করবে সে, তাই বলে অস্বাভাবিক বা অভদ্র হবে না। আর—আর মাধবীকে দুঃখ দিতে বড় মায়া হয়, কষ্ট হয়। ভারী নিষ্পাপ, ভারী সরল, ভারী সুন্দর মেয়েটি। ভালবাসা নয়, তবে মাধবীকে তার ভাল লাগে।

দিন কেটে চলল।

দিনের পর দিন কেটে মাস কাটল। জ্যৈষ্ঠ এলো। জ্যৈষ্ঠের প্রথমভাগে ঝড়বৃষ্টি হল। চারদিকের ক্ষেতে লাঙ্গল-চষা শেষ হয়েছে সবে। তৃষ্ণার্ত্ত। ধরণীর শুষ্কতা দূর হল, তার তৃষ্ণা বাষ্প হয়ে উড়ে গেল ধূপের ধোঁয়ার মত। বীজ বপন সারা হয়ে গেছে।

নন্দকে সব সময়ে পাওয়া যায় না, হরিচরণ একাই বেশী খাটে। কিন্তু কোন অনুযোগ করে না সে। যৌবনের নিয়মকে সে মানে, জানে।

প্রবীর আজকাল টোঁ। টোঁ। করে ঘুরে বেড়ায়। অনেক সময় সুব্রতও সঙ্গে থাকে। যায় ইউনিয়নে। শ্রমিকদের বাড়ীঘর মেরামত হচ্ছে, মাইনেও বেড়েছে, আপাততঃ তারা নিশ্চিন্ত আছে। যায় ওরা চাষীদের কাছে। তাদের বাড়ীতে, মাঠে, আশপাশের গ্রামেও যায় ওরা। কংগ্রেসের বাণী, স্বাধীনতা আর সাম্যের বাণী শোনায়, বোঝায়, তাদের অভাব অভিযোগ শোনে, যথাসাধ্য চেষ্টা করে তা মেটাতে, গোপনে হস্তলিখিত সাম্যবাদী ইস্তাহারও বিলি করে প্রবীর।

আষাঢ় এলো। ক্ষেতের বুকে গাঢ় সবুজের শোভা। ধান আর পাটগাছ। প্রাণরসে চক্ চক্ করছে, বাতাসে দুলছে।

একটা স্কুল করার ঝোঁক হয়েছে প্রবীরের। অনেকদিন থেকে। তারি স্বপ্ন দেখে সে। গ্রামে হাইস্কুল আছে কিন্তু সেখানে কে যায়? যার পয়সা আছে। যার নেই সে কোথায় যাবে? এমনি ছেলেমেয়েই ত' বেশী। রামময় পণ্ডিতের কাছে কিছু যায়, বাকী যায় না। অথচ শিক্ষা চাই। শতবৎসরের কূটনৈতিক বিদেশী শাসনে মনের ভিতর ঘুণ ধরেছে সবার। পরাধীনতার স্বরূপ কেউ বোঝে না ও শুধু একটা শব্দ মাত্র। এই নিদারুণ জড়তা, অজ্ঞতা ও ক্লৈব্যকে দূর করতে হলে শিক্ষা চাই। দিনরাত ভাবে প্রবীর।

প্রান্তরের গান

আষাঢ় শেষ হল শ্রাবণ এল। এল ঝমঝমে বর্ষা। আকাশের নিলীমা কালোয় আচ্ছন্ন হল, অসীম আকাশের বুকে এক মদমত্তা কৃষ্ণা রূপসীর রৌদ্র নৃত্য সুরু হল। মেঘের মৃদঙ্গ বাজে, বাজে বজ্রের ডম্বরু। বিদ্যুতের বিভ্রমে নৃত্যরতা রূপসীর কটাক্ষ জ্বলে। লক্ষ লক্ষ সেতারের ঝঙ্কার তুলে বৃষ্টি নামে। বাতাস বয়ে যায়। বৃষ্টিস্নাত সবুজের গাঢ় শোভা চেতনাকে নবযৌবন দান করে। ব্যাঙের ডাক শোনা যায়— কাঠব্যাং, কোলাব্যাং, সোনাব্যাং। জল বাড়ে। ধানের চারা দুরন্ত উল্লাসে আকাশের দিকে মাথা তুলতে থাকে আর বাতাসে প্রবাহিত হয় নূতন জলের গন্ধ, পচা ঘাসপাতা আর ভিজে মাটির ভ্যাপ্‌সা গন্ধ।

এমনি ভাবে দিন কাটে।

গ্রামের মধ্যে সেই নিরুদ্বিগ্ন অতি সাধারণ জীবন যাত্রার ঘানি চলে। চাষী, গৃহস্থ আর পাটকলের শ্রমিক। ভোর হয়, মানুষ জাগে। খাটে, খায়, শোয়, আড্ডা দেয়, তামাকের ধোঁয়ায় পরনিন্দা আর পরচর্চা করে, আখড়ায় গিয়ে হরি বলে ধূলো মাখে, মস্‌জিদে গিয়ে মাথা নুইয়ে নামাজ পড়ে, আবার বাড়ী ফেরে, খায় আর ঘুমোয়। আর কিছু নয়। একঘেয়ে, পুরাতন একটা ধারা। মরা নদীর ক্ষীণ স্রোতোধারার মত।

কিন্তু ওরি মধ্যে নূতন প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়, আগামী কালের পায়ের ধ্বনি ধ্বনিত হয়। এই জল, নদী আর অমানুষদের জীবন-দিগন্তে কালবৈশাখীর পিঙ্গল ছায়াও অলক্ষ্যে পড়ে। মত আর পথ ভিন্ন হলোই বা, সুব্রত, প্রবীর, আবদুল এবং আর সবাই সেই একই বিপ্লবের অগ্রদূত। বোঝা যায় না, তবু কাজ হচ্ছে। বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম যেমন দেখা যায় না, বোঝা যায় না একদিনে তেমনি ভাবে

কাজ এগোচ্ছে। দিন এগিয়ে আস্ছে—সবাই এগোচ্ছে। হয়ত দেরী আছে—অনেক দেরী, তবু এগোচ্ছে সবাই।

দিন কাটে। দিনগুলো কাটে—

ওরি মধ্যে জমিদারকন্যা শিখার দীর্ঘনিঃশ্বাস বাতাসে ভেসে যায়, মাধবীর চোখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। প্রবীরের সময় নেই। প্রবীর নিষ্ঠুর। ওরি মধ্যে মুগ্ধ নন্দ'র আনন্দ-মুখর দিনগুলো মিশিয়ে আছে, আছে কাজললতার হাসি, আছে হরিচরণ আর গৌরদাসের স্নেহ। ওরি মধ্যে ললিতার গান আছে, আছে শ্রমিকদের কোলাহল আর আছে পাটকলের বাঁশীর সুতীক্ষ্ণ শব্দ।

সব আছে, সব আছে। হাসি আছে, গানও আছে। কিন্তু তবু সব কিছু যেন রিক্ত প্রান্তরের মত মনে হয়। নিরবয়ব প্রেতের মত। থেকেও নেই। প্রাণ নেই, আত্মা নেই, স্বাধীনতা নেই, সাম্য, নেই, মানুষে মানুষে ভালবাসা নেই, মন্দিরে ও মস্জিদে কোলাকুলি নেই।

এমনিভাবে দিন কাটে।

এল ভাদ্র। নদী, নালা, খাল, বিল, সব ভরপুর, সব থৈ থৈ করছে। গৈরিক জলের স্রোত ভৈরবী রাগিনী গায়। জলের ভিতর থেকে ধান্যের চারা মাথা তুলে হাওয়ায় দোলে। ধলেশ্বরীর জল বাড়ে। নিঝুম রাতে আওয়াজ ভেসে আসে—বড় বড় মাটীর চাঙর ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে, রাক্ষসীর মত ধলেশ্বরী গর্জ্জাচ্ছে।

এই ভাদ্রেরই মাঝামাঝি একদিন প্রবীর বিকেলে বেড়াতে বেরোল। হাতে কোনো কাজ নেই, অনেকদিন উন্মুক্ত ক্ষেতের সামনে গিয়ে চুপ করে বসে থাকেনি সে। লোভ হল।

প্রান্তরের গান

জল কাদা ভেঙ্গে চলল প্রবীর। বুড়ো শিবের মন্দিরের কাছাকাছি, সেই যেখানটায় শিখার সঙ্গে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন দেখা হয়েছিল, সেইখানে গিয়ে বসল সে।

শরৎকাল। সূর্যের আলোতে সুবর্ণ মেশানো, মেশানো সোমরসের জ্বালা। গাঢ় সবুজ ধানের ক্ষেত আর জল দিগন্তে নীল হয়ে গেছে। দক্ষিণের বিল সমুদ্রের মত ধূ ধূ করছে, তার মধ্য থেকে নলঘাস আর বেতঝোপ মাথা তুলে রয়েছে। বিলের ধারে ধারে রয়েছে শুভ্র কাশের সুনিবিড় ঝোপ। তুলোর মত নরম আর সুন্দর। গুড়ি গুঁড়ি কচুরি পানার রাশি বিলের মধ্যে রাজ্য বাড়াচ্ছে। ফুটে আছে নীলপাপড়িওয়ালা কলমিফুল আলের ধারে ধারে, ফুটে আছে শালুক ফুল বিলের বুকে। ফিঙে পাখী ডাকছে, গাঙ্‌শালিক উড়ছে। রৌদ্রতপ্ত বাতাসে ভাসছে জল আর কাদা, গাছপালা আর ধান ক্ষেতের একটা তীব্র গন্ধ।

"প্রবীর ভাই নাকি?"

প্রবীর মুখ তুলে তাকাল। মৌলানা বসিরুদ্দিন। গ্রাম্য মুস্‌লিম্ লীগের পাণ্ডা। বয়সে প্রবীন, শিক্ষিত ও বেশ অবস্থাপন্ন লোক। জোত জমি আছে অনেক, তা ছাড়া পাটের ব্যবসা আছে ঢাকায়।

"নমস্কার মৌলানা সাহেব?" প্রবীর উঠে দাঁড়াল।

"আদাব ভাই, আদাব।" মৌলানা বলল।

"কোত্থেকে আসছেন?"

"গিয়েছিলাম ক্ষেতের দিকে একটু। তা এখানে কি করছ, বেড়াচ্ছ?"

"তাই—"

"আজকের কাগজ পড়েছ?"

"না, সময় পাইনি সুব্রত'র কাছে যাবার। যাব এবার—"

"যুদ্ধ লেগেছে।"

"যুদ্ধ !" প্রবীর যেন হোঁচট্ খেল।

"হ্যাঁ, জার্ম্মানী আর ইংলণ্ডে।"

প্রবীর স্তব্ধ হয়ে গেল।

"অনেক আগেই আগুন জ্বলত, ছাই চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল কিনা। কিন্তু কতদিন আর তা চলবে ?" বসিরুদ্দিন বলল।

"হুঁ—"

কিন্তু প্রবীর সে কথা ভাবছিল না। সে ভাবছিল এবার কি করতে হবে ? এই যুদ্ধ বহু-প্রত্যাশিত। কয়েক মাস আগেই তা বোঝা গেছে। যুগ বদ্‌লেছে। আপাতদৃষ্ট বিরোধিতার অন্তরালে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। তাই ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর এই যুদ্ধ শুধু সেই দুটো দেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। রাজ্যলিপ্সা ও আত্মরক্ষা—এর জন্য নূতন নূতন দেশে আগুন জ্বলবেই। আজকের যুদ্ধ মানেই বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু ভারতবর্ষ কি করবে ? সুভাষচন্দ্রের কথা আংশিক সত্য হল—যুদ্ধ লেগেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষার যুদ্ধ। ভারতবর্ষ সুযোগ নেবে না কি ? কিন্তু দেশে ভেদনীতি প্রবল হয়েছে। দেশপ্রীতির চেয়ে আত্মাভিমান বড় হয়েছে। নেতায় নেতায় যুদ্ধ লেগেছে, দলে দলে সংঘাত, ধর্ম্মে ধর্ম্মে ঠোকাঠুকি।

"আমাদের দায়িত্ব কিন্তু বেড়ে গেল মৌলানা সাহেব"—প্রবীর বলল।

মৌলানা মাথা নাড়ল, "বাড়লই ত'—কংগ্রেসের এবং লীগের ওয়ার্কিং কমিটি নাকি এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মত ও স্থান সম্পর্কে আলোচনা করবেন।"

প্রবীর মাথা নাড়ল, "তার চেয়েও বড় কথা আছে—আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি আর ঐক্য চাই।"

প্রান্তরের গান

"মানি ভাই মানি, চেষ্টাও করতে হবে।" মৌলানা আবেগের সঙ্গে সায় দিল।

চলতে চলতে একবার পিছন ফিরে তাকাল প্রবীর। শেষ অপরাহ্নের রক্তরাগে সমাচ্ছন্ন সুন্দরী ধরিত্রী। শান্ত, সমাহিত, যৌবনোচ্ছল। উন্মুক্ত প্রান্তর, উদার আকাশ, সবুজ শস্য। কিন্তু তার মাঝে ও কিসের ছায়া? ট্যাঙ্ক আর কামানের। মর্টার ও বিমানের। বাতাসে ভাসে কিসের শব্দ, কিসের গন্ধ? বোমা আর গুলি, আগুন আর বারুদ। লক্ষ লক্ষ সৈনিকের বুটের আওয়াজ. মৃত্যু-দীর্ণ আর্ত্ত কোলাহল। মাটী কাটবে, ধোঁয়া উড়বে, শ্বাসরোধী বিষবাষ্পের ঢেউ আকাশের দিকে উড়বে। কোথায় থাকবে এই হরিৎ শস্য-সম্ভার? শান্ত জীবনের এই ঘানি-ঘর্ঘর, উদার আকাশের নীচেকার এই স্বপ্নাচ্ছন্ন শোভা? ফুরালো—ভালবাসার দিন, গানের দিন, স্বপ্নের দিন। রঙীন স্বপ্নকে ছিন্নভিন্ন করে সুতীক্ষ্ণ সঙীনের মুখে এবার রক্ত দীপ্তি ঝলসাবে। শান্তির দিন গেল, কাজ বাড়ল। ভারতবর্ষ, তুমি এবার কি করবে?

ঝড়ের সংকেত

মধ্যাহ্ন-শেষে প্রবীর ভাবছিল।

কাহিনীর যবণিকা সরাতে দেখা যাচ্ছে যে একটি বছর কেটে গেছে। আবার ভাদ্র মাস এসেছে। সেই গতানুগতিক প্রাকৃতিক দৃশ্য। ভরা মাঠ ঘাট, কাশফুল, সতেজ ধানের চারা আর যাদুমাখানো শরতের দিন।

প্রাকৃতিক জগতের দিকে তাকালে মনে হবে হয়ত কোন পরিবর্ত্তণ হয়নি। কিন্তু পরিবর্ত্তণ হয়েছে, পৃথিবীতে ঘোর পরিবর্ত্তণ ঘটেছে, বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটেছে এই একটি বছরের মধ্যে। হিটলারের বিজয়রথের লৌহচক্র সারা ইউরোপের বুকের উপর ধূলো উড়িয়েছে, তাঁর লালসার আগুন সর্ব্বত্র দাউ দাউ করে জ্বলেছে, একটার পর একটা করে দেশের পতন ঘটেছে। সমগ্র পৃথিবী এখন স্তম্ভিত বিস্ময়ে, গভীর ভয়ে কাঁপছে।

প্রবীর প্রশ্ন করেছিল—ভারতবর্ষ এবার তুমি কি করবে? ভারতবর্ষেও আলোড়ন এসেছে। ১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি বিশেষ গুরুতর প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, ইংরেজ সরকারকে তার যথার্থ সামরিক উদ্দেশ্য প্রচার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। আদর্শের বিষয় যে মৌখিক প্রচার ইংরেজেরা করেছিল তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বাস্তব কার্য্যক্রমের নিদারুণ প্রভেদ দেখিয়ে কংগ্রেস দাবী করেছিল যে স্পষ্টভাষায় সাম্রাজ্যবাদ পরিহার করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা করা হোক্, ভারতবাসীদের তৈরী শাসনতন্ত্রকেই স্বীকার করে নেওয়া হোক। বড়লাট উত্তর দিয়েছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হবে হয়ত, আপাততঃ কিছু নয়। অর্থাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাক।

যুদ্ধের সঙ্গেই দেশরক্ষার জন্য নূতন নূতন নাগপাশ তৈরী হল। আইন। অনেকেই ধরা পড়েছে। অতি ধীরে, সকলের অলক্ষ্যে জিনিষ-

পত্রের দামের মানদণ্ডে কাঁটাটা উপরে উঠছে। ইতিমধ্যে বোম্বাইতে শ্রমিক-ধর্ম্মঘট হয়েছে তু'বার—যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির বিরুদ্ধে। বোঝা গেছে যে দেশের মধ্যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, অশান্তি ও অসন্তেষের আগুন জ্বলছে অদৃশ্যভাবে।

কিন্তু সে আগুন রূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছে না কেন? এই ত' সময়। দেশের মজুর কৃষককে সঙ্ঘবদ্ধ করে স্বাধীনতা-সংগ্রামের রাস্তায় অগ্রসর হবার এইত উপযুক্ত অবসর। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে যেন একটা স্তিমিত ভাব, বার্দ্ধক্যের মত প্রতীক্ষা আর অপেক্ষা। তারা ভাবছে সুযোগ আসুক। কিন্তু সুযোগ ত' এই মুহূর্ত্তেই।

কিন্তু ঠিক উল্টো ব্যাপার ঘটেছে। ফ্রান্সের পতনের পর কংগ্রেস নেতারা সরকারকে জানালেন যে, জাতীয় সরকার পেলে তাঁরা ব্রিটিশদের সহায়তা করবেন। কিন্তু এক কথায় কি কেউ রাজ্য ছাড়ে? বড়লাট বললেন বিনাসর্ত্তে সাহায্য করে যাও তোমরা, পরে মোয়া পাবে। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকারই নির্দ্দেশ। দেশে অসন্তোষের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেল। দেবলোক বিপন্ন হলে বিষ্ণুর দিকে তাকান। ভারতবর্ষ তাকাল মহাত্মা গান্ধীর দিকে। তিনি বললেন সময় হয়নি, আর মনে রেখো যে শত্রুর প্রতিও আমাদের একটা নৈতিক কর্ত্তব্য আছে। দাঁড়াও, ভেবে দেখি কি করা যায়। ধর্ম্মের দেশ, অধ্যাত্মবাদের দেশ, ভগবানের দেশ ভারতবর্ষ। তাই ভারতবর্ষ চুপ করেই রইল; অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু আর কতদিন? আর কতদিন? সময় ও সুযোগ কি চিরদিন থাকে? ভারতবর্ষ, আর কতদিন?

ওদিকে জিনিষপত্রের দামের অঙ্ক স্ফীতিলাভ করছে। অতি সঙ্গোপনে, অতি ধীরে।

আর বাংলা দেশ? প্রবীর ভাবে। দেশে বিভিন্ন দল, বিবাদ বিসংবাদ, সাম্প্রদায়িকতা। আবেগপ্রাণ বাঙালীর অংশে ভিন্ন চিত্তবিকার আর স্বার্থান্বেষী ও যশের কাঙ্গালদের নেতৃত্ব।

আর প্রবীরের গ্রাম? গেল আমন ফসল ভাল হয়নি। আশ্বিনের শেষে প্রচণ্ড বর্ষণ হয়েছিল, অর্দ্ধেক চারা পচে যায়। তারিণী চৌধুরী মারা গেছেন টাইফয়েডে। পাটকলের কাজ বেড়েছে, শ্রমিক বেড়েছে। শশাঙ্কবাবু সরকারী কন্‌ট্রাক্ট পেয়েছেন। প্রবীরেরও কাজ বেড়েছে। ক্রমেই গ্রামের সঙ্গে সে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ছে। মাঝে চার পাঁচবার সহরে গিয়েছিল সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে, নির্দ্দেশ পেতে।

কিন্তু প্রবীরের গ্রাম যে দেশে সেই ভারতবর্ষ এখন কি করবে? এখনো কি সময় হয়নি? পৃথিবীতে বিপ্লব ঘনিয়ে এসেছে, রাতারাতি সব ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে—ভারতবর্ষে কি তেমনি রূপান্তর ঘটবে না?

অসহিষ্ণুতায় প্রবীর ছট্‌ফট্ করে। তার চোখে জল আসে। বড় অন্ধকার আমাদের জীবন। পথ কৈ? হে জীবন দেবতা, পথ কৈ আমাদের?

কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

প্রবীর বেরোল। চার পাঁচ দিন ধরে নন্দদের বাড়ী যায় নি সে। মাধবী এর মধ্যে একদিন এসে উঁকি মেরে গেছে, কাছে আসেনি। মাধবী আজকাল কম আসে, তার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তণ পরিলক্ষিত হয়েছে। কেন? প্রবীর ভাবে। শিখার কথা মনে পড়ে। মাস দুয়েক তার খোঁজ রাখেনি, সে কি এখানে নেই? থাকলে তার ডাক নিশ্চয় আসত।

দাওয়ার উপর মাদুর বিছিয়ে বসে হরিচরণ তামাক খাচ্ছিল। তার মুখে চোখে দুশ্চিন্তার অন্ধকার।

"এসো বাবা—এসো"—সে ক্লান্তকণ্ঠে আহ্বান জানালো।

হরিচরণের কণ্ঠস্বরে এমন বিষন্নতা ছিল যে প্রবীর বিস্মিত হয়ে তাকাল তার দিকে।

অবশ্য সব সংবাদই রাখে সে। হরিচরণের অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে। সসাগরা পৃথিবীর রাজরাজেশ্বরও একদিনেই ভিক্ষুক হয়ে যায়, হরিচরণ ত' সামান্য লোক। আর একদিন নয়, এক বছর কেটে গেছে। গত ফসল ভাল হয়নি, যা হয়েছিল তাতে কায়ক্লেশে সংসার চলেছে কিন্তু সঞ্চয় কিছুই হয়নি। তারপর একটা ক্রিয়াব্যাপারে তার বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে। গত শ্রাবনে মনোরমার বিয়ে হয়ে গেছে। টাকা নগদ দিতে হয়েছে পাত্রকে তাছাড়া দান সামগ্রী আর অলঙ্কারপত্র ত' আছেই। পাত্র সাভার গ্রামের ছেলে। কিন্তু ময়মনসিংহে সে নাকি কোন সরকারী অফিসে পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরী করে। হাতছাড়া করার উপায় ছিল না, মনোরমার বেশ বয়স হয়েছিল। বয়স্কা মেয়ে ঘরে পুষে রাখা যে ভয়ঙ্কর পাপ। প্রায় সাতশর কাছাকাছি খরচ হয়ে গেছে তার। কিন্তু কোথেকে এল এ টাকা? এই সমস্ত অভাব মেটাবার জন্য লোকের অভাব নেই। মহাজন নিকুঞ্জ সা ছিল। রীতিমত দলিলের কাগজে নাম সই করে দশ বিঘা জমি বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করেছিল হরিচরণ। 'বসন্তের দাগে বিকৃতমুখ' নিকুঞ্জের খুদে খুদে চোখে শয়তানকে দেখা যায়। সেই ছোট চোখদুটো আরো ছোট করে কঠিন কণ্ঠে সে বলেছিল, 'মনে রেখো, পাঁচ মাসের বেশী আমি টাকা ফেলে রাখবনা কিন্তু। হ্যাঁ ঠিক পাঁচমাস।' তারপরেও চিন্তা আছে। মাধবী। সেও বিবাহযোগ্য। কিন্তু একজনের বিয়ে

দিতেই যার বুকের রক্ত শুকিয়ে এসেছে সে দ্বিতীয় জনের দিকে চাইবে কেমন করে? হরিচরণ ভেঙ্গে পড়েছে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

"এবার ত' ফসল খুবই ভাল হয়েছে কাকা, না?"

হরিচরণ ক্লিষ্ট হাসি হাসল, "সেত' গেলবছরও খুব ভাল হয়েছিল, কিন্তু শেষরক্ষা হল কৈ?"

প্রবীর চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

"নন্দ নেই?"

"বলতে পারছিনা, দেখনা ভিতরে গিয়ে।"

ভিতরে ঢুকতেই দেখা গেল যে দরজার আড়ালে মাধবী দাঁড়িয়ে আছে।

"মাধু"—

"বোস"—মাধবীর কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা গাম্ভীর্য্য এসেছে।

"বসছি কিন্তু নন্দলাট কই?

"লাটসাহেব হাওয়া খেতে গেছেন।"

"তাই নাকি?"

"হুঁ—কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বলত প্রবীরদা?"

"কেন কি হল?" প্রবীর বুঝতে পারেনা কিছু। মাধবীর কথাবার্ত্তার ধরণটাও বদলে গেছে। মাঝে মাঝে হকচকিয়ে দেয় সে। এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত তার মধ্যে একটা অস্থিরচিত্তা বালিকাকে খুঁজে পাওয়া যেত, আজকাল তা মোটেই না। হঠাৎ যেন সে বড় হয়ে উঠেছে।

"কি হল বলত?"

"হবে আবার কি—বাড়ীর পাশ দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে যাও তবু একবার এসে দুটো কথা বল না। মনে হয় যেন তুমি এড়িয়ে চলতে চাও।"

"ওঃ, এই"—প্রবীর হেসে ফেলল, "আমি ত' রীতিমত ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম তোমার কথার ভঙ্গীতে।"

"তুমি কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছ প্রবীরদা।" মাধবী মুখ টিপে হাসল। এই হাসিটুকুতেই পুরোনো মাধবী যেন ফিরে আসে।

প্রবীর মাধবীর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল। নারী জাতির মধ্যে বোধহয় কতগুলো সহজাত গুণ থাকে, পুরুষকে নাস্তানাবুদ করার ক্ষমতা থাকে, একটা পরিণত মন থাকে। শিখার বুদ্ধির কারণ দেখানো যেতে পারে—তার শিক্ষা, দীক্ষা, আবহাওয়া। কিন্তু মাধবী সে সব গুণ কোথা থেকে পেল? এই গ্রাম্য পারিপার্শ্বিকে? শুধু তাই নয়, পরিপক্ক ফলের মত মাধবীর চেহারায় যে শ্রী ও মহিমা ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে তার এই সহজাত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা মিশে শিখাকেও নিস্প্রভ করে দেয়। চটুলতা নেই মাধবীর, নেই শিখার মত কৃত্রিমতা। মাধবী অপরূপ। ওকে দেখলে আজকাল মোহ আসে, আরো দেখতে ইচ্ছে করে, সাধ মেটে না।

গলার স্বরটা নামিয়ে হঠাৎ প্রবীর প্রশ্ন করল, "আমার দুটো কথার উপর তোমার এত লোভ কেন মাধু?"

মাধবী তার ডাগর ডাগর চোখ তুলল, তার মনের ভাবান্তর কিন্তু মুখের উপর কোনো ছায়া ফেলল না। একবার প্রবীরের দুচোখের উপর দৃষ্টি বুলিয়েই সে মুখটা ফিরিয়ে নিল, তারপরে মৃদুকণ্ঠে বলল, "ভালো লাগে।"

মাত্র দুটি কথা। কিন্তু কি ভয়ানক দু'টি কথা! প্রবীর স্তব্ধ হয়ে গেল। তার দুটো হৃদপিণ্ডে যেন একটা বিরাট সংঘর্ষ ঘটে গেল। সেই সংঘর্ষের ফলে সমস্ত চেতনা যেন বারংবার শিহরিত হয়ে উঠল তার।

দ্বারপ্রান্তে কাজললতা এসে দাঁড়াল। ঘোমটা টেনে।

প্রবীর বাঁচল। অতলস্পর্শী একটা অন্ধকার গহ্বরে পড়ে যেতে যেতে মাঝপথে সে যেন একটা আঁকড়ে ধরার মত অবলম্বন পেল।

কলরব করে ডাকল সে, "এই যে লজ্জাবতী বৌঠান, আসুন ভাই, আসুন।"

ঘোম্‌টার আড়ালে কাজললতা হাসল।

"এ কিন্তু ভারী অন্যায় বৌঠান্—"

"কি?" কাজললতা প্রশ্ন করল।

"কত কষ্ট করে, পুলিস আর জেলের ভয়কে অগ্রাহ্য করেও আপনাকে গিয়ে উদ্ধার করে আনলাম, আনাড়ি হাতে ফোস্কা পড়ল দাঁড় বাইতে গিয়ে—এত করলাম, তবু আমার সামনে ঘোম্‌টা?"

মাধবী হাসল।

কাজললতা ঘোমটা সরাল একটু, বলল, "লজ্জা করে ভাই।"

"ভাইকে দেখে লজ্জা, যার সামনে লজ্জা হওয়ার কথা সেখানে ত' অন্য ব্যাপার—

কাজললতা মুখ টিপে হাসল, "সে যে ইয়ে ভাই।"

প্রবীর হো হো করে হেসে উঠল, মাধবী মুখে আঁচল চাপা দিল।

হাসি থামিয়ে প্রবীর হঠাৎ বলল, "একটু চা খাওয়াবে বৌঠান্?

"এই যাচ্ছি ভাই—এখুনি।" কাজললতা এই ফরমায়েসে খুশী হয়ে উঠল।

মাধবী বাধা দিল, "না, আমি যাই বৌদি—"

"উঁহু—তুই বোস্, আমি যাই।" কাজললতা ছুটে চলে গেল।

স্তব্ধতা।

হঠাৎ যেন কথা ফুরিয়ে গেছে।

হরিচরণের হুঁকোর শব্দ শোনা যায়। জলোত্থিত গুড়ুক্ গুড়ুক্ শব্দ।

স্তব্ধতা।

দুজনেই চেষ্টা করছে কিন্তু ঠিক বলবার মত কথা যেন পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ লজ্জা বোধ করছে দুজনে। অকারণ।

তবু প্রবীর মাধবীর দিকে তাকায়। সিঁদুরের আভা মাধবীর মুখে আর তার নীচের ঠোঁটটা মাঝে মাঝে কাঁপছে। প্রসারিত করতলের উপর নজর রেখে সে কি যেন ভাবছে।

মাধবী মুখ তুলল, প্রবীর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

মাধবী দেখল যে প্রবীর এদিক ওদিক অকারণে তাকাচ্ছে, বারংবার ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করছে আর খুলছে, মাঝে মাঝে ললাটদেশে তার চমৎকার রেখা ফুটে উঠছে।

স্তব্ধতা।

"প্রবীর দা—"

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে প্রবীরের।

"প্রবীর দা—"

"কি ?"

স্তব্ধতা।

চা এল। কাজললতা আবার বাঁচাল প্রবীরকে।

চা নিঃশেষিত হল।

"ঠিক হয়েছে ত ?" কাজললতা সহাস্যে প্রশ্ন করল।

"চমৎকার।"

"ঠাট্টা হচ্ছে ?

"সত্যি না ভাই।

"বৌমা"—রাসমনির ডাক শোনা গেল, "একটু তেল নিয়ে এসোত।"

"যাই মা—"

কাজললতা চলে গেল।

প্রবীর উঠে দাঁড়াল।

"আজ যাই মাধু।"

"আবার এসো।"

প্রবীর তার দিকে তাকাল না।

"বুঝলে আবার এসো—রোজ।"

"রোজ?"

"হ্যাঁ"—কঠিন কণ্ঠে মাধবী যেন আদেশ করছে।

"আচ্ছা।"

দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল প্রবীর।

দীর্ঘনিঃশ্বাস। মাধবীর মর্ম্মস্তল মথিত করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। প্রবীর কি তা শুনতে পেল?

না, প্রবীর তা শোনে নি। রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে আসে প্রবীরের। এতক্ষণ যেন জ্বরগ্রস্ত হয়ে ছিল, যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল সে। কি হয়েছে তার, কি হয়েছে? হঠাৎ আবিষ্কার করল সে। মাধবীকে তারও 'ভাল লাগে'। কিন্তু এত সহজেই কি সে আত্মহারা হয়ে যাবে? ব্রতচ্যুতির পাপে পাপী হবে? অতি সাধারণের মত জীবনটাকে স্ত্রীপুত্রের মাঝে বিলিয়ে দেবে? সব কাজ কি তার ফুরিয়ে গেছে? ভারতবর্ষ কি তার জীবনকে দাবী করতে পারে না? অগণন নরনারীর বঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস কি মর্য্যাদার যোগ্য নয়? মনে প্রাণে সর্ব্বক্ষণ, সারা জীবন, তাদেরই মুক্তির জন্য সে কি নিজের জীবনকে কিছুতেই বিলিয়ে দিতে পারে না? এতই দুর্ব্বল প্রবীর চৌধুরী?

মাধবী রোজ যেতে বলল। রোজ সে প্রবীরের কথা শুনতে চায়। রোজ রোজ তার 'ভাল লাগে'।

না, সে আর যাবে না।

কিন্তু ভাবতে কষ্টবোধ হয়, বুকের ভিতর কোথায় যেন খচ্ খচ করে। মাধবীকে যে তারও 'ভাল লাগে'।

নন্দ আজকাল একটু সৌখীন হয়ে পড়েছে। মুগ্ধ কাজললতাকে আরো মুগ্ধ করবে সে। পরিপাটি করে সাজগোজ করে, ভাল করে চুল আঁচড়ায়, মাঝে মাঝে সস্তা এসেন্সও সে জামায় লাগায়। আর কাজললতাকে ব্যতিব্যস্ত কোরে তোলে আদরের চোটে। কাজললতা অস্থির হয়ে ওঠে আদরের মাত্রাধিক্যে। মনে হয় যে ওরা সুখী হয়েছে।

কিন্তু তবু স্বস্তি নেই। এত সুখেও আনন্দ নেই। যখন তখন এটা ওটা কাজললতাকে দিতে পারেনা নন্দ। সেই আক্ষেপ। না দিতে পেরে ছট্‌ফট্ করে নন্দ। বাপের অবস্থা, সংসারের অবস্থা সে জানে, বোঝে। তবু সে প্রায়ই এটা ওটা কিনবার জন্য পয়সা চায়, টাকা চায়। কাজললতা তিরস্কার করে, ক্ষেপে যায়। নন্দ শোনে না। দিন দিন নন্দর মাথা বিগড়ে যাচ্ছে।

এবার একটা আংটি কেনার সখ চেপেছে তার। মনোরমার বিয়ের সময় কাজললতার গয়নায় টান পড়েছিল। তাছাড়া তার আংটি নেই,

তাকে একটা না দিলে নন্দ আর শান্তি পাবে না। আনা চারেক সোনা হলেই চল্‌বে।

নন্দ বাড়ী ফিরল।

হরিচরণকে ঘাটাতে ভরসা হল না তার। মায়ের কাছে গেল সে।

“মা”—

“উঁ”—

“বলব ?”

“বল্‌ না—কি ?”

“পনেরোটা টাকা দেবে ?”

রাসমণি অবাক হয়ে গেল, মুখে তার রা সরেনা।

“তুই কি পাগল হলি নন্দ ? টাকার চিন্তায় তোর বাবার অবস্থা কি হয়েছে দেখছিস্‌ না ? বন্ধকী জমি উদ্ধার করার চিন্তায় যে তার ঘুম হয় না।”

“বড় দরকার কিন্তু”—

“আমার মাথাটা চিবিয়ে খা তবে।”

রাগ করে নন্দ ঘরে এল। বোঝে সব, তবু রাগ হয়।

কাজললতা পিছু পিছু এল।

“কি জন্য টাকা চাইছিলে বলত ?”

“ছিল দরকার।”

“কি দরকার তাই শুনি।”

“আংটি করাতাম।”

“কেন ?”

“তোমার জন্য।” নন্দ হাসল, কাজলতার একটা হাত টেনে নিল।

ঝট্‌কা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল কাজললতা, চোখদুটোতে ক্রোধ ঘনিয়ে এল আকস্মিক কালো মেঘের মত।

"কি হল?"

"কি হল! তোমার লজ্জা লাগে না?"

"কেন"

আমার অপমান করতে?"

"অপমান! কেন?"

"সংসারের এই অভাব অনটনের মধ্যে আমার তুমি আংটি গড়িয়ে দিতে চাও, তার জন্য মার কাছে টাকা চাও!"

"দিলামই না হয় একটা।"

"আমি চাই না, ফের যদি অমন কর তবে আমি গলায় দড়ি দেব।"

নন্দ এবার ক্ষেপে গেল।

"বিয়ের আগে ত' গোবেচারী ছিলে, এখন যে বড় ঝাঁঝালো কথা বলতে শিখেছ বড়।"

"তোমার জন্যই।"

"আমার জন্য! তুমি ত' ভারী বেয়াদব হয়ে গিয়েছ! হঠাৎ একদিন থাপ্পড় খাবে আমার কাছে।"

কাজললতা কেঁদে ফেলল। তার ভ্রমর-কৃষ্ণ চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা নামল।

নন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাধবী ছুটে এল।

অবশ্য রাত্রে আবার সন্ধি হল। মান অভিমানের পর, ক্ষমা প্রার্থনা। তারপরে হাসি। তারপরে সোহাগের কথা, আলিঙ্গন, চুম্বন আর আশ্লেষক্ষিপ্ত সুখশ্বাস। ঘুম আর স্বপ্ন।

কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে নন্দর ঘুম ভেঙ্গে গেল, চকিতে সে উপলব্ধি

করল যে সুখী হয়েও তার স্বস্তি নেই কেন। বিয়ের আগে কাজললতার সান্নিধ্যে যে মাদকতায় তার দেহমন কাঁপত আজকাল আর তা যেন হয়না। কাজললতা যেন পুরোনো হয়ে আসছে।

সকাল বেলায় উঠেও নন্দ ভাবতে থাকে। সত্যি কি তাই? সব কিছু বিস্বাদ বিবর্ণ মনে হয়। কিছুই ভালো লাগে না। হঠাৎ তার মনে হয় যে একটা কাজটাজ পেলে বোধ হয় বেশ হত। চাষবাস নয়, যাত্রা থিয়েটার নয়, যে কাজে করকরে টাকা হাতের মুঠোয় আসে সেই কাজ।

পাটকলের বাঁশীর আওয়াজটা বাতাসে কাঁপতেই সে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল ঘণ্টা তিনেক পর।

কাজললতা প্রশ্ন করল, "কোথায় গিয়েছিলে?"

"পাটকলে।"

"কেন?"

"চাকরী নিলাম—পঁচিশ টাকা মাইনে—কাল থেকে যেতে হবে।"

কাজললতা থমকে দাঁড়াল। খুশী হবার মত কথা বটে—কিন্তু জমি? শ্বশুর একা কি পারবে?

"বাবাকে সাহায্য করবে কে?"

"কি এমন কাজ, বাবা একাই চালাতে পারবে।"

খুশী হয়েও খুশী হয় না কাজললতা।

হরিচরণ, রাসমণি, মাধবী, সবাই শোনে এ খবর।

হরিচরণ একবার মৃদু কণ্ঠে বলল, "আমি একা পড়লাম যে—"

নন্দ বলল “কিন্তু সংসারে টানাটানিও ত' যাচ্ছে এখন। তাছাড়া ছিদেম বা গোপালকে বললেই কেউ না কেউ তোমায় সাহায্য করবে।”

অগত্যা তাই।

নন্দ বদলে যাচ্ছে। হরিচরণ, রাসমণি, কাজললতা, মাধবী, সবাই কথাটা বুঝতে পারছে।

আড়ালে গিয়ে কাজললতা খানিকটা কাঁদল। সঠিক কারণ নেইত তবু কাঁদবার মত ওই কারণই যথেষ্ট। নন্দ বদলে যাচ্ছে, কিন্তু কেন, কেন?

জোতদার হরিভূষণ গাঙ্গুলীর বহির্কক্ষে উদ্দাম ও উত্তেজিত আলোচনা চলছিল। যুদ্ধ সম্পর্কে। সব মানুষই যে একই পৃথিবীতে থাকে তা আজকাল যত বোঝা যায় আগে তা যেত না। বিজ্ঞান আজ বিচ্ছিন্ন দেশ ও মহাদেশকে এক করে দিয়েছে। তাই আজ ইউরোপের তাণ্ডব কলাতিয়ার মত নগণ্য গ্রামের লোকদের মনেও আলোড়ন তোলে। ইয়োরোপের জনসমুদ্রের ঢেউ আজ তাদের দোলা দেয়। তারা হয়ত ভিন্নভাবে তার অর্থ গ্রহণ করে, অতীতের মরা সংস্কার নিয়ে তারা হয়ত বর্ত্তমানের ব্যাখ্যা করে, দুর্ব্বল আক্রোশে তারা হয়ত অর্থহীন আলোচনা করে, তবু সবাই যে একই পৃথিবীর এপিঠে আর ওপিঠে বাস করছে তা আর আজকালকার মত কোনদিন ভালভাবে

প্রকট হয়নি। হানাহানি, রেষারেষি, হিংসা ও রক্তপাতের আড়ালেও এক দেশ, এক মহাদেশ ও এক মানুষ আর এক দেশ, আর এক মহাদেশ ও আর এক মানুষের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে।

অঘোর পণ্ডিতও এসেছেন, মৃদুমন্দ হেসে তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধের শাস্ত্রোক্ত স্বরূপ বিশ্লেষণ করছিলেন। ফরাসের উপর গোল হয়ে বসে পণ্ডিতের সেই সব কথা সবাই উপভোগ করছিল।

অঘোর পণ্ডিত বলছিলেন, "কলির সন্ধ্যা। তারই পূর্ব্বাভাস এই যুদ্ধ—ভেবেছ বুঝি যে এ যুদ্ধ ম্লেচ্ছদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে? তা নয়, এ দাবানল, এর বিস্তৃতি ঘটবে সারা পৃথিবীতে—আমাদের দেশেও আগুন জ্বলবে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলবে"—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করলেন, মানসনেত্রে যেন সেই আগামী অগ্নিকাণ্ডের লেলিহান দীপ্তিকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

বুড়ো মোক্তার দীনেশ রায় সায় দিল, পানের ডিবা থেকে একটা পান মুখে ফেলে, ডান গালটা ঢিবির মত করে তুলে খন্‌খনে গলায় বলল, "ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশাই, কাগজেও দেখছিলাম এম্‌নি কথা।"

অঘোর পণ্ডিত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, একটা শাণিত আত্মতৃপ্তি তার মুখের কোনে পরিস্ফুট হল।

শ্রোতারাও উৎসাহিত হল। সিদ্ধ তান্ত্রিক অঘোরনাথের দিব্যদৃষ্টি আছে।

তারক বাড়ুয্যে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "হিট্‌লারকে নাকি অনেকেই অবতার বলেছে অঘোরদা!"

হরিভূষণ একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসল, "তোমার আবার সবতাতেই বাড়াবাড়ি তারকদা। অবতার কখনো ওদের দেশে হবে, পূণ্যভূমি ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো দেশে অবতারের আবির্ভাব হয় নাকি?"

তারক বাড়ুয্যে চিরদিনই অপরাজেয়, সবেগে মাথা নেড়ে সে চক্ষু-তারকা বিঘূর্ণিত করে বলল "বাড়াবাড়ি কেন? হিট্‌লারের সব খবরই কি মানুষ জানে নাকি? পরে হয়ত জানা যাবে যে তিনি এই দেশেই জন্মেছেন।"

অঘোর পণ্ডিত মৃদুমন্দ হাসছিলেন, তিনি এবার মুখ খুললেন, দুজনের তর্কের মীমাংসা করতে এগোলেন তিনি, বললেন, "ঠিকই তাই। অবতারের বিষয়ে কি প্রথমেই সব কথা জানা যায়? আশ্চর্য্য কিছু নয়, এ প্রলয়কাল, তাঁর আবির্ভাবের দিন এগিয়ে এসেছে, হয়ত হিট্‌লারই তাঁর শেষ অবতার। নইলে এত শক্তি কোথা থেকে পেল সে? পাশ্চাত্য দেশ অনাচার আর ব্যাভিচারের পুঞ্জীভূত গ্লানিতে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, সেখানে মায়ের লীলা হবে অন্য প্রকার। দুষ্কৃতের দমনই ত' অবতার করেন। হিট্‌লারের হিংসার পেছনে হয়ত সেই তথ্যই লুক্কায়িত আছে যে তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে আমার দিগ্‌বসনা মায়ের করাল মূর্ত্তির পিছনে"—

হঠাৎ বাধা পড়ল। অঘোর পণ্ডিতের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা ও শ্রোতৃ-মণ্ডলীর বিমুগ্ধ নীরবতাকে ভঙ্গ করে ঢোলের আওয়াজ ভেসে এল।

মদন চৌকিদারের হাঁক শোনা গেল "আজ বিকেল চারটায় থানার সাম্‌নেকার মাঠে সভা বসবে—সহর থেকে মাননীয় এস্, ডি, ও সাহেব এসেছেন। যুদ্ধ সম্পর্কে জরুরী কথা হবে, সবাইকে যেতে হবে। জমিদারবাবু আর দারোগাবাবুর হু-কু-ম—"

ড্যাং ড্যাং ড্যাং—ঢোলটা বেজে উঠল।

চৌকীদারের হাঁক ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল।

"হুকুম! যত্ত সব"—কৃষ্ণদাস বসু মুখ বিকৃত করলেন, "জমিদার ত'

আছেনই, তাকেও ছাপিয়ে আবার দারোগা। এক নূতন জমিদার এসেছে”—

হরিভূষণ মাথা নাড়ল, “প্রিয়তোষবাবু লোক খুব ভাল ছিল ভাই, এ লোকটা একেবারে—”

“মুসলমান যে”—নিমাই বাড়ুয্যে ঘৃণার সুরে বলল। আজকাল সে মাঝে মাঝে হিন্দুধর্ম্মের পাণ্ডা মনোহর মুখুয্যের ওখানে যাতয়াত করে।

“সবাইকে যেতে হবে, ‘জরুরী কথা’। শুনে হাতী, ঘোড়া গজাবে, হিট্‌লার অম্‌নি হেরে যাবে—হুঃ—যত্ত সব”—হরিভূষণ চারদিকে তাকায়, এমন সব স্বদেশী কথার কি ফল হল তাই দেখবার জন্য।

“ওদের দিন ঘনিয়ে এসেছে”—তারক বাড়ুয্যে একটা ভবিষ্যদ্বাণী বলার গৌরব অর্জ্জন করতে চাইল।

কিন্তু এত বলা সত্ত্বেও ওরা সবাই যাবে এস্, ডি, ও সাহেবের বক্তৃতা শুন্‌তে। মাঠের মধ্যে উঁচু হয়ে বসে অর্থহীন কথাগুলোকে বুঝবার চেষ্টা না করেও হাততালি দেবে। তারপরে বক্তৃতা-শেষে সাহেব আর দারোগাকে বলবে—‘চমৎকার বলেছেন হুজুর। ঠিকই ত’, আমরা জিতবই, ধর্ম্মের জয় হবেই।’

আসলে ওরা ভীরু। ওদের ভয়কে দূর করতে হবে। ওরা অজ্ঞান, ওদের জ্ঞান দিতে হবে।

পাটকলের বাঁশী বাজল। কূ—উ—উ—উ: তীব্র, তীক্ষ্ণ শব্দ আর কলের শেষ কালো নিঃশ্বাসে ছুটীর ঘোষণা! দলে দলে লোক বেরিয়ে এল। খানিকটা জীবনীশক্তিকে পিছনে ফেলে। বাইরের

খোলা হাওয়ায় ক্রম-ক্ষীয়মান বুকটাকে ভরে তুলে দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়ায় সবাই। যেন একটা নূতন পৃথিবীতে ওরা এসে পড়েছে।

নন্দও ফিরছিল। মাসখানেক ধরেই সে কাজ করছে। প্রথম প্রথম ভারী বিশ্রী লাগছিল। সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত পারিপার্শিকে সে অস্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু ক্রমেই সে অনুভূতিটা ভোঁতা হয়ে আসছে, এখন অনেক মানুষের সঙ্গেই হৃদ্যতা হয়েছে তার। গ্রামের ওস্তাদ কবি, ভালো এ্যাক্ট করে বলে সবাই খাতির করে। স্তুতি ও প্রশংসার বর্ষণে নন্দ ফুলে ওঠে।

বস্তির শেষ প্রান্ত অতিক্রম করার সময় সে ললিতার গান শুনতে পেল। সে থম্‌কে দাঁড়াল। ললিতা আগেই ফিরে এসেছে কল থেকে। এ কয়দিন সে সেখানে ললিতাকে দেখেছে, ললিতা তার সঙ্গে কথা বলেনি, দূরে দূরেই থেকেছে। কিন্তু যখনি মাঝে মাঝে ললিতার দিকে তাকিয়েছে সে তখনি একটা ক্ষুরধার বক্র হাসি সে লক্ষ্য করেছে। আগে যে ঘৃণার ভাবটা ললিতার প্রতি ছিল নিজের অজ্ঞাতসারেই তা অনেক দুর্ব্বল হয়ে এসেছে, আজকাল ললিতা তার দৃষ্টিকে বারংবার আকৃষ্ট করে। একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য আছে ললিতার মধ্যে যেন আগুনের জ্বালা।

আসলে সে দাঁড়াল অন্য কারণে। সে ললিতার গানের পদ। নন্দ কবি, নন্দ গায়ক। নূতন কথা, নূতন ভাব, নূতন সুর তাকে চুম্বকের মত দুর্নিবার প্রচণ্ডতায় আকর্ষণ করে, তাকে উন্মাদ করে তোলে। ললিতার এই গানের মধ্যে সেই সব নূতনত্ব গুলোই ছিল। ললিতার কণ্ঠস্বর যে খুব পরিষ্কার, খুব-কাজ করা তা নয়, কিন্তু তা না হলেও তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা দরদ আর যাদু আছে যে পা সরানো যায় না। নন্দ শুনেছিল যে ললিতা ভাল গায়। কিন্তু এমন? এত ভাল?

ললিতা গাইছিল—"পিরীতির রীতি বোঝা দায়।
কাষ্ঠে লোহায় পিরীতি কইরা
জলে ভাসে দুজনায়,
হায়রে হায়,
পিরীতির রীতি বোঝা দায়

নন্দ গানটাকে মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগল। সুন্দর কথাগুলো, অব্যর্থ শরের মত ঠিক অন্তরের মধ্যস্থলে গিয়ে বিদ্ধ হয়। সুন্দর। সুরটাকে মনে মনে নকল করার চেষ্টা করে সে।

সুরটা কাছে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ হাসি শোনা গেল। গান থেমেছে।

জানালার পিছনে ললিতার মুখ, একরাশি এলোচুলের পটভূমিকায়।

নন্দ লজ্জা পেল, মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল তার। বড় বড় পা ফেলে সে চলতে আরম্ভ করল।

ললিতা গাইল—এবার কীর্ত্তন—

"আমার বধূয়া আন্ বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া—"

নন্দর ইচ্ছে করে একবার ফিরে তাকাতে। ললিতার বিদ্রূপ সে বুঝতে পারছে কিন্তু তবু ললিতার কণ্ঠস্বরের ইন্দ্রজাল তাকে মুখ ফেরাতে বলে, থামতে বলে, শুনতে বলে।

কিন্তু না, ছিঃ। কাজললতার ছবিটা সে কল্পনা করতে চেষ্টা করে; কিন্তু ছবিটা ঠিক ফুটেও যেন মানসপটে ফুটে উঠছে না।

ওদিকে ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে। জাতীয় নেতাদের প্রতি সরকারের উপেক্ষা দেশের অসন্তোষকে আরো তীব্র করে তুলেছে। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদ বিপদে পড়েছে। ইয়োরোপের রণাঙ্গণে হিট্‌লারের বিজয়-অভিযান ইংলণ্ডকে পিষে মারবার সব বন্দোবস্তই করে ফেলেছে। ইংলণ্ডের প্রধান সহর ফ্রান্সের শোচনীয় পতন হয়েছে, ইংলণ্ড একা, সন্ত্রস্ত, সশঙ্কিত। এই ত সুযোগ, দেশের জনসাধারণ উস্‌খুস্ করছে, কিছু না করতে পেরে ছট্‌ফট্ করছে।

সেই আলোচনাই হচ্ছিল সুব্রত'র বাড়ীতে।

প্রবীরের মুখে গভীর বিরক্তির ছাপ, "কিছুতেই কি আমাদের চোখ খুলবে না? সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন চালাবার এখনো কি সময় হয়নি?"

সুব্রত মাথা নাড়ল, "হয়ত ঠিক উপযুক্ত সময় হয়নি। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি যাঁদের আছে—আমাদের নেতারা—তাঁরা ত' বলছেন যে এটা সে ধরণের আন্দোলন করার সময় নয়।"

প্রবীর উত্তেজিত হয়ে উঠল, "আমার আজকাল দেওয়ালে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে সুব্রত—"

"ধৈর্য্য হারাস্ না, ঝোপ্ বুঝে কোপ্ না দিলে ফল হয় না। সব কাজেরই যথোপযুক্ত সময় ও সুযোগের দরকার হয়।"

প্রবীর তিক্ত হাসি হাসল, "সময় হবে কখন? সময় যখন হয় তখনি ত' গান্ধীজি রাশ টেনে ধরেন। তিনি আমাদের ধ্বংস থেকে বাঁচান বটে, কিন্তু কে চায় এমনভাবে বাঁচতে? এর চেয়ে মরা ভাল—"

"তুই ভারী উত্তেজিত হয়েছিস্ প্রবীর।"

"তা হয়েছি। উত্তেজিত হবার কারণের কি অভাব আছে? যে

কংগ্রেসের পিছনে দেশের শক্তি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল তাতে ভাঙণ ধরেছে। সুভাষচন্দ্র বিতাড়িত, অভিমানে তিনি স্বতন্ত্র দল সৃষ্টি করছেন; মানবেন্দ্র রায় বাইরে রয়েছেন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন করছেন। শক্তি কোথায়? আমাদের পতনের পুরোনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘট্‌ছে। আর কিছুদিন দেরী করলে হয়ত পারিপার্শ্বিক বদ্‌লে যাবে, আন্দোলনের পথ হয়ত তখন বন্ধ হয়ে যাবে।"

সুব্রত প্রবীরের দিকে তাকাল, "কিন্তু আন্দোলন ত' আরম্ভ হয়েছে, কাগজ পড়িস্‌নি আজ?"

তাচ্ছিল্য ধ্বনিত হল প্রবীরের কণ্ঠস্বরে, "পড়েছি—ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের কথা বল্‌ছিস্?"

"হ্যাঁ।"

"সেই বৈষ্ণবী যুদ্ধ। বাছাই করা সত্যাগ্রহীরা একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে যুদ্ধ-বিরোধী কয়েকটি কথা বলবে।"

প্রবীর থেমে অবজ্ঞাভরে হাসল, তারপরে আবার বলল, "শুধুই কি তাই? ভারতবর্ষ লাথি খেয়েও আশীর্ব্বাদ করে, কলসীর কানার ঘা খেয়েও প্রেম বিতরণ করে। খুব ভাল কথা সেগুলো, হৃদয় ছাড়া মানুষকে যথার্থ জয় করা যায় না তা মানি। কিন্তু যাদের হৃদয় নেই তারা হৃদয়ের মর্ম্ম কি বুঝবে?

"ওদের হৃদয়কে সৃষ্টি করতে হবে, গড়তে হবে।"

"কালোকে সাদা করবি তুই, বাঘকে ভেড়া? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বিসর্জ্জন দিস্ না সুব্রত—বিজ্ঞান মানুষকে এগিয়ে নিয়েই যাচ্ছে, তাকে পিছিয়ে দিচ্ছে না। তাছাড়া হৃদয়কে হয়ত বদলান যেত যদি সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের নেতৃত্ব একজন দ্বিতীয় গান্ধীর হাতে

থাকত। কিন্তু সে হবে না কোনো দিন, ইয়োরোপের মাটীতে গান্ধীর মত লোক জন্মাবে না। সুতরাং যা হতে পারে তাই ভাবা উচিত।"

"অহিংসা আর ক্ষমার সাহায্যেও আমরা বিজয়ী হব প্রবীর। হিংসা আর অত্যাচারের মধ্যে একটা আত্মদাহী আগুন আছে, তাতেই শেষ পর্য্যন্ত ওরা পুড়ে মরবে।"

"সব মানি কিন্তু সেভাবে এগোতে গেলে যে লক্ষ বছর লাগবে।"

সুব্রত চুপ করে রইল। উত্তর দিল না, কেবল গম্ভীর হয়ে উঠল সে।

প্রবীর বলতে লাগল, "ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের আরো বৈষ্ণবী ব্যাপার আছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের এ বিষয়ে আগেই খবর দেওয়া হবে; তাদের আর কষ্ট করে সত্যাগ্রহীদের খুঁজে বেড়াতে হবে না, নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে তারা গ্রেপ্তার করতে পারবে। হায় অদৃষ্ট! এমনি ঔদার্য্য আর অহিংসা দিয়েই যদি দেশের স্বাধীনতা আসত তবে আমরা কোনদিনই পরাধীন হতাম না।"

সুব্রত চুপ করেই রইল।

"গান্ধীজি আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা, কোটী কোটী ভারতবাসী তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে সূর্য্যমুখী ফুলের মত। নিরস্ত্রের হাতে চমৎকার অস্ত্র দিয়েছেন তিনি, নিরাশার অন্ধকারে তিনিই জ্বালিয়েছেন আশার মশাল। এই ত' সুযোগ। দেশের কৃষক ও মজুরদের সংঘবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করার এই ত' মাহেন্দ্রক্ষণ। কিন্তু তা হবে না হয়ত—"

আবেগে প্রবীরের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

সুব্রত এবার কথা বলল, মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে সে বলল, "প্রবীর, মত আর পথের দ্বন্দ্বটা এখন থাকবেই, ও বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি

তোমার পথে চলছ, আমি আমার পথে। সময়ে সব পথ এক হয়ে যাবে। যতদিন তা না হয় ততদিন আমাদের নিরাশ হবার কারণ নেই। আমাদের বিভিন্ন পথের লক্ষ্য একই। পরস্পরের বিচার না করে যতটুকু আমরা মিলিত হয়ে কাজ করতে পারি সেই চেষ্টাই করতে হবে। আমি গান্ধীবাদে বিশ্বাস করি। আমি তাঁর প্রত্যেকটি কাজের সমর্থন করবই। প্রবীর, আমরা প্রত্যেকেই সৈনিক। সৈনিকের সেনাপতি হওয়া উচিত নয়, তাতে যুদ্ধ জয় হয় না। সৈনিকের চাই অন্ধ আনুগত্য, আদেশের জন্য প্রতীক্ষা, নির্ব্বিচারে তা পালন করা। আমিও তাই করব, আমি বিচার করব না, সন্দেহ করব না, নিঃসঙ্কোচে আদেশ পালন করে যাব। এর বেশী আর কিছু বলতে চাই না আমি। ভুল বুঝিস্ না আমায়, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার মত অনেক কাজ, সেখানে আমি তোর সঙ্গে এক।”

প্রবীর বিষাদক্লিষ্ট হাসি হাসল। অগত্যা তাই। ঝগড়া করে লাভ নেই, বরং যতটা একসঙ্গে কাজ করা যায় তাই লাভ। বিবাদ করে লাভ কারুরই নেই। অথচ লোকসান অনেক। একজন দুজনের লোকসান নয়, চল্লিশ কোটী লোকের লোকসান। তাকি করা উচিত? না, না।

প্রবীর কতকগুলো ইস্তাহার গুছিয়ে নিচ্ছিল। গ্রামের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে, চার মাইল দূরবর্ত্তী পলাশপুর যেতে হবে।

আশ্বিনের শেষ। সোনামাখানো ভোরের আলো জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। জানালার ধারের কাঁঠাল গাছের পরিপুষ্ট

তরুণ পাতাগুলোর উপর রাতের শিশির চিক্‌মিক্ করছে, ফিঙে পাখী আর শালিকের কিচিরমিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মন্দ বাতাসে শিশিরার্দ্র ধরিত্রীর ক্ষীণ দেহ-সৌরভ।

সিদ্ধেশ্বরী চা নিয়ে এল।

"এখুনি বেরুবি নাকি ?"

"হ্যাঁ পিসীমা—"

"একবার মুকুন্দ দাসের কাছে যাস্, জমিজমার ব্যাপারটা জানিস।"

"আচ্ছা।"

সিদ্ধেশ্বরী জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল, কাকে যেন দেখতে পেল সে, বলল, "কে আসছে দেখ্‌ত প্রবীর, আগে ত' কোনোদিন দেখিনি ওকে।"

প্রবীর উঠে বাইরের দিকে তাকাল। আশ্চর্য্য হল সে। শিখা আসছে। একা, আর তারি বাড়ীর দিকে।

"কে রে ?"

"জমিদারের মেয়ে।"

"তাই নাকি ? এখানেই থাকে নাকি ?"

"সংসারের বাইরে খোঁজ রাখ না, তাই জান না। ও ত প্রায় বছরখানেক ধরে এখানেই আছে।"

"ওমা, একদিনও দেখিনি ত। তা এ যে রীতিমত মেম্‌সাহেব—"

"বি, এ, পাশ মেয়ে।"

"এ্যাঁ!"

"হ্যাঁ।"

"এক বছর ধরে এখানে রয়েছে! গাঁয়ে থাকতে ওর কি খুব ভালো লাগে ?"

প্রবীর উত্তর দিল না। হয়ত শিখার ভালো লাগে না। বাপ এবং জমিদারীর জন্য মাঝে মাঝে এসে থাকত আগে, কিন্তু একাদিক্রমে সে কি করে এতদিন ধরে এই গ্রামে রয়েছে তার কারণ এখন আর অজানা নেই প্রবীরের। কিন্তু সে কথা ত' সিদ্ধেশ্বরীকে বলা যায় না।

বাইরে স্যাণ্ডালের আওয়াজ হলো।

"আমি ভিতরে যাই বাবা, হাঁড়ী চাপানো রয়েছে—"

সিদ্ধেশ্বরী পালাল। আসলে শিখার মত মেয়ের সামনে অস্বস্তিবোধ করবে বলেই একটা অজুহাতে সে পালাল। প্রবীর হাসল।

বাইরে গেল সে।

"নমস্কার"—সে নমস্কার জানাল।

শিখা প্রতিনমস্কার জানিয়ে হাসল, "আসতে পারি কি? একেবারে অনাহুত, অপ্রত্যাশিত। আপনি হয়ত অবাক হয়ে গেছেন, না?

"আসুন, আসুন"।

ঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়াল দুজনে।

চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে এল প্রবীর, "বসুন। অবাক হওয়ার কথা বলছেন? হয়েছি বৈকি—রাজা প্রজার ঘরে এলে প্রজার ত অবাক হবারই কথা।"

"রাজারা বদ্‌লাচ্ছে, রাজাদের দিন গেছে, এ ত' আপনারা বলে থাকেন; তবে অবাক হচ্ছেন কেন?"

"দিন গেলেও রাজার আভিজাত্য-বোধ যায় নি; বরং বেড়েছে যে।"

চায়ের কাপের দিকে শিখার নজর পড়ল, "আপনার চা পানের বাধা দিলাম বোধ হয়। তুলে নিন্ ওটা—ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।" কথাটা চাপা দিচ্ছে শিখা।

"লজ্জা করবেন না, চা আনব ?"

"ধন্যবাদ। আমার সত্যি দরকার নেই।" স্নিগ্ধ হাসি দেখা গেল শিখার মুখে। প্রবীর চায়ের কাপ টা তুলে নিতে নিতে তার হাসির সেই স্নিগ্ধতা লক্ষ্য করল। আরো লক্ষ্য করল যে শিখার পোষাক ও বেশভূষা আজ সম্পূর্ণ সরল ও অনাড়ম্বর। হাল্‌কা গোলাপী রঙের একটা তাঁতের শাড়ী পরণে—বাহুল্যহীন প্রসাধন, নিজের রূপ ও দেহরেখাকে কৃত্রিম-ভাবে প্রকট করবার প্রয়াস আজ একটুও নেই। তার মুখের রূক্ষতা, রূপের উগ্রতা আজ অন্তর্দ্ধান করেছে, পরিবর্ত্তে একটি স্নিগ্ধতায় আজ মুখ চোখ তার জ্বল্ জ্বল্ করছে। শিখার পরিবর্ত্তন হয়েছে।

শিখা লক্ষ্য করল প্রবীরের দৃষ্টি। লক্ষ্য করল যে প্রবীরের দৃষ্টির মধ্যে আজ একটু প্রশংসাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। লজ্জায়, আনন্দে তার মুখমণ্ডলে একটু আবিরের ছায়া ঘনাল, মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। ঘরের অপ্রচুর আসবাব পত্র, দেওয়ালে বিলম্বিত গান্ধী, লেনিন ও রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলিকে সে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল ; টেবিলের উপরে রক্ষিত বইয়ের স্তূপের মধ্য থেকে বই টেনে দেখতে লাগল। কিন্তু দুটো চোখ ছাড়াও যে একটা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে, তা যেন প্রবীরের দিকেই নিবদ্ধ রইল। প্রবীর তার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছে, তার বিরূপ মনও আজ খুশী হয়েছে একটু। কিন্তু প্রবীর কি একবারও ভাবছে না কেন তা হয়েছে ? সেকি কিছুই বুঝবে না ? প্রবীরের জন্যই যে শিখা নিজের সংস্কার ও আভিজাত্যকে ভেঙে চুরে নিজেকে নূতনভাবে গড়বার চেষ্টা করছে তা কি প্রবীরের হৃদয়কে অভিভূত করবে না ? এ কি মোহ হয়েছে শিখার ?

"আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি।" প্রবীর বলল।

"মাস দেড়েক এখানে ছিলাম না, ভাল লাগছিল না তাই ঢাকা গিয়েছিলাম।"

"তাই না কি? আবার যে ফিরে এলেন বড়?"

"সেখানেও ভাল লাগল না।"

শিখা প্রবীরের দিকে তাকাল। একবার প্রবীর বুঝল সে দৃষ্টির অর্থ। সে নিরুত্তরে হাসল শুধু। কার্ল মার্কসএর 'ক্যাপিটাল' বইটা তুলে নিল শিখা।

"এটা নিয়ে যাব প্রবীর বাবু।"

"বেশ তো, কিন্তু হঠাৎ এদিকে ঝোঁক কেন?"

"কেন, সেটা কি অন্যায়?"

"অন্যায় মোটেই না, তবে নূতন ঠেকছে।"

"পরিবর্ত্তন ত পাথরেরও হয়।"

"তাই দেখছি। পাথর না হলেও আপনার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছি। বিস্মিত হয়েও খুশী হচ্ছি। কিন্তু "ক্যাপিটাল" পড়ার ইচ্ছের চেয়েও আপনার সাজসজ্জা বেশী আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। আপনাকে আজ ভারী সহজ ও সুন্দর মনে হচ্ছে।"

শিখার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল, ললাটের দুপাশের স্নায়ুগুলো হঠাৎ দপ্ দপ্ করে লাফাতে লাগল।

"ধন্যবাদ"—রুদ্ধকণ্ঠে মাথা নীচু করে সে বলল।

হঠাৎ শিখার পিছনে দ্বারান্তরালে, মাধবীকে দেখা গেল। মাথার চুলগুলো পিঠের উপর ছড়ানো, ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়-সংবদ্ধ, ভঙ্গী কঠিন। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে শিখার দিকে, একটা হিংস্র জ্বালায় চোখ দুটো তার ভয়ঙ্কর জ্বলছে।

মুহূর্ত্তকাল।

প্রবীর আহ্বান করতে গেল মাধবীকে, অস্ফুট একটা শব্দও তার কণ্ঠে

থেকে বেরিয়ে এল—কিন্তু ততক্ষণে মাধবী অদৃশ্য হয়ে গেছে। কি হল মাধবীর? কেনই বা এসেছিল আর কেনই বা চলে গেল?

না, শিখা লক্ষ্য করেনি কিছু।

এবার বেরোতে হবে। কিন্তু শিখা উঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে না।

প্রবীরের ক্লান্তিবোধ হয়। সে পতঙ্গ না হতে চাইলে কি হবে। এরা তাকে নিস্তার দেবে না।

ইস্তাহারগুলো সে পকেটে পুরল।

"আপনি বুঝি বেরোবেন?"

"হ্যাঁ, এখুনি। পলাশপুর যাব।"

"আপনাকে তাহ'লে আটকাব না।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিখা উঠে দাঁড়াল, টেবিল থেকে বইটা তুলে নিল। ওটা হবে দ্বিতীয়বার আসার হেতু হয়ে থাক্। তাছাড়া ওটা পড়বেও সে। সে তপস্যা করবে। প্রবীরের মত জেনে, তার কর্ম্মকে বরণ করবে সে। প্রবীরকে তার জয় করতে হবে। প্রবীরের উপেক্ষা তাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে।

"কিন্তু আসল কথাই যে বলিনি আপনাকে—যে জন্যে এসেছিলাম।" শিখা অপরাধীর মত হাসল।

"ঠিকই ত'—বলুন।"

"আগামী বুধবার, মানে ঠিক দু'দিন পরে রাত্রিবেলায় আমাদের বাড়ী আপনার নেমন্তন্ন।"

"হেতু?"

"আমার বোনের ছেলের অন্নপ্রাশন। মাও নেমন্তন্ন জানাচ্ছেন আপনাকে।"

"আপনার মা আমার বিষয়ে জানেন?"

"জানেন বইকি—তাছাড়া তিনি অন্য ধরণের মানুষ, আপনি তাঁকে দেখলে খুশী হবেন।"

"মায়ের ডাক? তাহলে দেখছি যেতেই হবে, কিন্তু এর জন্য এলেন কেন? একটা হুকুম করলেই ত' হত কাউকে—"

"হয়ত হত কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করার লোভ সামলাতে পারলাম না। আর বললেই কি আপনি যেতেন নাকি? যে দেমাক আপনার।"

প্রবীর হেসে ফেলল।

"তাছাড়া"—শিখা মুখ অন্যদিকে ফিরাল, তাছাড়া আমি বদলেছি দেখছেন না?"

প্রবীর চুপ করল। শিখার কণ্ঠস্বরে যে প্রচ্ছন্ন বেদনাময় ইঙ্গিত ছিল তা অনুভব করে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। হঠাৎ মাধবীকে মনে পড়ল।

"চলুন—এবার যাওয়া যাক্।

"হ্যাঁ।"

শিখাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল প্রবীর। মাধবীর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। যে রকম অভিমানী মেয়ে সে।

কিন্তু একি হল তার? একি সঙ্কটময় অবস্থা? তার দু'দিকে এসে দুই নারী দাঁড়িয়েছে দুটো সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে সে যে ভেসে যেতে চলেছে।

কিন্তু তাহলেও মাধবীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। অমন নিঃশব্দচরণে এসে আবার অদৃশ্য হওয়াটা যেন কেমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তাছাড়া তার কঠিন ভঙ্গী ও হিংস্র দৃষ্টিটাও যেন সাধারণ ছিল না। একটা রহস্য আছে এর পিছনে।

কিন্তু মনের অন্তরালেও একটা মন থাকে। চেতনার অন্তরালে অবচেতন। সেখানে তুচ্ছ জিনিষ অনতিসাধারণ হয়ে উঠে, সূক্ষ্ম হয়ে উঠে গুরু। সৌখীন রঙ্গমঞ্চের বহুবিচিত্রিত ড্রপ্ সিনারির পিছনেই যেমন নাটকের সত্যকার দৃশ্যপটগুলি লুক্কায়িত থাকে। বাইরের মন আর চেতনায় থাকে জীবনের দৈনন্দিন ছাপ—বিচ্ছিন্ন খণ্ডকাব্যের মত। কিন্তু সেগুলি সব জোড়াতালি দিয়ে অবচেতনে এক হয়—মহাকাব্যের মত বিরাট হয়ে ওঠে। বাইরের মনে, বাইরের চেতনায়, মাধবীর কথাবার্ত্তা, তার আচরণ, তার প্রগল্ভতা আর গাম্ভীর্য্য, তার হাসি আর অন্ধকার মুখ হয়ত একটা অস্পষ্ট রেখাপাত করেছে, হয়ত সেখানে তার ভালবাসার ইঙ্গিতটা মাঝে মাঝে শুধু আব্ছা ধরা পড়ে, কিন্তু প্রবীরের মনের ভিতরের অন্ধকারে মাধবীর সব কিছু মিলে মিশে যে একটা গভীর রেখাপাত করছে তা হয়ত প্রবীর এখন নিজেই জানে না। জানলে হয়ত আজ দেখতে পেত যে মাধবীর দুর্ব্বোধ্য ব্যবহারের রহস্য ভেদ করতে চাওয়াটা নেহাৎই বাহিক। আসলে সে মাধবীকে দেখে বুঝতে পেরেছে যে সে রাগ করেছে এবং তাই তার মান ভাঙ্গাতে চলেছে—সে মাধবীকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। হয়ত তার অজ্ঞাতে, কিন্তু তার অবচেতন সে বিষয়ে পূর্ণভাবেই জ্ঞাত। আজও প্রবীর তা পূর্ণভাবে জানেনা, কারণ বাইরের চেতনার ও মনের ইতিহাসেরই যে খোঁজ রাখেনা সে অবচেতনের খোঁজ নেবে কেন? আসলে দেশই ওর চেতনাকে এমন গভীর ভাবে আচ্ছন্ন করে রয়েছে যে তার পিছনে উঁকি মারার সময় বা কৌতূহল এখন তার নেই। হয়ত পরে হতে পারে। কিন্তু সে পরের কথা পরেই হবে।

নন্দ তৈরী হচ্ছিল কারখানায় যাবার জন্য। একটু বাদেই আকাশ কাঁপিয়ে, বাতাসের গা বেয়ে বাঁশীর ডাক ভেসে আসবে।

ব্যস্তসমস্তভাবে সে অভ্যর্থনা জানাল প্রবীরকে, "এসো হে কত্তা, বোস। চা খাবি নাকি ?"

"না, খেয়ে এসেছি এই মাত্র।"

"তাহলে একটু বোস্ ত' ভাই, আমি চানটা সেরে আসি, শ্যামের বাঁশী বেজে উঠলে যে খাওয়ার সাধও মিটে যাবে।"

প্রবীর হেসে উঠল, বলল, "তা বটে। কিন্তু আমি বসব না নন্দ, কাজ আছে। আচ্ছা, মাধু কি করছে রে ?"

"পাশের ঘরেই ত' রয়েছে—ডাকব ?—মাধু—ওরে মাধবী—"

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

"কি হল আবার ?" নন্দ বলল।

"ভিতরে গিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিস—একটা বইয়ের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা—"

নন্দ ভিতরে চলে গেল।

তার গলা শোনা গেল, "ঘরের মধ্যে বসে আছিস তবু সাড়া দিচ্ছিস না কেন রে মুখ্‌পুড়ী—যা, প্রবীর ডাকছে—"

প্রবীর হাসল। অভিমান।

কিন্তু মাধবী তবু আসছে না।

এদিকে সময় কাটছে। অথচ অনেক দূরে যেতে হবে, অনেক দরকারী কাজ আছে। প্রবীর উস্‌খুস্ করে, বিরক্ত হয়।

"মাধু"—বিরক্তিভরা কণ্ঠে প্রবীর ডাকল।

এবার লঘু পদধ্বনি শোনা গেল।

মাধবী এসে দরজার পাশে দাঁড়াল। না, ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক

মাত্রায় বাড়িয়ে তুলেছে মাধবী। তা বেশ বোঝা যায়। মাধবীর অন্ধকার মুখে সে ইতিহাস বেশ পরিষ্কার ভাবে লেখা রয়েছে।

"মাধু"—প্রবীর হেসে ডাকল।

"কি ?" নিরস কণ্ঠস্বর মাধবীর।

"রাগ করেছ ?"

"কেন ? রাগ করব কেন ?" না বললেও বেশ বোঝা যায় যে মাধবীর রাগ একতিলও কমেনি বরং তার মাত্রাধিক্যে তার কণ্ঠস্বর একবার যেন একটু কেঁপেই উঠল।

"আমি শিখার সঙ্গে কথা বলছিলুম বলে ?—কিন্তু সে কাজে এসেছিল—নেমন্তন্ন করতে।"

মাধবী মুখ তুলল না, ঠোঁটদুটো তার কেঁপে উঠল একবার।

"কেন গিয়েছিলে মাধবী ?"

"কেন আবার ? দেখতে।" মাধবীর চোখ দুটো শাণিত হয়ে উঠেছে।

"শুধু দেখ্‌তেই ?"

"হ্যা—"

"কি দরকার ছিল তার ?"

"দরকার ছিল—দেখ্‌বার ইচ্ছে হয়েছিল।" হঠাৎ যেন মাধবী নির্লজ্জা হয়ে উঠল।

"দেখে কি লাভ হয় ?" প্রবীরের হঠাৎ কৌতূহল হয়, দেখা যাক্ না মাধবী কি বলে।

কিন্তু না, মাধবীর সাহস আছে, কিংবা মাধবীর আজ আর লজ্জা নেই একটুও, সে চাপা গলায় হিংস্র ভাবে বলল, "যে লাভ শিখার হয়।"

"মানে ?" মাধবীর কথায় প্রবীর অবাক হয়ে গেল।

"মানে তোমায় দেখতে যে ভালো লাগে।" চিবিয়ে চিবিয়ে গলার

সুর হঠাৎ খুব নামিয়ে ফেলে মাধবী বলল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ নীচু হওয়ার কারণ আর একটা ছিল। উচ্ছ্বসিত কান্নার ঢেউ তার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে উপরের দিকে উঠছে।

"কি বলছ! কি বলছ!"—মাধবীর এই অতর্কিত আক্রমণে, অপ্রত্যাশিত ভাবাবেগে প্রবীর হঠাৎ কথা খুঁজে পায় না।

"ঠিকই বলছি। তুমি আরো কি জিজ্ঞেস করবে তাও খুব ভালো করেই জানি। তুমি মিষ্টি কথা বলে খুশী করতে এসেছ, তুমি জানতে চাইবে—কেন হঠাৎ চলে এলাম, তাই না?—"

"হ্যাঁ—কিন্তু"—বিহ্বল ভাবে প্রবীর মাথা নাড়ল।

"জবাব চাও? চলে এলাম, কারণ জমিদারের মেয়ের সঙ্গে কি চাষার মেয়ের তুলনা হয়?"

হঠাৎ কেঁদে ফেলল মাধবী। কিন্তু শব্দ চাপা দিতে হবে—চারদিকে সবাই রয়েছে। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মাধবী ছুটে পালিয়ে গেল।

আশর্য্য! প্রবীর ভাবে আর অবাক হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী তার কাজে লাগছে না, তার বুদ্ধিকে কোনই সহায়তা করছে না। নারী চরিত্র দুর্ব্বোধ্যতার জটিল অন্ধকারে কালো—ঘোর কালো। এত রাগ করবার কি আছে মাধবীর, কেন এত গায়ে পড়ে বাজে কথা বলল সে? আশ্চর্য্য!

হঠাৎ রফা হয় প্রবীরের। দুত্তোর ছাই, একটা গেঁয়ো মেয়ের পাল্লায় পড়ে সে সময় নষ্ট করছে বৃথা। তাছাড়া অর্থহীন রাগ আর নিরর্থক চোখের জল ভারী ক্লান্তিকর। না, সে আর প্রশ্রয় দেবে না মাধবীকে—সে আর ঘন ঘন যাবে না তাদের ওখানে।

কিন্তু মাধবীর ব্যবহারের কি কোনো অর্থই খুঁজে পাওয়া যাবে? রাগ করেও প্রবীর না ভেবে পারে না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনের

অন্ধকারে বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঈর্ষা, ঈর্ষা, মাধবী শিখাকে ঈর্ষা করে।

কিন্তু থাক্ এখন ওসব চিন্তা। পলাশপুর ডাকছে। ভাই চাষী, মাটী কার? তোমরা জলে ভিজে, রৌদ্রে পুড়ে—ক্ষেতে চাষ দাও, বীজ বপন কর, ফসল কাট আর আমাদের প্রাণের অঙ্কুরকে বাড়িয়ে তোল—কিন্তু তবু তোমরা মর। অনাহার, দারিদ্র্যের অজ্ঞতা, কলেরা, ম্যালেরিয়া আর বসন্ত, অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টির নিষ্পেষণে তোমরা প্রতিদিন মর। অথচ তোমার শ্রমের ফসল তুমি কতটুকু ভোগ কর? ভাই চাষী, ভাব। মাটী কার?

ওদের জাগাতে হবে। মাধবীর কথা এখন থাক্।

কাল আর আজ যেন আকাশ আর পাতাল। কালকের নন্দও তাই আজ অন্যরকম। যে নন্দ একদিন ললিতাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিত, যে নন্দ ললিতার অযাচিত রসিকতায় জ্বলে উঠত, যে নন্দ ললিতার জীবিকার কথা ভেবে শিউরে উঠত—সেই নন্দ আজ বদ্‌লে গেছে। আজ সে ললিতাকে দেখে গতি শ্লথ করে, দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে, কানকে খাড়া করে।

ললিতা দাঁড়িয়েছিল দাওয়ার উপরকার বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে। গল্প করছিল বস্তীর একটি মেয়ের সঙ্গে। এইমাত্র সে ফিরেছে আজ।

চোখে মুখে ক্লান্তির বিষণ্ণতা তার চোখ দুটোকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে, অলস ভঙ্গীতে সে বাঁশটার গায়ে হেলান দিয়ে, হাত দুটোকে মাথার উপর দিয়ে তুলে বাঁশটাকে আঁকড়ে ধরেছে। সবুজ রংয়ের একটা পাৎলা শাড়ী তার পরণে, আর কিছু নেই। একটু হাওয়া আছে, হাওয়ার দোলায় বুকের উপর থেকে আঁচলটা মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে, ক্লান্ত গতিতে তা আবার ঠিক করে নিচ্ছে ললিতা।

ভঙ্গীটা নেশা জমায়। নন্দ গ্রামের মানুষ, সাধারণ লোক শিক্ষিত ও কলানুরাগী লোকের মত ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার খোঁজখবর সে জানে না, রাখে না। তা হলে হয়ত সে উপমা খুঁজে পেত, মনে মনে তা আওড়াত। নন্দ তা নয়। কিন্তু তা না হলেও সে কবি, সে সৌন্দর্য্যের ভক্ত।

দাঁড়াল নন্দ। ললিতার রূপের জোয়ার স্তিমিত হয়ে আসছে, বর্ষা শেষের ভৈরবী নদী নয় হেমন্তের নদী সে। নেশায় ঝাপসা চোখ মেলে ললিতার দেহরেখার উপর নন্দ তাকিয়ে থাকে। সুপরিপুষ্ট দেহ। বায়ুতাড়িত অঞ্চল-চাঞ্চল্যে দুটি উন্নত মাংসপিণ্ডের প্রকাশ। নন্দর চোখ জ্বালা করে।

ললিতা দেখেছে নন্দকে।

সে হেসে সেই মেয়েটিকে বলল, "পেটে খিদে মুখে লাজ কথাটা জানিস লো?"

মেয়েটি কথাটার মর্ম্মগ্রহণ করতে পারল না, বলল, "মানে?"

ললিতা চোখ ঘুরিয়ে নন্দর দিকে ইঙ্গিত করল, "ঐ দেখ।"

নন্দ'র সম্বিৎ ফিরে এল, সে চলতে শুরু করল।

ললিতার হাসি শোনা গেল। খিল্ খিল্ হাসি।

ললিতার কথাও শোনা গেল, "অত ভয় আর লজ্জার দরকার কি সখা? বেশ্যা মাগীরা সে দিক দিয়ে ভাল।"

আবার হাসির শব্দ।

নন্দর মাথার ভিতরে দপ্ দপ্ করতে থাকে।

বাড়ী।

কাজললতা এল। একটু আগেই সে চুল বেঁধেছে। মুখখানাকে ধুয়ে মুছে ঝক্‌ঝকে করেছে, শাড়ীটা বদলে নিয়েছে। সুগৌর বর্ণচ্ছটার আড়ালে রক্তিম প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা। একটা স্নিগ্ধ সৌরভ তার দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে ঘরের ভিতর। সুন্দরী বিলের পদ্ম।

নন্দ তাকাল।

হঠাৎ একটা উদ্দাম মুহূর্ত। কাজললতাকে সবলে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরল নন্দ। তার ঠোঁট দুটোকে সে যেন তৃষ্ণার্ত্তের মত কাজললতার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল।

"পাগল! পাগল হলে নাকি গো—কেউ দেখে ফেলবে"—কাজললতা এলিয়ে পড়ল নন্দর বুকের উপর, ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে সে লজ্জায়, আবেশে চক্ষু মুদ্রিত করল।

হঠাৎ আর একটা মোহিনী মূর্ত্তি নন্দর চোখের সামনে ভাসতে থাকে। তার পেছনে অন্ধকার ইতিহাসের পটভূমিকা। কিন্তু তবু সে যেন অপূর্ব্ব, প্রাণরসে উচ্ছল মদিরার মত। আলিঙ্গন শিথিল হয়ে এল। কাজললতা সুন্দরী—কাজললতাকে দেখে ভালবেসেছিল নন্দ—তাকে বিয়ে না করলে তার জীবন হয়ত একদিন ব্যর্থ হয়ে যেত। সব সত্য—কিন্তু এও সত্য যে কাজললতা আর নূতন নেই—তার দেহে অনাবিষ্কৃত জগতের রহস্য নেই। হোক্ না সেই মোহিনী অন্ধকার

মহাদেশ—তবুও তাতে রহস্য আছে, নূতনত্ব আছে। নাঃ কাজললতা পুরোনো হয়ে গেছে।

নন্দর মনে পচন ধরেছে।

তার পরদিন হঠাৎ এক কাণ্ড হলো।

আমাদের দেশ জননীর দুই দল সন্তান আছে। তারা সব দিক দিয়েই এক—শুধু দুটো বিভিন্ন পথ দিয়ে ঈশ্বরকে খোঁজে তারা। বিবাদ বিসম্বাদের কোনোই কারণ নেই তাদের, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে ঝগড়া বাধে, মাথা ফাটে, রক্ত পড়ে। একদল বলে 'আল্লা খুশী হবে ওদের মারলে।' অপর দল বলে 'হরিঠাকুর খুশী হবে।' কিন্তু আল্লা আর হরি'র খুশী'র নিদর্শন পাওয়া যায় না। ওদের অজ্ঞতা, পরাধীনতা, নীচতা আর কুসংস্কার দূর হয় না তাতে। শুধু প্রাণক্ষয় হয়, শুধু তাজা রক্তের দাগ পড়ে মাটীর উপর, শুধু লোহার প্রাচীর গড়ে ওঠে দুইদলের মাঝে। কিন্তু খুশী হবার লোকের অভাব নেই। অতি দূর দেশের শ্বেতাঙ্গ দেবতারা খুশী হয় কারণ যত এরা মারামারি করবে ততই তাদের মোড়লি করার মিয়াদ বাড়বে। এরা যতই নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, ওরা ততই সেই ফাঁকে নিজেদের আসনকে পাকা করে তোলে। যতই এরা নিজেদের রক্ত ছড়ায় ওরা ততই সেই রক্তে নিজেদের পুষ্ট করে। শুধু দেবতারা নয়, আর একদল লোক খুশী হয়। শ্বেতাঙ্গদের পদলেহী কুকুরেরা—এই দুই দলের মধ্যে যারা ছদ্মবেশে আছে। তারা ঈশ্বরকে দেখেনি কোনো দিন, তারা কোনদিন উপলব্ধি করেনি যে মানুষে মানুষে একটা মহৎ মিল আছে, তাদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। সেই সব পরান্নভোজী ক্রীতদাসেরা পরোক্ষে এদের উস্কায়, ছোট স্বার্থের কথা

বলে বড় স্বার্থের পথটাকে তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে দেবতাদের মহিমাকে তারা অম্লান রাখে। এই দুই দল অবোধ, নির্ব্বোধ ভাইদের নাম—হিন্দু ও মুসলমান।

কিন্তু ভূমিকা থাক্‌। কাণ্ডটার কথা হোক। কাণ্ডটা মানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা।

কি করে ঘটল তার ইতিহাস? মূলে একটা গরু আর চারটি ঘাস।

ঘটনাটা ঘটল নমঃশূদ্রপাড়া আর জেলেপাড়ার মোহানায়।

গরুটা হচ্ছে নীলমনি দাসের। ঘাস চারটি করিম শেখের। দুজনেই চাষী গৃহস্থ।

নীলমণির গরুটা ঘাসের লোভে করিমের বাড়ীর বাঁশের বেড়া ডিঙ্গিয়ে গিয়ে তার গৃহ-সংলগ্ন বাগানটায় ঢুকল।

নীলমণির দশ বছরের ছেলেটা ছিল, সে হৈ হৈ করে ওঠার আগেই গরুটা অপরাধটা করে ফেলল। লাউ, বেগুন, লঙ্কা, আর শীমের বাগানের ধারে অজস্র নধর দুর্ব্বা ঘাসের সুরভিত আমন্ত্রণকে সে উপেক্ষা করতে পারল না। পরম লোভীর মত সে ঘাসগুলোকে গোগ্রাসে চিবোতে লাগল। নবীন ঘাসের মধুর স্বাদে তার ডাগর ডাগর চোখের উপর একটা পাৎলা জলের আস্তরণ ঘনিয়ে এল, আরামে সে লেজটাকে নাড়তে লাগল। বেচারী গরু, সে যদি জানত যে হিন্দু ও মুসলমান নামক দু'রকমের মানুষ আছে তাহলে কাণ্ডটা ঘটত না।

কাণ্ডটা ঘটল্‌। করিম শেখ ভিতরে ছিল। নীলমণির ছেলের 'হাট্‌-হাট্‌' হাঁকে আর লতাপাতা ছিঁড়বার শব্দে সে বাইরে ছুটে এল।

পরবর্ত্তী ব্যাপার সংক্ষেপে বলাই ভাল।

গরুটা বেদম মার খেল। নধর ঘাসের সুঘ্রাণ আর সুস্বাদ সে ভুলে

গেল। লাঠির ঘায়ে নীল্‌চে নীল্‌চে দাগগুলো মোটা হয়ে উঠল তার গায়ে। আর অশ্রাব্য গালিগালাজ।

নীলমণির ছেলের চীৎকারে নীলমণির কল্কে উল্টে গেল। হুঁকোটাকে ছুঁড়ে ফেলে সে ছুটে এল।

তারপরেই খানিকক্ষণ বাদানুবাদ।

"খেয়েছে তো কি হয়েছে—ভুলই না হয় হয়েছে—"

"ইস্!—ভুল হয়েছে! কেন হবে?"

"তাই কি করবে শুনি?"

"দেখ না কি করি—"

"কর না—এস না—"

"তবে রে শালা—"

"গাল দিচ্ছিস শুয়ারকা বাচ্চা!—"

"এই লাঠি দিয়ে তোর মাথা চুরচুর করে দেব হারামজাদ—"

"এই ভন্টু—যা তো আমার সড়কিটা নিয়ে আয়—"

চীৎকার শুনে ভীড় হল। সমর্থকদের। নীলমণির সাত জন, করিমদের বারো জন।

আবার এক দফা তর্ক, গালিগালাজ আর তাল ঠোকাঠুকি।

"কি হয়েছে চারটি ঘাস খেয়েছে তো?"

"কেন খাবে—শালার গরু কেন পরের বাড়ী ঢুকবে?"

"জানোয়ার—ও ত' মানুষ নয়।"

"বেশ ত' জানোয়ারকে আজ শালার কেটেই ফেলব—"

"কাট্ দেখি কত মুরোদ—"

"দেখবি?"

"হ্যাঁ রে শালা—"

"চোপ্ রাও—"

এবার কিল চড়ের আওয়াজ হল, তার সঙ্গে দু' একটা লাঠি ঠোকঠুকির শব্দ। তার সঙ্গে এক পক্ষ করল আল্লার মুণ্ডপাত, আর এক পক্ষ করল হরির বংশ নির্ব্বংশ।

যখন সবাই এমনি বীররসে ব্যস্ত তখন নীলমণির ছেলেটা গরুটার লেজ মলে একটা কিল মারল তার পেটে। শিং নীচু করে গরুটা ছুটে বাইরে গেল। একছুটে নিজের মনিবের বাড়ীর এলাকায় গিয়ে গরুটা আবার নিশ্চিন্তমনে রোমন্থন করতে লাগল।

এদিকে কোলাহল আর গালিগালাজে বাতাস মুখর আরো লোক এলো ছুটে। তারা একটু লোক ভাল। ধমকে ধমকে ঝগড়া থামাল আপাতত।

কিন্তু শেষ হল না।

"শালা কাফেরদের দেখে নেব"—এক পক্ষ শাসাল।

"আচ্ছা শালা নেড়ের দল, দেখে নিস্"—অপর পক্ষ প্রত্যুত্তর দিয়ে লেজ গুটিয়ে সরে পড়ল।

করিমের চারদিকে তার সমর্থকেরা ভীড় করে বসল। পরাণ আছে। হিঁদুদের আস্কারা বেড়েছে।

নীলমণির বাড়ীতেও ভীড় জমল। মুসলমানদের জন্য আর টেকা যা না দেশে।

সাময়িকভাবে দু'পক্ষের সভা ভাঙ্গল। কিন্তু জের চলল। বাকী রইল আরো বড় ঘটনা—রক্তপাত। যা ঘটল সেটা স্ফুলিঙ্গ মাত্র, অগ্নিকাণ্ড তখনো নেপথ্যে।

দুপুর বেলায় করিমের দল গেল মস্‌জিদে।

সবে নামাজ শেষ হয়েছে। হাজী ইফ্‌তিকারউদ্দিন তখন সবে

নীচে নেমে আসছে। মৌলবীর বয়স ষাট, দু'দুবার হজ্ করে এসেছে সে। আল্লার পয়গম্বরেরমহিমাপূতঃ তীর্থস্থানে একবার নয়, দু'বার সে পুণ্যার্জ্জন করে এসেছে। দীনদুনিয়ার একছত্র মালিক পরম করুণাময় খোদাহ্‌তালাহ্ এর গুণগান বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে ইফ্‌তিকারউদ্দীনের সাদা দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন মুখমণ্ডলে একটা দিব্যজ্যোতি খেলা করছে এখন।

"ছালাম্ ওয়ালেকাম্ হাজী ছায়েব—"

"ওয়ালেকাম্ ছালাম—আল্লার রহম হোক তোমাদের উপর। কি খবর খোদাহ্ তালাহ্'র সন্তানদের খবর কি?" হাজী যেন মন্ত্রোচ্চারণ করে। সবাই বিগলিত হয়ে উঠল এই মধুর সম্ভাষণে।

"অনেক কথা আছে হাজী ছায়েব—একটু বসেন ত—"

সবাই বসল। উত্তেজিত কণ্ঠে অনেক আলোচনা হল।

হাজীসাহেব দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "এছ্‌লাম বিপন্ন হয়েছে। দুনিয়াতে এছলাম্ ছাড়া আর সত্য পথ কিছুই নেই—তোমরা সেই এছ্‌লামের সন্তান। এছ্‌লামকে রক্ষা করতে হবে তোমাদের—দরকার হলে তলোয়ার ধরবে—কাফের আর অধার্ম্মিকদের মানুষ করার ভার ত' তোমাদেরই উপর।"

শ্রোতাদের চোখে তলোয়ার ঝল্‌সাল।

আরো খানিকক্ষণ আলোচনা চলল।

হাজী তাদের যেন কি কি নির্দ্দেশ দিল।

তারপর সে বলল, "যা বললাম—তাই মনে রেখো। আমি একবার ইদ্রিস দারোগার কাছে যাব পরে—তোমরা কয়েকজন চারিদিকে খবর দাও—"

আল্লার দরবার থেকে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ নিয়ে সবাই বেরোল।

ওদিকে নীলমণির দল বসে নেই।

তারা গেল মনোহর মুখুজ্জের ওখানে।

মনোহর মুখুজ্জের তখন ঘুম পেয়েছে, ডাকাডাকিতে মেজাজটা একটু চড়ে গেল। কাপড়ের দোকানের হিসেব নিকেশ সেরে সবে সে খাওয়া দাওয়া শেষ করেছে, শরীরটা আলস্যে ভারী হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ, এমনি সময়ে ডাকাডাকি।

ব্যাঘাতকারীদের কাহিনী শুনে আরো মেজাজ চড়ে গেল তার, উত্তেজনায় মুখচোখ ভয়াল হয়ে উঠল, "বড় বাড় বেড়েছে—হুঁ"—দাঁতে দাঁত ঘষল মনোহর মুখুজ্জে। তারপরে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে শুরু করল, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দুর্দ্দিন এলেও তাকে কে রক্ষা করবে? সে তোমরাই—তোমরা হিন্দু—এই দেশ তোমাদের অথচ চার পাঁচশ বছর আগে যারা এসেছে সেই যবনদের কাছে তোমরা মাথা নীচু করবে? 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ,' স্বয়ং ভগবানের নির্দ্দেশের কথা ভাব—তাছাড়া ম্লেচ্ছ ও যবনদের বিধান করতে তিনি নিজেই আসবেন কল্কিরূপে। কিন্তু যতদিন না ভগবান সে ভার স্বয়ং গ্রহণ করছেন ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের ধর্ম্মকে তোমাদেরই বাঁচাতে হবে। নয় কি?"

দেওয়ালে বিলম্বিত শঙ্খচক্রগদাধারীর মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে সবাই একটা প্রেরণা পায়।

"যে যেমন তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করতে হবে। তৈরী থেকো তোমরা—সাপকে পোষ মানানো যায় না ভাই, হয় তার বিষদাঁত ভাঙ্গতে হয় নতুবা তাকে একেবারেই মেরে ফেলতে হয়। আর শোন—"

"কি বলছেন?"

"সবাইকে খবর দাও—সবাই যেন তৈরী থাকে।"

ম্লেচ্ছদের শায়েস্তা করার করাল প্রতিজ্ঞায় মুখ কালো করে সবাই

বেরিয়ে এল। দেওয়ালে বিলম্বিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি—যেন সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের এই সব সুসন্তানদের তিনি অভয় দিচ্ছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে রক্ত পড়ল।

নীলমণির একজন সমর্থক—কালাচাঁদ যাচ্ছিল হাটের দিকে।

মস্‌জিদের কাছাকাছি, একটা ঝোপ্‌ঝাড়ের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ সে চম্‌কে উঠল। সবেগে তিনচারজন লোক তার দিকে লাঠি হাতে ছুটে আসছে। তারা কে চিনবার আগেই একটা শব্দ হল—কালাচাঁদের মাথার উপর লাঠি পড়ল। কালাচাঁদ একটা তীক্ষ্ণ, তীব্র আর্ত্তনাদ করে মাটীতে পড়ে গেল। আক্রমকারীরা পালাল।

দূরে দু'একজন যারা যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে তারা ছুটে এল। কালাচাঁদ মরেনি তবে গুরুতর আঘাত পেয়েছে। মাটীতে রক্তের দাগ পড়ল।

গ্রামের মধ্যে রাতারাতি সে খবর ছড়িয়ে গেল। নিঃশব্দ উত্তেজনায় সবাই কেঁপে উঠল।

সকালবেলায় দেখা গেল যে আখড়ার কাছাকাছি রাস্তার উপর একটা গরু কর্ত্তিত অবস্থায় পড়ে আছে, রাতে শেয়াল কুকুরে তার খানিকটা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। তবুও গরুটাকে চেনা গেল।

সেই অবোধ, লোভী জানোয়ার, নীলমণির গরুটা। কয়েক গুচ্ছ নধর ও সবুজ দূর্ব্বাঘাসের লোভে সে যে পাপ করেছিল তার ফলেই তার মৃত্যু এল।

শুধু তাই নয়, শেষরাত্রে করিম শেখের রান্নাঘরের দিকটাতে আগুন জ্বলে উঠল। ভীত, ত্রস্ত, বিহ্বল ও ঘুমন্ত নরনারীরা করিম শেখের বাড়ীর কোলাহলে জেগে উঠল। আগুনের আভায় অন্ধকার জ্বলছে।

করিম শেখ অনেক আগে থেকেই জেগে ছিল—মাঝরাত্রে বাইরেও গিয়েছিল। শেষরাত্রে সে যখন বাড়ী ফিরল তখন হঠাৎ বাতাসের সঙ্গে সে একটা ধোঁয়ার গন্ধ পেল। সঙ্গে সঙ্গে চট্‌চট্ শব্দ। আগুনে বাঁশ পুড়লে যেমন শব্দ হয়। সন্দেহ হল। সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরের দিকে নজর পড়তেই দেখল সোনার মত রঙীন আগুন সর্পজিহ্বা মেলে আত্মবিস্তার করছে। কোলাহল, চীৎকার, অভিসম্পাত আর জলবর্ষণ। বেশী ক্ষতি না হলেও যা ক্ষতি হল তাতেই করিম শেখ আর তার সঙ্গীদের চোখেমুখে অধিকতর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা তাদের বক্ররেখায় ঘোষিত হল।

. .

গ্রামের সবাই খবর জানল। উত্তেজিত আলোচনা চলছে, দাওয়ায় দাওয়ায়, ঘাটে, মাঠে, পথে, হাটে। আল্লা আর হরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে।

বেলা দশটা।

হাজী সাহেবকে এগিয়ে দিতে ঘর থেকে ইদ্রিস্ খাঁ বেরিয়ে এল।

হাসিমুখে সে বলল। "আচ্ছা সেলাম ওয়ালেকম্ হাজী সাহেব—"

"ওয়ালেকাম ছালাম্ বাবা—আল্লা তোমার মঙ্গল করুক।"

বেল্টের বাঁধন আল্‌গা করে ইদ্রিস খাঁ চেয়ারে গিয়ে বসল, একটা সিগারেট ধরাল, তারপরে কি যেন লিখতে লাগল। নীলমণি দাসকে গ্রেপ্তার করতে হবে—করিম শেখের বাড়ীতে আগুন লাগানোর জন্য। সাক্ষী আছে। অবশ্য নীলমণিও একদফা নালিশ জানিয়ে গেছে তার গরুর বিষয়ে; কিন্তু তার সাক্ষী নেই। সাক্ষী না থাকলে ইদ্রিস্ খাঁ কি করতে পারে? সে নিরুপায়।

মধ্যাহ্নের নামাজ পড়তে গেল হাজী সাহেব।

ভিতরে গিয়েই খোদার খিদ্‌মদ্‌গারের চক্ষুস্থির হয়ে গেল, সাদা দাড়ি গোঁফের পিছনকার বলিরেখাসমন্বিত জরাজীর্ণ চামড়ার নীচেকার স্তিমিত রক্ত-স্রোতে যেন যুদ্ধের আহ্বান ধ্বনিত হল। চোখ দুটো তার করম্‌চার মত লাল হয়ে উঠল।

আল্লার দরবারের মধ্যস্থলে একটা দ্বিখণ্ডিত শুয়োর পড়ে আছে। জবাব। হরি ঠাকুরের জবাব।

"তোবা—তোবা"—বিকৃতকণ্ঠে হাজী উচ্চারণ করল।

তারপরে দ্রুতপদে সে মস্‌জিদ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

করিমের দলকে নিয়ে মৌলানা বসিরুদ্দিনের খোঁজে গেল হাজীসাহেব মৌলনা নেই, ঢাকা গেছে পাটের ব্যবসা-সংক্রান্ত জরুরী কাজে, পরদিন আসবে।

কিন্তু হতাশ হবার কারণ নেই। গ্রামের আর একজন মাতব্বর কুতুব মিঞা আছে।

কুতুব মিঞার বয়স অল্প, মাদ্রাসার কয়েক শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে সে এবং নিজের জাতিকে গভীর ভাবেই সে ভালবাসে। বাজারের মস্ত বড় মণিহারী দোকানটা তারি।

সব শুনে সে বলল, "জানি—সব ব্যাপার জানি হাজীসাহেব। কিন্তু এতদূর স্পর্দ্ধা এদের হবে তা যে ভাবতেই পারছি না।"

হাজীসাহেব রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "ভাবতে না পারলেও ব্যাপারটা যে সত্যি কুতুব।"

রোষকষায়িত নেত্র তুলে কুতুব বলল, "এর জবাব দিতে হবে। ওদের জানাতে হবে যে দেশ আমাদের।"

হাজীর মুখে প্রসন্নতা ঘনিয়ে এল, কি একটা ভেবে সে বলল, "আচ্ছা জমিদারকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া উচিত নয়কি?"

কুতুব হেসে উঠল, "হাজীসাহেব, কি কথা বললেন আপনি? সেও যে হিঁদু। মুসলমান ছাড়া মুসলমানের স্বার্থ আর দরদ কে বুঝবে?'

"ঠিক, ঠিক বলেছ বাবা—খোদা তোমায় হেফাজতে রাখুন।"

"তাহ'লে আপনি এই অনাচার দূর করুন—আমরা আছি। এটা জানবেন যে দুনিয়ায় সবাই শক্তের ভক্ত।"

"বেশখ্—বেশখ্—"

বিপন্ন ইস্‌লামকে রক্ষা করতে হবে। চারদিকে ডাক ছড়িয়ে গেল কিছুক্ষণ বাদেই।

ওদিকে নিমাই বাড়ুয্যের বাড়ী সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের যোদ্ধাদের একটা গুপ্ত সভা বসেছে। তেত্রিশ কোটী দেবতার দোহাই পেড়ে নিমাই বাড়ুয্যে তাদের বুঝিয়ে দিল যে হিন্দু ধর্ম্মকে বাঁচাতেই হবে।

"আর কি চাও? আখড়ার সামনে, রাধাগোবিন্দজীউর পবিত্র মন্দিরের সামনেই গো-হত্যা করেছে ওরা—আর কি চাও? এর চেয়ে আর কি ভয়ঙ্কর হতে পারে? এখনো কি তোমারা চুপ করে থাকবে? যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর হবে—সবাই তৈরী থাকবে।"

"ঠিক"—উত্তেজিত নীলমণি রুখে উঠে বলল, "যদি মার খেতে হয় তবে মেরেই মার খাব না হয়।"

"ঠিক—ঠিক।" সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই আবার রক্ত পড়ল মাটীর উপর। এবার একজনের নয়, কয়েকজনের। আল্লার দলের জন ছয়েক আর হরি'র দলের জন পাঁচেক। লাঠির ঘায়ে দুজনের মাথা ফাটল, ছোরার ঘায়ে একজন লুটিয়ে পড়ল। কোলাহল আর আর্ত্তনাদ। তিনজন মাটীতে পড়তেই বাকী সবাই পালাল। তিনজনের মধ্যে দু'জন হিন্দু, একজন মুসলমান।

দুপক্ষ লোক পাঠাল দারোগার কাছে—থানাতে। পুলিশ এল। নিহতদের নৌকো করে সহরে চালান দেওয়া হল। রাত্রির আকাশে নিহতদের পরিবারবর্গের কান্না ধ্বনিত হল।

আপাততঃ নীলমণিকে গ্রেপ্তার করা হল, শুধু তাই নয়, রিপোর্ট সমেত কনষ্টেবল্ ও নীলমণিকে সহরে চালান দেওয়া হল। আরো তদন্ত হবে।

গ্রামে আতঙ্ক ছড়াল। কেউ আর বাড়ীর বাইরে বেরোতে চায় না।

রাত আটটার সময় আবদুল এসে ডাকল—"প্রবীরবাবু—"

"আবদুল! এস—এস ভাই"—প্রবীর যেন কি লিখছিল।

আবদুল বসল না, গম্ভীরভাবে বলল, "বসব না—কিন্তু সব খবর জানেন কি?"

প্রবীর উঠে দাঁড়াল, "কি খবর? গরু নিয়ে মারামারি আর আগুন লাগানো—এইত?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তাতেই ঝগড়া থামেনি—এখন সেই ঝগড়া হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হয়ে দাঁড়িয়েছে—"

"সে কি!"

"হ্যাঁ। আখড়ার সামনে গরু কাটা হয়েছে, মসজিদে শূয়োর। শুধু তাই নয়, এই একটু আগে দল বেঁধে লাঠি আর ছোরা চালিয়েছে দু'দল—তিনজন মরেছে।"

প্রবীর বিহ্বল হয়ে পড়ল, মৃদুকণ্ঠে বলল, "এ যে সত্যি দাঙ্গা—"

আবদুল বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল, দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "এই সব ছোট ছোট মারামারি কাটাকাটি আমাদের এক বছরের কাজকে একদিনে পিছিয়ে দেয়।"

প্রবীর মৃদু হাসল, "কিন্তু তবু আমরা যেন পিছিয়ে না পড়ি ভাই। কিন্তু সে কথা থাক্—এই সব দাঙ্গার জন্য আসলে কারা দায়ী জান?"

"খানিকটা আঁচ করতে পারছি—তাদের কাছে আমাদের যেতে হবে। এ ব্যাপারকে উপেক্ষা করলে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে এর বিষ ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু তার আগে আমাদের এখন ইউনিয়নে যেতে হবে। সবাইকে আসতে বলে এসেছি আমি।"

"কেন?"

"সেখানেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে—দু'পক্ষের লোক এসে মারামারি করার জন্য তাদেরও উস্কাচ্ছে।"

"বটে! চল তবে।"

কত কাজ—কত কাজ করতে হবে।

ইউনিয়ন।

সবাই এসেছে। গণি মিঞা ও আতাউল্লাও আছে।

প্রবীর বলল, "আতাউল্লা—তোমার কি মত?

আতাউল্লা গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "বাবুসায়েব, দেশ কারো একার নয়। হিন্দু মুসলমানকে চিরদিনই একসঙ্গে থাকতে হবে—কিন্তু মারামারি, কাটাকাটি করে কে ক'দিন টিঁকে থাকতে পারে? আসলে আমরা চাই স্বাধীনতা—তার জন্য লড়তে হবে, নিজেদের মধ্যে নয়, আর একজনের সঙ্গে।"

প্রবীর গর্ব্বের হাসি হাসল, "ঠিক, এই ত' শ্রমিকের মত কথা—এই ত' ভারতবাসীর কথা। গণি ভাই কি বল?"

গণি একটু ভেবে বলল, "লোক এসেছিল উস্কাতে—আমাদের ধর্ম্ম নাকি বিপন্ন হয়েছে। আমি বলেছি ধর্ম্ম নয়, আমরা নিজেরাই নিজেদের বিপন্ন করছি।"

প্রবীর বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল, "ঠিক কথা, গণি ভাই তুমিও একজন সত্যিকারের শ্রমিক। ভাই সব। ঈশ্বরকে দেখা যায় না, ধর্ম্ম বলে জিনিষটা হাওয়ার চেয়েও সূক্ষ্ম। মানুষের কতকগুলি সদাচার, মানুষে মানুষে প্রীতি ও মনুষ্যত্বকে বর্দ্ধনকারী মতকেই ধর্ম্ম বলা হয়। ধর্ম্ম কথনই

বলে না যে মারামারি কর, কাটাকাটি কর, নিজের ভাইয়ের রক্তে স্নান কর। ইস্‌লাম আর হিন্দুধর্ম্মও বলে না। সুতরাং কোনো ধর্ম্মই বিপন্ন হয়নি। ভাই সব, তোমরা শ্রমিক—ভবিষ্যতের একটি মাত্র জাতি—মানুষ। আমি ঈশ্বরকে দেখিনি—তবু দেখছি যে একই জিনিষের দুটো নাম—পার্থক্য কিছু নেই। জল আর পানি একই বস্তুকে বোঝায়, আকাশ আর আসমানও তাই। দুটো করে শব্দ থাকলেই কি দুটো আলাদা জিনিষ হয়। খোদা আর হরি কি আলাদা? তেমনি হিন্দু আর মুসলমানও সেই একই জাতি—মানুষ—তারা সেই একই দেশের সন্তান—ভারতবর্ষ? তবে? ভাই সব, মারামারি যারা করছে করুক—তোমরা বিপথে যেও না। শুধু তাই নয়, তোমাদেরও এই সব দাঙ্গা থামাতে সাহায্য করতে হবে। করবে ত, করবে ত? জবাব দাও—"

শতকণ্ঠের ধ্বনি উঠল, "করব—আমরা দাঙ্গা থামাব—"

রাত হয়েছে। হোক্।

আবদুল, আতাউল্লা ও অবিনাশকে নিয়ে প্রবীর গেল হাজীসাহেবের কাছে—আবদুল আর অবিনাশ সঙ্গে লাঠি নিল—প্রস্তুত থাকা ভাল।

হাজীসাহেব তাদের দেখে খুব খুশী হতে পারল না। সে বলল যে সে এ সবের মধ্যে মোটেই নেই, সুতরাং সে কিছুই করতে পারবে না।

বাইরে এসে আবদুল বলল, "হাজীসাহেব মিথ্যে কথা বললেন—"

আতাউল্লা মাথা নাড়ল, "মনে হচ্ছে। যাক্—চেষ্টা থামবে কেন?"

প্রবীরের মুখে চোখে সঙ্কল্পের জ্যোতি, সে বলল, "নিশ্চয়ই। চল এবার মনোহর মুখুয্যের ওখানে—"

অবিনাশ বলল, মৌলানা সাহেব আর কুতুব মিঞাকেও ধরতে হবে কিন্তু।"

"হ্যাঁ—তাদের কাল ধরব। কেউই যদি হাজীসাহেবের মত রাজী না হয় তবে আমাদের অন্য পথ ধরতে হবে।"

কিন্তু মনোহর মুখুয্যেও সেই এক কথা বলল। তারা কি জানে এ সব দাঙ্গার? যাদের গরু আর ঘাস থেকে এই কাণ্ড সুরু হয়েছে তারাই জানে এসব—তাদের ধরগে যাও।

হ্যাঁ—তাদের তারা ধরবে বইকি।

একটু হতাশ হয়েই ওরা ফিরল।' হতাশ এইজন্য যে রাতারাতি কিছু হল না।

ওরা চলে আসতেই হাজীসাহেব করিম শেখের দলকে ডেকে পাঠাল। মনোহর মুখুয্যেও কম নয়। সেও ডেকে পাঠাল নীলমণি দাসের দলকে:

দু'পক্ষই বলাবলি করল, "পাটকল থেকে নাস্তিক আর শয়তানের দল এসেছিল বড় বড় কথা বলতে। এই সব ধর্ম্মহীন অনাচারীরাই দেশকে রসাতলে দিচ্ছে—ওদের কথায় কান দিও না, সাবধান।"

রাত্রেও কাণ্ড ঘটল।

মজুর বস্তীর জয়নুদ্দিন মারা পড়ল ছোরার ঘায়ে। খালের ধার থেকে বস্তীর দিকে ফিরবার সময়, ঠিক রাস্তাটার সেই মোড়ে যেখান

থেকে একটা রাস্তা গেছে কারখানার দিকে আর একটা গেছে আখড়ার পার দিয়ে।

আবার শেষ রাত্রে আগুনের শিখা অন্ধকারকে লেহন করতে করতে আকাশের দিকে উঠল। তুবড়ী বাজির স্ফূলিঙ্গের মত ধোঁয়ার মুখে আগুন উড়ে বেড়াতে লাগল। সাউপাড়ার নিরীহ হরেন সাহার টিনের বাড়ীটার অর্দ্ধাংশ একেবারে বারুদের মত জ্বলে উঠেছে।

ভীত, আর্ত্ত, আতঙ্কবিহ্বল নরনারীর চীৎকার ভেসে এল—"জল—জল—জল আন—"

তবু কিছু হল না। অঙ্গারে পর্য্যবসিত অর্দ্ধেকটা বাড়ীর দিকে তাকিয়ে হরেন সা বুক চাপড়ে পাগলের মত কাঁদতে লাগল।

ইদ্রিস্ খাঁ বড় ব্যস্ত। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে সে—অপরাধীদের সে ধরবেই। অনেককেই ধরা হল—জেলেপাড়ার সিধু, মুকুন্দ, আফজল আর সাউপাড়ার নিধিরাম। বস্তীর যে লোকটা মারা গিয়েছিল তার লাশকেও ঢাকায় পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য। অতিরিক্ত পুলিস আমদানী করার জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছে ইদ্রিস্ খাঁ। গ্রামে যে কয়জন পুলিস ও কন্‌ষ্টেবল্ তার থানায় আছে তাদের সে জায়গায় জায়গায় টহল দিতে নিযুক্ত করেছে। কলাতিয়া গ্রামে ব্রিটিশ সরকারের প্রতাপান্বিত প্রতিনিধি কোনো ত্রুটিই করেনি।

মৌলানা বসিরুদ্দিন এসেছে।

প্রবীর, আবদুল আর সুব্রত গেল। সুব্রতও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

মৌলানা চমৎকার লোক, সব সময় হাসিমুখ, "এসো ভাই—এসো—বোস।"

আবদুল বলল, "সব খবর তো জানেন হুজুর—না ?"

"হ্যাঁ ভাই।"

"আমরা কি চিরদিনই এইভাবে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করব মৌলানা সাহেব ?" প্রবীর আবেগকম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

মৌলানা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকল, পরে ধীরে ধীরে বলল, "অজ্ঞতা আর অশিক্ষার কুফল রে ভাই, দোষ কাকে দেবে তুমি ? রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়নি—আমাদের যত পাপ তা কারো একার নয়—এ আমার, এ তোমার পাপ।"

সুব্রত বলল, "ঠিক বলেছেন মৌলানা সাহেব। এবার কি করা যায় বলুন ? যাদের উপর একটু সন্দেহ হয়েছিল তারা ঘাড় নেড়ে অক্ষমতা জানিয়েছেন। এবার আপনি ভরসা।"

"ওটা অত্যুক্তি ভাই—আমি একপক্ষের, তোমাদের সাহায্যও চাই বৈকি। জমিদারের কাছে যাবে নাকি ?

প্রবীর উত্তেজিত হয়ে উঠল, "যাবার কি দরকার বলুন ? তিনি নিজের জমিদারী আর কারখানা নিয়েই ব্যস্ত—প্রজার কি ধার ধারেন তিনি। আজ দু'দিন কেটে গেল, কৈ তার তো কোনো চাঞ্চল্যই দেখতে পাচ্ছি না। না, মৌলনাসাহেব, আমরাই পারব—অহঙ্কার নয়, আমরা জমিদারবাবুর চেয়েও আমাদের গাঁয়ের লোকেদের বেশী চিনি—বেশী ভালবাসি—"

"হুঁ—তা ঠিক"—মৌলনা কি যেন ভাবতে লাগল, পরে মুখ তুলে প্রশ্ন করল, "হাজীসাহেব আর মনোহর বাবু 'না' বলছে ? হুঁ, আচ্ছা, হাজীসাহেবকে আমি ধরব—তুমি আমার সঙ্গে মনোহরবাবুর কাছে চল। তাকে কাজে লাগাতে হবেই—"

মৌলানার চোখ জ্বলছে।

মনোহর মুখুজ্জে একটু ভয় পেল। ব্যাপারটা একটু বেশীরকম বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মৌলানা এসেছে নিজে—আর বাড়িয়ে লাভ নেই।

"এসো মৌলানা"—আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে মুখুজ্জে সম্ভাষন জানাল।

"মনোহর—এসব দাঙ্গা থামাতে হবে"—মৌলনা কঠিনকণ্ঠে বলল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ—নিশ্চয়ই থামাতে হবে ভাই।"

"কিন্তু কাল অস্বীকার করেছিলেন?" প্রবীর কটাক্ষ করে বলল।

তোমাদের কথায় মনে হচ্ছিল যেন আমিই দায়ী তাই অস্বীকার করেছিলাম।" মনোহর মুখুজ্জে ভ্রুকুটি করলেন।

মৌলানা বাধা দিল, "এখন আর অন্য কোনো কথা কাটাকাটি নয় ভাই। আমাদের এটা ভুললে চলবে না যে আজ যেমন আমরা পাশাপাশি আছি কালও তাই থাকব। অধিকার আর স্বার্থ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়ত করি কিন্তু গলা কাটাকাটি করার মত নির্ব্বুদ্ধিতা করার কোনো অর্থ আছে কি? না ভাই মনোহর, এসব শক্তিক্ষয় থামাতে হবে। তোমার প্রভাব আছে গ্রাম্য হিন্দুদের উপর, তুমি হয়ত চেষ্টা করলেই বিবাদকারীদের খুঁজে বের করতে পারবে। আমিও আমাদের লোকদের মধ্য থেকে বিঘ্নকারীদের খুঁজে বার করব। হিন্দু মুসলমান দুই দল থেকেই রক্ষীদল তৈরী কর, তুমি আর আমি তাদের নিয়ে সারা গ্রামে ঘুরে বেড়াব, সারারাত পাহারা দেব আমি বন্ধুক নিয়ে। দেখি কি করে মানুষ কাটাকাটি করে।"

মনোহর মুখুজ্জেও উত্তেজিত হয়ে উঠল, সেও কি পিছনে পড়ে থাকবে?

"বেশ মৌলানা—তাই হবে। সবাই যদি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াই তবে কি এসব কাণ্ড হয়?"

সুব্রত বলল, "বেশ, এখুনি তবে রক্ষীদলের নামের লিষ্ট্ করতে হবে —আনুন কাগজ কলম।" তার কণ্ঠে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

জয়। জয় হয়েছে। মানুষের হৃদয় জয় করায় যে আনন্দ হয় তারি তীব্র অনুভূতিতে প্রবীর আর আবদুলের বুক যেন ফুলে ফেঁপে উঠল।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল, এমন কি রক্ষীদেরও জানিয়ে দেওয়া হল। খানিক পরেই তারা গ্রামের মধ্যে টহল দেওয়া শুরু করবে।

হাজীসাহেব বলল, "কিন্তু ভেবে দেখ বসিরুদ্দিন—"

কুতুবও উত্তেজিতকণ্ঠে সায় দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—ভেবে দেখেন ভাই-সাহেব—মস্‌জিদ্ অপবিত্র করেছে ওরা—"

মৌলানার ললাট রেখাসঙ্কুল হয়ে উঠল, "কিন্তু তারও আগে মন্দির অপবিত্র করেছে কারা?"

হাজীসাহেব কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে কঠিনকণ্ঠে মৌলানা বলল, "কোরাণের পবিত্র পাতায় কোথাও প্রতিবেশী ও দেশ-বাসীকে হত্যা করার বিধান নেই। যা হয়েছে হয়েছে, কিন্তু আর এসব হতে পারবে না। আপনারা যদি অন্য পথে যান—বাধ্য হয়ে আমি আপনাদের পরিত্যাগ করব এবং আমার মূর্খ ভাইদের ছোরা আর লাঠির সামনে নিজেকেই পেতে দেব—"

হাজীসাহেব ও কুতুব মিঞা স্তব্ধ হয়ে গেল।

মৌলানা হঠাৎ হাসল, "আর ব্যাপারটা কি হাসির নয়? একটা

গরু ঘাস খেয়েছিল বলে ঝগড়া হয়েছিল—তার মধ্যে ধর্ম্মটা কোথায় আহত হল বলুন ত? আমার অনুরোধ, আপনারা ধর্ম্মের সঙ্গে মানুষকে জ্ঞানও বিতরণ করুন।”

না, মৌলানারই জয় হল।

নিমাই বাড়ুয্যে ক্ষেপে গিয়েছিল।

“একি একটা কথা হল—গরু মেরে জুতো দান হচ্ছে এখন? বাঃ—বেশ—বেশ!”

মনোহর মুখুয্যে হাসল, “দেখ নিমাই, জেনে শুনে ভুলের বোঝা বাড়িয়ে বিপদে পড়ব নাকি? তাছাড়া এটাও সত্যি কথা যে আমাদের বাইরের শত্রুকে অগ্রাহ্য করে ঘরের ভিতরেই শত্রুতা বাড়াচ্ছি প্রাণপণে—এতে যে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। না, আমার ভুল হয়েছে—জোর করে মানুষকে অধীন করা গেলেও জয় করা যায় না।”

নিমাই বাড়ুয্যে হন্‌হন্ করে বাড়ীর দিকে চলল। যেতে যেতে আশে পাশে তাকাল সে—কেউ কোথাও নেই ত! ভয় লাগে। এই বুঝি পড়ল ছোরা, পড়ল লাঠি! না বাবা, মুখুয্যের কথাই ঠিক, মিছিমিছি মরাতে, অতর্কিতে মরাতে কি অস্বস্তি!

নায়েব এসে ব্যাপারটা জানাল।

জমিদার শশাঙ্কবাবু ইজিচেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। যেন একটা সহস্রমুখী বৃশ্চিক তাকে দংশন করেছে।

“বটে! আমাকে বাদ দিয়ে মোড়লী হচ্ছে!” অপমানে লাল হয়ে উঠলেন তিনি। তিনি গ্রামের জমিদার, তাঁকে বাদ দিয়েই আজ ওরা বাহবাটা পেতে চায়! বটে!

"কিন্তু আপনি ত' যান নি বা খোঁজ নেননি—তাই বোধ হয়—" নায়েব কারণটা দেখাতে চাইল।

শশাঙ্কবাবু গর্জ্জে উঠলেন, "চুপ্ করুন। আমার অনেক কাজ—আমি ওদের মত নিষ্কর্ম্মা নই। আচ্ছা, এর মূলে তবে সেই প্রবীর, সেই তবে এই কমিটি তৈরী করিয়েছে, না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—সেই উদ্যোক্তা—"

"বটে !" ক্ষণকাল শশাঙ্কবাবু ভাবলেন, কি একটা যেন স্থির করলেন তিনি, তারপরে বললেন, "দারোগা সাহেবকে সেলাম জানান ত'—"

"আচ্ছা।"

নায়েব চলে গেল।

ড্রয়ার থেকে চুরুট বের করলেন শশাঙ্কবাবু। ধরালেন তা। চুরুটের ধোঁয়া উদ্গীরণ করতে করতে অস্থিরভাবে তিনি ঘরের ভিতর পায়চারী করতে লাগলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ইদ্রিস্ খাঁ এল।

"আসুন—আসুন দারোগা সাহেব। অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এখুনি এসেছেন। বসুন, বসুন—নিন্ একটা চুরুট ধরান।"

"হেঁ হেঁ—বস্ছি"—শশাঙ্কবাবুর আদর অভ্যর্থনায় ইদ্রিস্ খাঁ অভিভূত হয়ে গেল।

ইদ্রিস্ খাঁ চলে গেল। দাঙ্গা-সংক্রান্ত আলোচনা সেরেছেন শশাঙ্কবাবু।

তিনি অপেক্ষা করছেন। আর একজনের জন্য।

খানিকবাদে সেও এল। একজন মজুর, বস্তীতে থাকে, গণি মিঞার দলের লোক সে, নাম খলিল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, জোয়ান লোক।

তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কি সব কথা বললেন শশাঙ্কবাবু নিম্নকণ্ঠে।

তখন গ্রামের প্রতি রাস্তায়, প্রতি মোড়ে চারজন করে লোক টহল দিচ্ছে; মনোহর বাবু বন্দুক নিয়ে সুপারিশ করছেন, সঙ্গে সুব্রত। রাত্রিবেলায় প্রবীর আর মৌলনা পাহারা দেবে।

এখনো পর্য্যন্ত কিছু ঘটেনি—সব শান্ত। একতার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে? তরঙ্গ রোধিবে কে?

ও দিকে মাধবী ছট্‌ফট্ করছে।

গ্রামে দাঙ্গা বেঁধেছে—বাড়ী থেকে বেরোবার উপায় নেই। কড়া নিষেধ বাবার আর দাদার, তাছাড়া ভয়ও করে। প্রবীরকে দেখার উপায় নেই। সেইদিন থেকে প্রবীরও আর তাদের বাড়ীতে আসেনি। শুনতে পাচ্ছে সে নাকি দাঙ্গা থামাতে ব্যস্ত। আরো ভয় বেড়েছে মাধবীর। যদি প্রবীরকেই কেউ মেরে বসে? হে মা কালী, রক্ষা করো, প্রবীরকে রক্ষা করো।

চোখে ঘুম নেই মাধবীর। নিদারুণ জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে সে। ঘরের ভিতরে অসহ্য হলে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। বাইরে অসহ্য হলে

১৮

ভিতরে যায়। প্রবীর কি রাগ করেছে? নিশ্চয়ই রাগ করেছে সে, নইলে বাড়ীর পাশ দিয়েই সে নিজের বাড়ী যায়—একটা সাড়া দিতেও কি পারে না? একবারও কি সে এসে বলতে পারে না—না মাধু না, রাগ করিনি আমি? এদিকে মাধবী যে অনুতাপে পুড়ে মরছে, তাকে যে ক্ষমা চাইতে হবে। প্রবীর কি এটুকু বোঝে না যে মাধবী তাকে ভালোবাসে বলেই অমন আঘাত দিয়েছিল? ভগবান, তুমি প্রবীরকে শুধু মানুষই করেছ কিন্তু তাকে হৃদয় বলে কোন জিনিষই দাওনি। কেন, হে ঈশ্বর কেন?

সন্ধ্যা হল। এখন পর্য্যন্ত গ্রামে আর কোনো গণ্ডগোল ঘটেনি। সন্ধ্যার পরেই প্রবীর আর মৌলানা বেরোল টহল দিতে। মাঝরাতের পর থেকে দেবে অন্য দুজন।

পায়চারী করতে করতে হঠাৎ প্রবীরের খেয়াল হল যে আজ রাত্রে নিমন্ত্রণ আছে। শিখার নিমন্ত্রণ। কিন্তু আর কি যাওয়া যায়? হয়ত ব্যবস্থা করা যায়—কিন্তু তা হয় না। চারটি খাবার জন্য যে নিমন্ত্রণ তার চেয়ে বড় কাজের ভার পড়েছে তার উপর। না, সে আর আজ যেতে পারবে না। কাল পরশু একবার গিয়ে না হয় ক্ষমা প্রার্থনা করে আসবে প্রবীর। আজ সে দুঃখিত, ভারী দুঃখিত।

৬

ঘড়ির কাঁটাটা ভারী অবাধ্য। এগিয়েই চলেছে। অথচ সময় উত্তীর্ণ হতে চলেছে। প্রবীর আসেনি এখনো।

বিভাবতী জিজ্ঞেস করলেন একবার, "কি রে, ছেলেটি যে এল না ?"

শিখা দ্রুতকণ্ঠে বলল, "আসবে আসবে, এখনি হয়ত আসবে।"

"আসলেই ভাল মা, সকলেরই খাওয়া হয়ে গেল, আর দেরী হলে সব যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

ঘর আর বার। বারংবার শিখা পায়চারী করে বেড়ায়। তাকায় ঘড়ির কাঁটার দিকে। যন্ত্রটা নির্ব্বিকার ভাবে ঘুরে চলেছে।

অভ্যাগতদের খাওয়াদাওয়ার একবার তদারক করে শশাঙ্কবাবু বাইরের ঘরেই এসেছিলেন। বারংবার শিখাকে ভিতর থেকে বাইরে এবং বাইরের থেকে ভিতরে যেতে দেখে এবার মুখ তুলে তাকালেন। শিখার মুখে প্রতীক্ষার ছায়া।

"কি হয়েছে শিখা ?"

"কৈ, কিচ্ছু না তো।"

"মনে হচ্ছে কারো অপেক্ষায় রয়েছিস তুই।"

"হ্যাঁ, প্রবীরবাবুর।"

যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল, "প্রবীর !—প্রবীর ?"

"হ্যাঁ।" দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করল শিখা।

শশাঙ্কবাবু শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে বললেন, "বটে! তা আমায় একবার বল্লে কি হত ?"

"আপনি যে তাঁর উপর ভয়ঙ্কর চটা।" বাপের নূতন প্রশ্নগুলোকে এড়াবার জন্যই শিখা ভিতরে চলে গেল।

শশাঙ্কবাবু বিস্ময়ে ক্রোধে স্তব্ধ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণের জন্য।

ছট্‌ফট্‌ করছে শিখা।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়েই চলেছে।

এখনো এল না প্রবীর?

টিক্ টিক্ টিক্ টিক্।

আজ যে শিখা নিজে রেঁধেছে! আজ যে সে সহজ অনাড়ম্বর ভাবে বেশভূষা করেছে! অথচ প্রবীর আজ এল না!

ঘড়িটা চলছে। টিক্ টিক্ টিক্ টিক্। সময় পার হয়ে গেছে।

হঠাৎ যেন দেহে আর মনে আগুন জ্বলে উঠল। ক্রুদ্ধ সর্পজিহ্বা মেলে সেই আগুন যেন তার মনের সমস্ত রস ও কোমলতাকে লেহন করে নিল। শুধু রইল একটা অপরিসীম জ্বালা। অপমান, প্রবীর তাকে অপমান করেছে! তার ভিক্ষুক বৃত্তিকে, তার কাঙাল-পনাকে প্রবীর উপহাস করেছে।

শেষবারের জন্য সে বাইরে গেল।

শশাঙ্কবাবু তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে।

তিনি এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "প্রবীরকে কেন নেমন্তন্ন করেছিলে তুমি?"

শিখা যেন ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত খাড়া হয়ে উঠল, "লোকটিকে আমার ভালো লেগেছিল।"

শশাঙ্কবাবু কেঁপে উঠলেন, "সেটা খারাপ কথা নয়, আসলে সে আমার শত্রু, আমাকে অনেক অপমান করেছে এবং করছে। তাই তাকে ডাকার আগে একটা কথার কথাও আমাকে বলা উচিত ছিল শিখা।"

শিখা কর্কশ হাসি হাসল, "আপনার শত্রু! আপনি এত বড় একজন জমিদার-তাকে আপনি জব্দ করতে পারেন না?"

"পারি বৈকি—"

"ছাই পারেন। আপনাকে অপমান করেছে, আমাকেও কি বাদ দিল—"

"মানে?" শশাঙ্কবাবু এগিয়ে এলেন কাছে।

"মানে আজকের নেমন্তন্নকে সে উপেক্ষা করেছে—সে এল না।"

"বটে! তাইত—"

"শত্রু! আপনার ছাই ক্ষমতা আছে বাবা—আপনি ওর কাছেও হার মেনেছেন"—

"শিখা!"

"রাগ হচ্ছে? বেশত, অপমানের শোধ নিন্, শত্রুর গলা টিপে তাকে জব্দ করে দিন। তবেই বুঝি—"

শিখার চোখ দুটো ধারালো ছুরির মত ভয়ঙ্কর ভাবে ঝক্ ঝক্ করছে।

প্রায় দৌড়েই সে ঘরের ভিতর চলে গেল।

শশাঙ্কবাবু মেয়ের দিকে তাকালেন। বয়সের অভিজ্ঞতায় মেয়ের মনের কথা আজ একমুহূর্ত্তে তিনি জানতে পারলেন। হ্যাঁ, প্রবীর শত্রু। তাকে সরাতেই হবে। নইলে আরো অপমান সইতে হবে শশাঙ্কবাবুকে। নইলে তার যে রূপসী ও শিক্ষিতা মেয়েকে তিনি আই, সি, এস্ ও ডেপুটি পাত্রের হাতে দেবার স্বপ্ন দেখেন সেই মেয়েই হয়ত একদিন এই অট্টালিকা আর ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির জগৎ থেকে বেরিয়ে যাবে। বেরিয়ে যাবে ঐ নিষ্কর্ম্মা ছেলেটার পিছনে, ঐ কম্যুনিষ্ট প্রবীর চৌধুরীর আকর্ষণে। কিন্তু না, তা হবে না, জাল পাতা হয়ে গেছে। প্রবীরকে দু'একদিনের মধ্যেই গ্রাম পরিত্যাগ করে যেতে হবে। না, শশাঙ্কবাবুর কোনো ভয় নেই, তাঁর শিখা বাঁচবে।

ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ রাতটা কেটে চলেছে। না, এখনো পর্য্যন্ত কোনো আর্ত্তনাদ কেউ শোনেনি, এখনো পর্য্যন্ত মানুষের আত্মঘাতী নির্ব্বুদ্ধিতার প্রকাশ আর হয়নি।

কিন্তু শেষ রাত্রে হঠাৎ যজ্ঞ-ভঙ্গ হল। আগুন। কৃষ্ণদাস পালের বাড়ীতে আগুন জ্বলছে।

পালের বাড়ীর প্রায় অর্দ্ধাংশ খেয়ে আগুন নিভ্‌ল। গ্রামের আকাশে সভয় আর্ত্তনাদ আর উত্তেজিত কোলাহল ভেসে বেড়াতে লাগল।

প্রবীর বল্‌ল, মৌলানাসাহেব, কাজ আরো বাড়ল।"

মৌলানা হাসল, "বাড়ুক, নেশা চেপে গেছে, এ পাপ থামাবই।"

বিকেলের দিকে শোনা গেল যে শহর থেকে আটজন অতিরিক্ত পুলিস এসেছে। আরো শোনা গেল যে কৃষ্ণদাস পালের বাড়ীতে যে আগুণ ধরিয়েছিল তাকেও ধরা হয়েছে। লোকটার নাম খলিল। সে মজুর বস্তীতে থাকে। মৌলানা, সুব্রত প্রভৃতি আজও পাহারা দিচ্ছে। রক্ষীদলের সংখ্যা আজ বাড়ানো হয়েছে, গৃহস্থদের সতর্ক ও সজাগ থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে।

ইউনিয়নে সভা বসল সন্ধ্যের পর। একজন শ্রমিক, ইউনিয়নের একজন সভ্য নিহত হয়েছে, একজন সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যেও কি দাঙ্গার বিষ ছড়িয়ে পড়বে?

কিন্তু না, ভয় অমূলক। নিয়মের ব্যতিক্রমটাই নিয়ম নয়।

গণি মিঞাকে যেন চেনাই যায় না; তারি অনুরাগীদের মধ্য থেকে

একজন গিয়ে দাঙ্গায় যোগ দিয়েছে, নিরীহ মানুষের ঘরে আগুন ধরিয়েছে, এই লজ্জায়, এই দুঃখে সে যেন মুষ্‌ড়ে পড়েছে। সাময়িক ভাবে টাকার লোভে সে শশাঙ্কবাবুর বিরুদ্ধে না গিয়ে ধর্ম্মঘটকারীদের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে সে শুধ্‌রে নিয়েছিল, ধর্ম্মঘটেও যোগ দিয়েছিল। আর যাই করুক না কেন, দাঙ্গার মধ্যে সে যাবে না। অথচ তার একজন সঙ্গী তা গিয়েছে। এ লজ্জা, এ দুঃখ গণিমিঞাকে পীড়া দিচ্ছে। বারংবার সে নিজের মনের ক্ষোভকে ব্যক্ত করতে লাগল।

হঠাৎ সভায় চাঞ্চল্য জাগল। নিঃশব্দপদে ইদ্রিস খাঁ এসে হাজির হয়েছে, সঙ্গে দুজন পুলিস। একপাশে এসে সে চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল।

প্রবীর হেসে আহ্বান জানাল, "আসুন—বসুন দারোগাসাহেব—"

ইদ্রিস খাঁ গম্ভীরভাবে বলল, "সে হবেখ'ন, আপনাদের কাজ চলুক তো!"

প্রবীর উঠে বক্তৃতা শুরু করল।

"বন্ধুগণ! কথা বলতে উঠে সবচেয়ে প্রথমে আজ গ্রামের দাঙ্গার কথাটাই মনে পড়ছে। আমাদের ইউনিয়ন শ্রমিকদের—নির্য্যাতিতের। আমাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান দুই-ই আছে—কিন্তু সে পরিচয়ের চেয়েও বড় পরিচয় আমাদের আছে। আমরা মানুষ। মানুষ হিসেবে প্রতি মানুষের অপর মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। প্রতি মানুষের সঙ্গেই অপর মানুষের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আমাদের গ্রামে যেন তা সবাই ভুলে গেছে। একই দেশের বাসিন্দা আমরা—একই মায়ের সন্তানের মত—ভাই ভাই। কিন্তু তবু রক্ত পড়ছে, আগুন জ্বলছে। কিন্তু বন্ধুগণ! আসল কথা আমরা কেউ ভাবি না"—

প্রান্তরের গান

ইদ্রিস্ খাঁ নোটবুকে প্রবীরের বক্তৃতা লিখে নিচ্ছে।

সভা নিস্তব্ধ, উৎকর্ণ।

"আসল কথা এই যে আমরা অন্ধ, আমরা অশিক্ষিত। আমরা দৃষ্টিহীনতা ও অশিক্ষার ফলে বুঝতে পারিনা যে আমাদের আসল সমস্যা ধর্ম্ম নয়—পরাধীনতা। সেই একই অন্ধতা ও সঙ্কীর্ণতার ফলে আমরা নিজেদের ভাইদেরই নিজেদের শত্রু বলে ভাবি। কিন্তু কার বিরুদ্ধে আসলে যুদ্ধ করতে হবে তা কি জান?"

গভীর স্তব্ধতা।

ইদ্রিস্ খাঁ যেন হঠাৎ আবেগে দুলছে মৃদুমন্দ। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতবেগে সে কলম চালিয়ে যাচ্ছে। পিছনে পুলিস দুটো প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল।

"আমাদের আসলে যুদ্ধ করতে হবে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে। বন্ধুগণ, নজর ফিরাও। তোমাদের দৃষ্টি পড়ুক সত্যিকারের অত্যাচারীর উপর—যে তোমাদের শত শত বৎসর দাবিয়ে রেখেছে, তিলে তিলে তোমাদের প্রাণরস শোষণ করে নিচ্ছে। তারা শুধু পরাধীন ভারতবাসীরই শত্রু নয়—নির্য্যাতিতেরও শত্রু। বন্ধুগণ, যদি লড়াই করতে হয়, যদি রক্তই ঢালতে হয়—"

অকস্মাৎ বজ্রকণ্ঠে ইদ্রিস্ খাঁ গর্জ্জে উঠল, "থামুন—কলিমুদ্দিন, এনায়েৎ, যাও ওকে গ্রেপ্তার কর্।"

"বন্ধুগণ, সেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধেই তোমাদের এগোতে হবে। যদি তাদের লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করতে পার তবে স্বাধীনতা আর সাম্য দুই-ই পাবে। শেষ কথা এই যে সাম্য ও স্বাধীনতা পেলেই আমাদের সব দুঃখ দূর হবে।"

ইদ্রিস্ খাঁ এগিয়ে এল, "নেমে আসুন—"

শ্রমিকেরা মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত থেকে হঠাৎ কলরব করে প্রতিবাদ জানাল।

"চোপ্—চোপ্‌রও—এ মিটিং বেআইনী। এতগুলো লোক ডেকে সভা করার আগে কার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল?"

আবদুল রুখে উঠল, "এ ইউনিয়ন—এরা সবাই শ্রমিক—নিত্যই ওরা এখানে আসে।"

ইদ্রিস্ কুটিল মুখভঙ্গি করে বলল, "যুদ্ধ লেগেছে, সেটা মনে রেখো। এতদিন যা হয়েছে তা আর হতে পারবে না। প্রবীরবাবু, নেমে আসুন—"

"কিন্তু কি অভিযোগে আপনি আমায় গ্রেপ্তার করছেন—শুনতে পারি কি?" প্রবীর হেসে প্রশ্ন করল।

"স্বচ্ছন্দে। প্রথম অভিযোগ—বে-আইনী সভায় বক্তৃতা। দ্বিতীয় অভিযোগ—আপনার বক্তৃতা রাজদ্রোহাত্মক—আপনি কম্যুনিষ্ট। তৃতীয় অভিযোগ—আজকে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দাঙ্গা উপলক্ষ্যে সেই খলিল জানিয়াছে যে আপনিই নাকি এই দাঙ্গার পিছনে ছিলেন।"

যেন আকাশটা ভেঙ্গে পড়লো। ক্ষোভে, লজ্জায়, দুঃখে সমস্ত শ্রমিকেরা যেন কথা বলবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। এমন সুগভীর নিস্তব্ধতা চারদিকে ঘনিয়ে এল যে একটা ছুঁচ পড়লেও বোধ হয় তার শব্দ শোনা যাবে। যাদের স্বার্থের জন্য এই প্রবীর লড়াই করেছে সেই শ্রমিকদেরই একজন আজ এমন অবিশ্বাস্য ও ঘৃণ্য অপবাদ দিল! যে প্রবীর সর্ব্বপ্রথম দাঙ্গা থামাতে গেল, থামাবার জন্য সকলের কাছে দৌড়োদৌড়ি করে রক্ষীদল খাড়া করল তারি উপর এমন জঘন্য অপবাদ!

গণি মিঞা চিন্তিতভাবে বলল, "নিশ্চয়ই কেউ খলিলের পিছনে আছে— নইলে এমন নির্জ্জলা মিথ্যে সে কি করে বলে ?"

আবদুল মাথা নাড়ল, "হুঁ—বুঝতে পেরেছি—"

"নেমে আসুন প্রবীরবাবু—"

"একবার বাড়ী যেতে দেবেন না ?"

"দরকার কি ? আপনার সব ব্যবস্থাই আমি করে দেব। মিথ্যে সিন ক্রিয়েট্ করে করবেন কি ? এমনিই চলুন না—তাছাড়া ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে, আপনাকে এখুনি সদরে যেতে হবে।"

"এখুনি ! ওঃ—সবই আগে থেকে তৈরী ছিল তাহলে ?"

"যা ভাবেন।"

আবদুল বলল, "আমরাও যার কম্‌রেড—"

প্রবীর মাথা নাড়ল, "পাগল ! গ্রামকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচাও আগে। সুব্রতকে খবর দিও, বাড়ীতেও খবর দিও এবং আমার বুড়ী পিসীর খোজখবরটা নিও।"

"প্রবীরবাবুর জয়"—হঠাৎ আবেগ কম্পিত একটা জয়ধ্বনি উঠল। আবদুল, তাহের আর অবিনাশের চোখে জল এসেছে।

"আচ্ছা, আসি তবে। যাবার আগে বলে যাই যে তোমরা থেমো না—তোমাদের অনেক আঘাত এবার সইতে হবে—তোমাদের এখনো অনেক কাজ বাকী।"

"চলুন প্রবীরবাবু, দেরী করবেন না।"

"বন্ধুগণ, বিদায়।" প্রবীর নীচে নেমে গেল।

নিঃশব্দে জনতা তার অনুস ণ করল। যেন কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু হয়েছে এবং শোকাতুর শবযাত্র চলেছে তার শবাধারের পিছনে পিছনে।

মাথার উপরকার অন্ধকার আকাশের নক্ষত্রগুলো যেন বেদনায় আজ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

খবর পৌঁছোল যথাসময়ে।

উল্লাস, দুর্নিবার উল্লাসের বন্যায় শশাঙ্কবাবুর হৃদয় প্লাবিত হয়ে গেল। প্রতিশোধ নিয়েছেন তিনি, শত্রুকে দমন করেছেন। প্রবলের প্রতাপ এখনো শেষ হয় নি।

"শিখা—শিখা—ওমা শিখা"—সোল্লাসে, চীৎকার করে তিনি ডাক দিলেন।

অপমান! শুধু জমিদারকে নয়, মিলের মালিককে নয়; জমিদার-নন্দিনী, অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদের অধিকারিণী শিখাকেও লোকটা অপমান করে! কি স্পর্দ্ধা! কিন্তু সব অপমানের প্রতিশোধ আজ একসঙ্গেই নেওয়া হয়েছে। আঃ! ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র রক্তপান করে যেমন তৃপ্ত হয় তেমনি তৃপ্তির একটা সুনিবিড় ছায়া শশাঙ্কবাবুর মুখে চোখে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। আঃ!

"শিখা—শিখা"—আবার তিনি ডাকলেন।

ক্লান্তপদে শিখা এসে সামনে দাঁড়াল। অপরিসীম ক্লান্তি ওর মুখে, উদাস দৃষ্টিতে কোনো জ্যোতি নেই।

"কি বাবা?"

"খবর জানিস? শুনেছিস্?"

"কি খবর?" নিস্পৃহকণ্ঠে শিখা প্রশ্ন করল।

"সেই রাস্কেল—সেই প্রবীর চৌধুরীকে আজ শিক্ষা দিলাম, তাকে আজ জব্দ করলাম—"

"এ্যাঁ!" হৃদ্‌পিণ্ডটা হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল।

"হ্যাঁ। শোধ নিয়েছি—সেই লোফারটাকে আজ পুলিশ গ্রেপ্তার

করেছে। সিডিশন আর দাঙ্গার জন্য। এইমাত্র সহরে চালান হল সে—হাঃ—হাঃ—হাঃ”—

পরিতৃপ্ত রাক্ষসের মত শশাঙ্কবাবু হাসতে লাগলেন।

“বটে!” শুষ্ক কণ্ঠে শিখা বলল।

“হ্যাঁ—খুশী হয়েছিস্ কিনা? নির্ঘাত দু’বছর শ্রীঘর বাস এবার—হাঃ—হাঃ—হাঃ”—

“খুশী! হ্যাঁ, হয়েছি বাবা। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পেয়েছে লোকটা—বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে। শোন বাবা”—

“কি?”

“আমি কাল ঢাকায় যাব। এখানে আর ভাল লাগছে না আমার—আর এখানে থাকতে পারব না আমি।” শিখা ঘুরে দাঁড়াল। একটা চেয়ারে হাত দিয়ে সে সামলে নিল নিজেকে। মাথাটা ঘুরছে। তারপর টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

ওসব লক্ষ্য করবার সময় নেই শশাঙ্কবাবুর। আজ তিনি শত্রু-হনন করেছেন। এই আনন্দময় মুহূর্ত্তে একটা চুরুট ধরাতে হবে। তিনি ড্রয়ার খুললেন।

ঘরের মধ্যে গিয়ে শয্যাপার্শ্বে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল শিখা। যেন ভাবতে চেষ্টা করল কি হয়েছে। ভাবল সে। প্রবীরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্ঘাত দু’বছরের শ্রীঘর বাস। বেশ হয়েছে।

হঠাৎ শিখা কাঁপতে কাঁপতে বিছানার উপর বসে পড়ল। কিন্তু কাঁদল না সে। শুধু বসে রইল, সামনের দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিটাকে নিবদ্ধ করে চুপ করে বসে রইল সে, একটুও কাঁদল না। কাঁদলেই বোধ হয় ভাল হত, কিন্তু শিখার চোখে আর জল নেই, বুকে আর কান্নার বাষ্প নেই, একটা অন্তর্দাহী জ্বালায় তার সব কিছু এখন মরুভূমির মত ভয়াবহ

ও রিক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু একি হল? শিখা কি জানত এমন ঘটনা ঘটবে? শিখা কি তাই চেয়েছিল?

ওখানেও দুঃসংবাদটা পৌঁছোল।

ঘরের ভিতর তখন আলোচনা চলছে। সমবেদনা ও ভালবাসা প্রত্যেকের কণ্ঠে। সবাই বলছে যে প্রবীরকে বাঁচাতে হবে।

কিন্তু কি হবে এসব কথা শুনে? প্রবীরকে ত' ধরে নিয়ে গেছেই।

না, সে আর থাকতে পারছে না ঘরের মধ্যে। এখুনি হয়ত সে আর্ত্তনাদ করে উঠবে।

সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দপদে মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নিজের ঘরে গেল সে, মেঝের উপর বসল। প্রবীরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রবীর নেই, এ গ্রামে এখন প্রবীর নেই। তিন দিন ধরে প্রবীরকে আর দেখেনি মাধবী। তিন দিন—যেন তিন যুগ। সেই তিনদিন আগের কথা মনে পড়ল। উত্তেজিত মস্তিষ্কে, অভিমানভরে কত কি অন্যায় কথা সে প্রবীরকে বলেছিল। অথচ প্রবীরের দোষ কি? শিখার চোখের চাহনিতে ভালবাসা লেখা ছিল বটে, কিন্তু তাতে প্রবীরের কি দোষ? প্রবীরকে ত' সবাই ভালবাসবে। সূর্য্যকে কে না চায়? ফুলকে কে না ভালবাসে? কোকিলের গান কার না ভাল লাগে? তিন দিন ধরে মাধবী প্রবীরকে আর দেখে নি। দাঙ্গা না হলে সে নিজে গিয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করে আসত, প্রবীরের পা ধরে কাঁদত। উঃ, কত কথাই না ছিল তার! কিন্তু হল না, কিছুই বলা হল না। শুধু তাই নয়, প্রবীরকে নিয়ে গেল জেলে, অনন্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে সে

সেখানকার অন্ধকারে। সেই জেলে যাবার আগে মাধবী প্রবীরকে দেখতে পেল না! কি করে কাটবে মাধবীর দিন? মাধবীর রাত? কি করে বাঁচবে মাধবী এখন থেকে? কেউ কি বলতে পারে? না, কেউ বলতে পারে না। মাধবীর দুঃখ মাধবীরই একা। হঠাৎ মাধবী মেঝের উপর শুয়ে পড়ল। তার শরীরটা কাঁপতে লাগল। ঝঞ্ঝা-তাড়িত নব-মালতী-লতার মত। একটা চাপা গোঙানী শব্দ বেরোতেই সে মুখের মধ্যে আঁচল গুঁজে দিল। মাধবী নিঃশব্দে কাঁদবে। সে তার কান্না কাউকে শুনতে দেবে না, কাউকে না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আবদুল ফিরে যাচ্ছিল বস্তীর দিকে। মৌলানার বাড়ী থেকে সে ফিরছিল। প্রবীরকে বাঁচাতে হবে।

মসজিদের সামনে দিয়ে চলতে চলতে সে সান্ধ্য আজানের ধ্বনি শুনতে পেল। হাজীসাহেবের কণ্ঠস্বর বড় মিষ্টি, বড় গম্ভীর। বাতাসে ভেসে গেল সে ডাক, আকাশের পথ বেয়ে দূরে দূরান্তরে চলে গেল। আল্লাহো আকবর—

আবার আখড়ার সামনে। আখড়াতে সান্ধ্য আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে, ধূপের ধোঁয়া উড়ছে। সে শব্দ, সে ধোঁয়াও বাতাসে ভেসে যাচ্ছে, আকাশের পথ বেয়ে দূর-দূরান্তরে চলে যাচ্ছে।

আবদুল থমকে দাঁড়াল। আল্লার বন্দনা আর হরির বন্দনা সেই একই বাতাসে ভেসে যাচ্ছে, সেই একই আকাশ-পথ দিয়ে বিহার করতে করতে অনন্ত রহস্য-লোকের দিকে যাত্রা করছে। একই ঈশ্বরের একই পৃথিবী—তাতে সেই একই রকমের মানুষ। তাদের দেহের আকৃতি এক, তাদের দেহাভ্যন্তরালে একই লাল রক্তের স্রোত, সবই এক। তবু ঝগড়া হল, গরু আর ঘাস থেকে খোদা আর হরি বেরোল, চারটে মানুষ

মরল, দুটো বাড়ী পুড়ল, আর সবাইকে যে বাঁচাতে গিয়েছিল সেই প্রবীরের বিরূদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে ওঁরা জেলে নিয়ে গেল।

হে ঈশ্বর, তোমার বিচার নাকি খুব সূক্ষ্ম? কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রশ্ন এই—তুমি কি আছ?

দিন কাটতে লাগল। দাঙ্গা থেমেছে, গ্রামে আবার শান্তি ফিরে এসেছে। শান্ত, উত্তাপহীন জীবনের চাকা আবার ঘুরছে, পাটকলের বাঁশী আগের মতই বাজছে, দিনের পর রাত কাটছে আর রাতের পর দিন।

কিছুই হল না। সুব্রত আর আবদুল খুব চেষ্টা করল, মৌলানা আর মনোহর মুখুজ্জেও সাক্ষ্য দিয়ে এল। দাঙ্গার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেলেও রাজদ্রোহের অপরাধ থেকে প্রবীর মুক্তি পেল না। ভারত-রক্ষা আইনের মারপ্যাঁচে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য তার কারাবাস হল।

এদিকে শরৎ গেল। হেমন্তও শেষ হল। বাতাসে এল শীতের কম্পন, রৌদ্রের আলো হল কমলানেবুর রসের মত মিষ্টি রসে ভরা।

সেই আলো আর বাতাসে কলাতিয়া গ্রামের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না আর অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ভেসে বেড়ায়।

যে অর্জ্জুন এতদিন নেপথ্যেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে সে এবার এগিয়ে এল। সে বুঝতে পেরেছে, সে জানে যে মাধবী প্রবীরকে ভালবাসে। এতদিন প্রবীর ছিল, তাই মধেবীর কাছ ঘেষতে তার ভরসা হত না। এখন প্রবীর নেই, তাই কারণে, অকারণে সে আজকাল নন্দদের বাড়ী যায়, নানা অছিলায় সে মাধবীকে দেখে আসে।

কোনো দরকার নেই। বিকেলে দোকানে যাওয়া উচিত কিন্তু ভাল লাগে না অর্জ্জুনের যেতে। তাছাড়া দোকান আজকাল তেমন চলছে না, অভাব ঘনিয়ে এসেছে ক্রমশঃ। আসুক, কিন্তু হৃদয়ের এই শূন্যতা যে আরো ভয়ঙ্কর। সে আর পারছে না।

"নন্দ—নন্দ আছিস রে?" অর্জ্জুন ডাকতে শুরু করল।

না, নন্দ নেই। মাধবী এসে দাঁড়াল।

অতৃপ্ত রাহুর ক্ষুধা অর্জ্জুনের চোখে।

"নন্দ নেই মাধু?"

"না।"

"বারে, যখনই আসি তখনই ত' সে বাড়ীতে থাকে না।" অর্জ্জুন একটু হাসবার চেষ্টা করল।

"তাইত দেখছি।" মাধবীর ঠোঁটের কোণে একটু ক্ষীণ হাসি খেলে গেল।

অর্জ্জুনের চোখে পলক নেই। মাধবী কি অপরূপ সুন্দরী! লোকে নন্দ'র বৌয়ের রূপের প্রশংসা করে, কিন্তু অর্জ্জুনের তা অত্যুক্তি বলে মনে হয়। মাধবীর দিকে অর্জ্জুনের মত দৃষ্টি নিয়ে কেউ কি দেখেছে! হরিচরণের ঘরে কোথা থেকে ধরা পড়ল এই আকাশের বিদ্যুৎ?

"হুঁ"—অর্জ্জুন কথা খুঁজছে। আড়ালে খুব জল্পনা কল্পনা করে সে, কাছে এলে সব তার গুলিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। একি বিপদ!

নন্দর মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল। লোক দুজন না থাকলে হয়ত আজ সে নিঃশব্দে ঐ বারান্দায়ে গিয়ে হাজির হ'ত। কিন্তু না—

"কিচ্ছু ভেবোনা ওস্তাদ—আমি বেশ্যা মাগী, আমার আবার মান অপমান কি—এসো এসো—তোমার সেই অপমান আমার গায়ে লাগে নি"—ললিতা ঝক্‌ঝকে দাঁত মেলে হাসল।

নন্দ যেন অগাধ জলে পড়েছে।

লোক দুজন কি যেন অস্ফুটকণ্ঠে বলল, ললিতা হেসে উঠল।

নন্দ পালাল। না, আজ থাক—

আবার কাজললতা। চোখে তার উন্মাদিনীর আবেগ, কণ্ঠে তার পান্‌সে অনুরাগ, তার স্পর্শে একটা পুরাতন শৈত্য। সে সুন্দরী কিন্তু তবু তাতে মোহ নেই। তাছাড়া কাজললতা দিন দিন কেমন যেন বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে দেখতে—সে সন্তানসম্ভবা। ভাল লাগে না বেশীক্ষণ ওকে দেখতে।

অথচ ললিতা—যেন আগুন। ওকে দেখলেই সমস্ত দেহটা যেন জ্বলতে চায়। সে আগুন স্পর্শ করলে একটা অনিবার্য্য জ্বালায় জ্বলতেই হবে। তা নন্দ জানে। কিন্তু তাতে কি? নন্দ'র ভয় নেই। সে নিত্য নূতন রোমাঞ্চকর অনুভূতি চায়। সে চায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্থূল অনুভূতি। সে কবি, সে ভ্রমর, রূপ রস গন্ধ বর্ণের সমারোহে সে নিজেকে মিশিয়ে দেবে। সে পতঙ্গ। আগুনে জ্বলতে পুড়তে তার ভয় নেই।

আর কাজললতা। সে বুঝেছে যে তার সুখের দিনের সূর্য্য এবার অস্তগামী। যে ভালবাসে তার বোধশক্তি বড় তীক্ষ্ণ হয়। একটা কথা, একটা চাহনি, একটু স্পর্শ থেকেই সে সমস্ত কিছু বুঝতে পারে। কাজললতা জ্বলে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, তার বেদনার কোন ওষুধ কেউ দিতে

পারে না। সে ওষুধ শুধু নন্দর হাতে। কাজললতা জ্বলে মরছে—সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যেমন সূর্য্যকান্তমণির আগুন জ্বলে। সে আগুনের শব্দ নেই, ধোঁয়া নেই, ভস্ম নেই। তাই কাজললতার ভিতরের জ্বালা বোঝা যায় না, ধরা যায় না। তবু বেঁচে আছে সে। এত দুঃখের ভিতরেও একটা পরম আশা, একটা অপরূপ সান্ত্বনা আছে তার। তার দেহের মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটছে, তার রক্ত আর মাংস থেকে তিলে তিলে একটি নমনীয় ও কমনীয় প্রাণপুত্তলিকার সৃষ্টি হচ্ছে। সন্তান। সেই সন্তানের জন্যই সে বেঁচে থাকবে।

কিন্তু হরিচরণের বাঁচবার ইচ্ছে ক্রমেই কমে আসছে। নির্ম্মল আকাশের দিগন্ত থেকে হঠাৎ যেমন অপ্রত্যাশিত কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে এবং সমস্ত আকাশকে তা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলে তেমনি ভাবে অভাবের মেঘ হরিচরণের জীবনকাশকে ক্রমেই আচ্ছন্ন ও অবলুপ্ত করে দিচ্ছে। বার্দ্ধক্যে মানুষ চায় বিশ্রাম, মানুষ খোঁজে নিশ্চিন্ততা। হরিচরণের ভাগ্যে সবই বিপরীত হয়ে উঠছে। একটি মেয়ের বিয়ে দিয়েই তার রাতের ঘুম কমে গেছে, এখনো ত' মাধবী আছেই। এদিকে পাঁচ মাস পেরিয়ে ছ'মাস কাটছে, কিন্তু মহাজন নিকুঞ্জসা'র পাঁচশ টাকার কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। হবেই বা কোথা থেকে? কন্যাদায়ের তাড়নায় তার দূরদৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। ধলেশ্বরীর তীরে অবস্থিত, নিকুঞ্জসা'র জমির পার্শ্ববর্ত্তী দশ বিঘা জমিই নিকুঞ্জসা'র কাছে বন্ধক রয়েছে—হরিচরণের সবচেয়ে ভাল ফসল ওখানেই হয়। পৌষের মাঝামাঝি। ধান এবার কাটতেই হবে। ঐ ধানটা বিক্রয় করে যা

পাওয়া যাবে তা সমস্ত নিকুঞ্জসা'কে দিতে হবে। তাতেও সব ঋণ অবশ্য শোধ হবে না, আরো সময় নিতে হবে।

ধানকাটার ব্যাপারে বাপকে সাহায্য করার জন্য নন্দ কারখানা থেকে ছুটী নিল চার পাঁচ দিনের জন্য।

কিন্তু ধান কাটতে গিয়ে এক কাণ্ড হল।

নিকুঞ্জসা'র দু'জন লোক দৌড়ে এল। নিতাই আর গদাধর।

"ধান কাটতে পারবে না।" নিতাই চেঁচিয়ে বলল।

"কেন ?" হরিচরণ কথাটা বুঝতে পারল না।

"মহাজনের হুকুম।"

হরিচরণ হাসল, "কিন্তু কেন বলত ?"

নিতাই একটু উষ্ণভাবে বলল, "সে আমি কি জানি ? টাকা ধার নিয়েছ তুমি—তোমারি ত' এসব কথা বেশী জানা উচিত।"

নন্দ রুখে উঠল, "তা তোমার অত চোখ রাঙানি কেন হে, এঁ্যা ? তোমায় নিষেধ করতে বলেছে, নিষেধ করলে, এবার যাও। আমাদের জমি—আমরা এখন ধান কাটব।"

নিতাই একপা এগিয়ে এসে সোজা দাঁড়াল, "আমরা হুকুমের চাকর নন্দ, আমাদের সব রকম হুকুমই দেওয়া আছে—"

নন্দর চোখ লাল হয়ে উঠল, একটা কড়া কিছু সে বলতে ও করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হরিচরণ বাধা দিল—"থাম্, থাম্—মাথা গরম না করে আগে শুনি ব্যাপার কি ?"

"এর আবার শুনব কি ?"

গদাধর লোকটা একটু ঠাণ্ডা মেজাজের, সে এবার কথা বলল, "দেখ ভাই জমি যে তোমাদের তা আমরা জানি, এদিকে আমরা মহাজনের লোক, আমাদের যা হুকুম করবে, আমরা তা করতে বাধ্য।

তার চেয়ে এক কাজ কর, তোমরা মহাজনের কাছে যাও এখুনি, মহাজন যদি তোমাদের কেটে নিতে বলে তখন এসে ধান কেটে নিও তোমরা।”

হরিচরণ ক্ষণকাল চুপ করে রইল, তারপর নন্দকে বলল, “তাই চল্ নন্দ, হ্যাঁ, গদাধর ঠিকই বলেছে।”

নিকুঞ্জসা'র কাছে গেল তুজনে।

বসন্তের দাগে বিকৃতমুখ নিকুঞ্জ'র খুদে খুঁদে চোখে শয়তানকে দেখা যায়! সে মাথা নাড়ল। সমস্ত আকুতি কাকুতি, আবেদন নিবেদনকে সে বারংবার মাথা নেড়ে উড়িয়ে দিল। না, সে কিচ্ছু করতে পারবে না।

শেষ কথা বলল নিকুঞ্জ, “পাঁচ মাস পেরিয়ে গেছে, ছ'মাসও কেটে চলল, আর দেরী করতে পারব না। এত দয়ামায়া করলে ব্যবসা আমার তুদিনে ফাঁক হয়ে যাবে, আর দয়াই বা তোমায় কি কম করেছি? দশ বিঘা জমি কি এমন জিনিষ? একসঙ্গে পাঁচশো টাকা কে তোমায় দিত শুনি? এখন কিস্তি হিসাবে বা অল্প অল্প করে টাকা আমি নেব না—এক সঙ্গে আমার সব টাকাই চাই। যাক্—শেষ কথা শোন হরিচরণ, তুদিন সময় দিলাম তোমায়, এর মধ্যে যদি সব টাকা শোধ করে দাও তো ভাল, নয় তো ও জমি আর জমির ধান আমার। এতো জাল জুচ্চুরী নয়, তোমরা টিপসই দেওয়া দলিল আছে আমার কাছে, আইন আদালত তো আমারই পক্ষে।”

খুঁদে খুঁদে চোখ তুটো মেলে নিকুঞ্জ একবার নিঃশব্দে হাসল। সে মোটেই কাঁচা কাজ করে না।

শেষ কথার পর নূতন করে আর কোন কথা চলবেনা। হরিচরণ বুঝল কথায় কোনো কাজ আর হবে না।

কিন্তু কাজ হবে যা দিয়ে সে টাকা কোথায়? কিস্তি হিসাবে টাকা

নেবেনা নিকুঞ্জসা। তা হলে একটা ব্যবস্থা না হয় করা যেত। কিন্তু তা হবে না। একসঙ্গে করকরে পাঁচশ' টাকাই নিকুঞ্জসা'র চাই। আর কার কাছে ধার করবে সে? বিনা বন্ধকে কেউ অত টাকা দেবে না। আর বন্ধক দিতে গেলে বাকী সবই বন্ধক দিতে হবে। অর্থাৎ মরতে হবে শুকিয়ে, না খেয়ে।

কিন্তু এত সহজেই কি হাল ছাড়বে হরিচরণ? ঐ সোনার মত, মাখনের মত, মায়ের মত মাটীকে কি এত সহজেই ছেড়ে দেবে সে?

হরিচরণ মাথা নাড়লো। না।

দুদিন সময় আছে। এই দু'দিনের মধ্যে নিকুঞ্জসা হরিচরণের ধানে হাত দেবে না। বেশ। হরিচরণ নন্দকে ডাকে, অর্জ্জুনকে ডাকে, অনেকক্ষণ ধরে কি সব যেন বলাবলি করে আর ভাবে।

দ্বিতীয় দিন সকালবেলায় নিতাই আর গদাধর ক্ষেত দেখতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, তাদের বিস্ফারিত চক্ষুতারকায় বিস্ময় ফুটে উঠল। একি, একি ব্যাপার?

হরিচরণের দশ বিঘা জমির এক কণা ফসলও নেই। রাতারাতি সে সব ফসল কেটে নিয়ে গেছে।

নিকুঞ্জসা'র কাছে খবর গেল। তার খুঁদে খুঁদে দুটো চোখে যেন শয়তানের রক্ত-দৃষ্টি। সে শুধু আক্রোশে একবার একটা অশ্লীল গালিবর্ষণ করল হরিচরণের বংশের উপর।

তারপর সে উঠে দাঁড়াল। চারটে তালা-যুক্ত মস্ত বড় সিন্দুকটার লৌহবক্ষ থেকে সে একটা কাগজ টেনে বের করল। হরিচরণের টিপ-সহি-যুক্ত দলিলখানা। কয়েকটা টাকা কোমরে গুঁজে, পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে, ক্যাম্বিসের জুতোটা পরে, ছাতাটা বগলে নিয়ে 'দুর্গাশ্রীহরি'

স্মরণ করে সে বাড়ী থেকে বেরোল। গয়নার নৌকো এখুনি ছাড়বে, নিকুঞ্জসা'কে তা ধরতে হবে। সে সহরে যাবে।

কয়েকদিন বাদে শমন এল হরিচরণের নামে। ফৌজদারী, দেওয়ানী—ছুটো মোকদ্দমার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে।

খোদার উপর খোদ্‌কারী কি সব সময়ে চলে? বসন্তের দাগে বিকৃত মুখ নিকুঞ্জসা নিজের দাওয়ায় বসে হাহা করে হাসে আর নিতাইকে বোঝায় যে বড়, জোর ছুটো মাস—তারপরেই হরিচরণের ওই দশ বিঘা জমির মালিক হবে শ্রীল শ্রীযুত নিকুঞ্জমোহন সাহা, মহাজন, সাং ও থানা কলাতিয়া, জেলা ঢাকা। নিকুঞ্জসা স্বপ্ন দেখে। সকলের স্বপ্ন সব সময়ে হয়ত ফলে না, কিন্তু নিকুঞ্জসা'র স্বপ্ন ফলবে।

গ্রামে একটা নূতন উত্তেজনা এল। কয়েকদিনের জন্য সুভাষচন্দ্রকে জেল থেকে বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য মুক্তি নয়। হঠাৎ ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তিনি নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন। পুলিশ ও গোয়েন্দারা কিছুই করতে পারেনি। ঘরে ঘরে, দাওয়ায়, দাওয়ায় উত্তেজিত আলোচনা চলল। একটা কিছু আসন্ন।

প্রান্তরের গান

ফাল্গুনের শেষ। শীতের কুহেলিকা স্বপ্নের মত উড়ে গেছে, বাতাসে এসেছে চাঞ্চল্য, রৌদ্রে এসেছে উত্তাপ। মধ্যাহ্নে বায়ুবেগ প্রখর হয়, ধূলো ওড়ে, শুকনো পাতা খসে পড়ে, আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরে, প্রজাপতি উড়ে যায়, কোকিলের ডাক শোনা যায়। ভৈরব তালের সঙ্গে বসন্ত রাগিনীর আলাপ চলতে থাকে।

আজ হোলি। রং আর আবীরের খেলা হবে আজ। রঙের স্পর্শে হৃদয়ও আজ রঙীন হয়ে উঠবে। আজ ছুটী, আজ আর পাটকলের বাঁশী আকাশ বাতাস কাঁপাবে না।

নন্দ'র আর ভাল লাগছিল না বাড়ীতে থাকতে। বেশীক্ষণ বাড়ীতে থাকতে আজকাল তার ভারী অস্বস্তিকর ও বৈচিত্রহীন মনে হয়।

জামাটা গায়ে দিচ্ছিল সে।

কাজললতা এসে সামনে দাঁড়াল।

"বেরুচ্ছ?" সে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ।"

"এখুনি বেরোবে? না, এখন যেও না।" কাজললতা হঠাৎ কাছে সরে এসে মৃদুকণ্ঠে আবদার জানাল।

"কেন, এখন বাড়ীতে থেকেই বা কি করব শুনি?" নন্দ কাজললতার আবদার শুনে যেন বিস্মিত হয়ে গেল।

"আজকে যে হোলি গো"—কাজললতা নন্দ'র দুটো হাত ধরল, তারপরে হঠাৎ ভারী মিষ্টি করে হাসল। নন্দ'র যদি আগের মত মন আর দৃষ্টি থাকত তাহলে হয়ত সে মুগ্ধ হয়ে যেত, খুশী হয়ে উঠত। কিন্তু সে নন্দ ত আর নেই—যে নন্দ মধ্যাহ্নের রৌদ্রতাপ ও ঝড়ঝাপটা অগ্রাহ্য করে আর ধলেশ্বরীর প্রখর স্রোতের বিরুদ্ধেও নৌকা বেয়ে তেতুলঝোরায় যেত এবং সুন্দরী বিলের ধারে বসে এই কাজললতার প্রত্যাশাতেই

ছায়াচ্ছন্ন, সংকীর্ণ পথটার দিকে দুচোখ মেলে মন্থর মুহূর্ত্তগুলোকে গুণতে থাকত।

"আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে আজ তুমি কাছে থাক। আচ্ছা, আমার সঙ্গে একটু হোলি খেলতেও কি তোমার ইচ্ছে হয় না?"

ভ্রমর-কৃষ্ণ দুটো চোখের মাঝে একটা আকুল আবেদন।

নন্দ একটু বিরক্ত হয়। অর্থহীন কথা! বৌয়ের সঙ্গে হোলি খেলাটা কি এমন জিনিষ যে তার জন্য পাগল হতে হবে! অবশ্য গেলবারে সে ঠিক বিপরীত কাণ্ডই করেছিল। সেটা মনে পড়ে যায় নন্দর। কিন্তু তাতেই বা কি? নূতন বিয়ের পর সবাই অমন করে থাকে।

তবু সে হাসল, বলল, "তুমি একেবারে ছেলে মানুষ কাজল। তুমি আর আমি ত' আছিই, পালাচ্ছিনা তো কেউ। বাইরে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আগে খেলে আসি।"

কাজললতার হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতটাকে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে নন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অথচ কাজললতার ঐ মৃণাল বাহু আর রক্তিম করতলের সুকোমল ও উত্তপ্ত স্পর্শের জন্য এই নন্দই একদিন কি রকম উস্‌খুস্ করে বেড়াত! সে দিন গেছে, সে দিনের আশা, আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন ঝরা পাতার মত জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। হায়!

রান্নাঘরে বাট্‌না বাটবার যে শিলটা রয়েছে তারি উপর কাজললতার মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে হয়, নিষ্ফল অভিমানে তার ঠোঁট দুটো বারবার কাঁপতে থাকে, বুকের ভিতর থেকে যে দুরন্ত ক্রন্দনাবেগটা উপরের দিকে উঠে আসতে চাইছে তাকে দমন করার জন্য প্রাণপণে কাজললতা দাঁতে দাঁত চেপে ধরে।

নন্দ বেরোল।

বাইরে হরিচরণ চুপ করে বসে ছিল। মাস দুয়েকের মধ্যে হরিচরণের একটা দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়েছে। তাকে দেখলে আজকাল ভয় হয়। বোধ হয় মানুষটার বাঁচবার মিয়াদ কমে আসছে। দু'মাস ধরে মোকদ্দমা চলছে, অজস্র খরচ হয়ে গেছে তার। আবার ধার করতে হয়েছে তাকে, হরিভূষণ গাঙ্গুলীর কাছে আবার পাঁচ বিঘা জমি বন্ধক রাখতে হয়েছে। অবশ্য এবার সে আর ভুল করেনি—এবারকার মিয়াদ বেশী—এক বছরের। কিন্তু যে জন্য এত করা—সেই ধলেশ্বরীর ধারের দশ বিঘা জমির আশা কিন্তু তার আর নেই। যে অদৃশ্য শক্তি পৃথিবীর সব কিছুকে পরিচালিত করে তারি বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে অর্থ—সেই অর্থ নিকুঞ্জসা'র মস্ত বড় সিন্দুকে কম নেই। সুতরাং হরিচরণের পরাজয় সুনিশ্চিত। ঐ দশ বিঘা জমির উপর অচিরেই ডিক্রিজারী হবে। বাকী যা আছে তাতে সংসারের ব্যয়নির্ব্বাহই কষ্টকর হয়ে উঠবে। এখন আশা নন্দ। অথচ নন্দ যা পায় তা সব মোটেই দেয় না, পাঁচ টাকা সাত টাকার বেশী সে কিছুই দেয় না। বাকী টাকা সে খরচ করে ফেলে বিলাসিতায়। ভাবতে গিয়ে মাথাটা হঠাৎ ভোঁ ভোঁ করতে থাকে হরিচরণের, মনে হয় যেন সে একমাস ধরে জ্বরে ভুগছে।

"নন্দ"—ছেলেকে সে ডাকল।

"কি ?"

"পরশুদিন সহরে যেতে হবে—উকীলের কাছে, আমায় পাঁচটা টাকা দিতে পারবি।"

"টাকা ! টাকা ত' নেই—"

ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজললতা নন্দ'র কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে।

"এরি মধ্যে সব ফুরিয়ে গেল?" হতাশকণ্ঠে হরিচরণ প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ।" পরিষ্কার গলায় নন্দ উত্তর দিল।

নিরুপায় হয়ে হরিচরণ স্তব্ধ হয়ে রইল। নন্দ চলে গেল আর তার দিকে তাকিয়ে কাজললতা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

আজ হোলি। বসন্ত-বাতাসে আজ আম্র-মুকুলের সুরভি ভেসে আসছে, আসছে কোকিলের গান আর রঙীন ধূলো। প্রথম যৌবনের তৃষ্ণার্ত্ত আবেগে সব কিছু যেন কাঁপছে চারদিকে। আকাশের নিঃসীম রাজপথ দিয়ে যেন কারা আজ উৎসবে চলেছে—তাদের অস্ফুট কোলাহল আর কলহাস্য যেন কান পাতলে শোনা যায়। কোথায় এক অদৃশ্য রঙ্গমঞ্চে যেন মৃদঙ্গের আওয়াজ হচ্ছে, অপরূপ লাস্যময়ী স্বর্গের মেয়েরা তার তালে তালে নৃত্য করছে। মাঝে মাঝে তাদের তাল যখন উদ্দাম হয়ে উঠছে, তখন তাদের স্বর্ণাঞ্চল দ্রুত আবর্ত্তিত হচ্ছে, বাতাসে একটা দমকা ঘূর্ণী জাগছে তার ফলে আর শুক্‌নো পাতা ধূলো ও উড়ছে—চক্রাকারে—সশব্দে।

আজ হোলি। আজ আনন্দের দিন, উৎসবের দিন।

কিন্তু তাতে মাধবীর কি?

মাথার উপরে ঝক্‌ঝকে আকাশ, ভ্রাম্যমান শুভ্র মেঘের পুঞ্জ, প্রসারিত-পক্ষ চিল, দক্ষিণের বাতাস, কনকচাঁপার মত থোলো থোলো আম্র-মঞ্জরী, মাটীর সুঘ্রাণ। সবই সুন্দর, সবই উৎসবের আনন্দে ভরপুর। কিন্তু মাধবীর প্রাণে আনন্দ নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই। সব আছে তবু কিছুই নেই মাধবীর। কারণ প্রবীর নেই। কোথায় আছে প্রবীর, কি করছে এখন সে? উঁচু উঁচু দেওয়ালের আড়ালে, ছোট্ট

একটি ঘরে বসে কি ভাবছে সে? মাধবীর কথা কি দিনান্তে একবারও স্মরণ করে প্রবীর?

না, মাধবীর মনে কোনো রঙ্ নেই, মাধবী আজ হোলি খেলবে না।

হাঃ হাঃ হাঃ। উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ শোনা যায়। কৃত্রিম ভয় পাওয়ার ভাব দেখিয়ে বাঁচতে চায় লোকেরা কিন্তু পালাতে গিয়েই রঙে ভিজে ওঠে। অনেকে আবার নিদারুণ অসহায়তা উপলব্ধি করে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। একগা রঙ আর একমুখ বাঁদুরে কালি বা আলকাৎরা মুখে নিয়ে অন্তরের প্রচণ্ড ক্রোধকে অমায়িক হাসিতে রূপান্তরিত করতে গিয়ে বিকৃত মুখভঙ্গী করে।

অনেক পদধ্বনি; শুষ্ক মাটীতে লাল, নীল, গোলাপী আর হল্দে রঙের ছোপ্, ক্রোধোক্তি, ঝগড়া, কোলাহল আর হাসি। হাঃ হাঃ হাঃ। হোলি হ্যায়।

অন্তরের অন্ধকার গুহার সেই পশুটা নন্দকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যায়।

ললিতা ঘরের বারান্দায় টলছে। পরণের বাসন্তী রঙের পাৎলা শাড়ীটার উপর গোলাপী আর সবুজ রঙ্ পড়েছে। পানের রসে ঠোঁট দুটো টুক্‌টুকে লাল, অল্প একটু নেশার ঘোরে চোখ দুটো ঢুলুঢুলু।

"এই যে ওস্তাদ, এসো—এসো এসো বঁধু আধ আঁচরে বোস—" সুর করে গান ধরল ললিতা।

একজন এসে হেসে বলল, "রঙ্ দিই ললিতা?"

"এ্যা! দেবে? দাও—কিন্তু কোন্ জায়গায় দেবে বাওয়া?"

নন্দ'র মাথার শিরাগুলো হঠাৎ একসঙ্গে দপ্‌ করে উঠল, সোজা সে উঠে গেল ললিতার ঘরের দাওয়ায়।

"তুমি রং দেবে না ওস্তাদ ?"

"দেব ?"

"হ্যাঁ—দাও।"

নন্দ হঠাৎ ললিতার একখানা হাত চেপে ধরল। যেন পুড়ে গেল সে।

"দেব—আবির ?"

"দাও গো ওস্তাদ—দাও।" ললিতা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে।

এক হাতে ললিতার মাথাটা ধরে, আর এক হাত দিয়ে ললিতার মুখে আবির মাখিয়ে দিল নন্দ। তার পরে দু'হাত দিয়ে তার মুখটাকে তুলে ধরে সে তাকাল। মোহিনীর মত অপরূপ এই ললিতা।

"কি রে নন্দ—ও আবার কি হচ্ছে ?" রাস্তা দিয়ে আসছিল পরেশ, কারখানার সাথী। সেও উঠে এল।

নন্দ একটু লজ্জা পেল, "কিছু না—কিছু না—একটু আবির দিচ্ছিলাম—"

ললিতা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল, "আর একটু ললিতাসুন্দরীর মুখ দেখছিলাম—"

"আমি যাই"—নন্দ নীচে নামতে গেল।

"সন্ধ্যার সময়ে এসো ওস্তাদ, তোমায় নেমন্তন্ন করছি আজ"—হঠাৎ নন্দর হাতটা ধরে মৃদু একটা চাপ্‌ দিল ললিতা।

নন্দ কেঁপে উঠল।

পরেশ বলল, "বিকেলে আমাদের ওখানে গানবাজনার আসর বসবে —মনে আছে নন্দ ?"

"হু"—মাথা নেড়ে কথাটাকে বলল নন্দ।

"আসিস কিন্তু বুঝলি ?"

"হু—আচ্ছা, এখন যাই—"

ললিতা হাত ছাড়ে না, "আমার কথার জবাব চাই।" তার চোখ দুটো জ্বলছে।

যেন কানে কানে কথা বলল নন্দ—"ছাড়—আসব, আসব পরে—।"

ললিতা হাত ছাড়ল। নন্দ মুহূর্ত্তকালের জন্য একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নীচে নেমে গেল।

পরেশও যাচ্ছিল, ললিতা ডাকল।

"শোন—"

"কি ?"

"একটা কাজ করবে আমার ?"

"তোমার কাজ! মুনি ঋষিরা পর্য্যন্ত তোমার কাজ করে দিতে পারলে ধন্য হবে, আমি ত কোন্ ছার—"।

"ঠাট্টা নয়, শোন।"

"বল।"

সব কথা শুনল পরেশ। সে রাজী হল। গানের আসরে আজ একটু ধেনো খাওয়াতে হবে নন্দকে, তার পরে তাকে এনে ললিতা'র ওখানে পৌঁছে দিতে হবে। নন্দ নাকি এককালে ললিতাকে ঘৃণা করত, তার পাপস্পর্শকে সে নাকি সযত্নে পরিহার করত, বেশ্যা বলে তাকে নাকি সে নিদারুণ অপমান করত। সেই নন্দকেই আজ ললিতা মাথা নীচু করাবে। মন্দ কি!

দুপুরবেলায় নন্দ ফিরে এল।

কাজললতা একটু আবির নিয়ে এল। নন্দ'র পায়ে দিয়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করল।

"থাক্—থাক্, হয়েছে, সুখী হও" —নন্দ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

কাজললতা স্থির দৃষ্টি মেলে নন্দ'র দিকে তাকাল।

"সুখী হব ?" কাজললতা বিষন্ন হাসি হাসল, "তুমি যদি আমার উপর বিরূপ হও তবে কি করে সুখী হব ?"

নন্দ হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠল, "কেন ? আমি তোমার উপর বিরূপ কেন ?"

কাজললতা মুখ ফিরিয়ে নিল।

নন্দ কাজললতার দিকে তাকাল। সে এখন কি বিশ্রী হয়েছে দেখতে ! গাল দুটো ভেঙ্গে গেছে, চোখে ফুটে উঠেছে গরুর মত একটা অসহায় ড্যাবডেবে ভাব, দেহটা হয়েছে সৌষ্ঠবহীন। অথচ ললিতা ? নন্দ মুখ ফিরিয়ে নিল।

"কি করে বুঝলে যে আমি তোমার উপর বিরূপ ?"

কাজললতা মাথা নীচু করে বলল, "আমি কি মানুষ নই যে বুঝব না ?"

"বটে ! খুব যে কথা বলতে শিখেছ আজকাল। বুঝেছ, কি বুঝেছ শুনি ?"

"তুমি আমাকে আর ভালবাসনা।"

হঠাৎ কাজললতা কেঁদে ফেলল। মুখে হাতচাপা দিয়ে কান্না চাপতে গিয়ে তার শরীরটা থর থর করে কাঁপতে লাগল।

নন্দ'র ক্ষমতা কমে গেল সে কান্না দেখে। একটু অনুতাপও হল তার। বেচারী ! ওকে কাঁদিয়ে লাভ কি ? তাছাড়া ও ত' ঠিক দোষী

নয়। আসলে যে পরিবর্ত্তন তার মনে ঘটছে তার কারণ কাজললতা নয়, সে নিজেই। সে কারণ তার নূতনের মোহ, সে কারণ ললিতার ভয়ঙ্কর আকর্ষণ।

"কেঁদো না—ছিঃ—ওঠ"—নন্দ তাকে থামাতে চেষ্টা করল। তবু কাজললতার কান্না থামেনা।

"ওঠ"—নন্দ কাজললতাকে টেনে তুলল, কাজললতা তার বুকে লুটিয়ে পড়ল।

আবার সেই পান্‌সে অনুরাগ, মিন্‌মিনে কান্না। তবু আদর করতে হবে, মিষ্টি কথা বলতে হবে, একটি চুম্বন এঁকে দিতে হবে এই ক্রন্দনরতা বধূটির মুখে। আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নন্দ ললিতার কথা ভাববে, কাজললতাকে আলিঙ্গন করলেও সে মনের দিক থেকে দূরে সরে যাবে তার কাছ থেকে। না, আর উপায় নেই। নন্দ'র মনে একটা পচন ধরেছে।

তবু নন্দ বলল, "ভালবাসি না? পাগল—তুমি পাগল—বাসি, ভালবাসি বৈকি।"

কোলাহল, শব্দ, গান আর আবীরের ছড়াছড়ি। তার মধ্যে মাথার ঠিক থাকে না নন্দর। তারি এক ফাঁকে পরেশ প্রলোভন দেখায়, বারংবার অনুরোধ করে। আজ হোলি, আজ উৎসব। আচ্ছা, বেশ। এক পাত্র ধেনো গিলল নন্দ। কণ্ঠনালী থেকে জঠর পর্য্যন্ত একটা বিচিত্র অগ্নিজ্বালায় জ্বলতে লাগল। তিক্ত স্বাদে পূর্ণ মুখে কিছু ঘুগ্‌নি-

দানা ফেলে দিয়ে সে পরেশের দেওয়া একটা সিগারেট ধরিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

সবাই ধরল, "নন্দ, তোকে এবার গাইতে হবে।"

"বহুৎ আচ্ছা বাবা"—

গান সুরু হল। একটার পর একটা গেয়ে চলল নন্দ।

ইতিমধ্যে সেই অনিবার্য্য ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। একটা অদ্ভুত ও নূতন অনুভূতি।

গান শেষ হতেই পরেশ তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল।

"কি রকম লাগছে ওস্তাদ?"

"বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।"

"আর কিছু না? একটুও কি আমেজ পাচ্ছ না?"

"তা পাচ্ছি বৈকি একটু আধটু।" নন্দ হাসল।

"আর একটু খাবি?"

"না—না।"

"খা না শালা—কথা রাখ্।"

"না মাইরি"—

কিন্তু খেতেই হল আর একটু।

"ললিতার নেমন্তন্নের কথা মনে আছে ত?" কানের কাছে মুখটা নিয়ে এলো পরেশ।

"এ্যা!"

"ললিতা।"

ঠিক বটে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

"যাবি না?"

"যাব?"

"নিশ্চয়ই। চল্।"

মিথ্যে একটা অছিলা করে আড্ডা থেকে বেরোল দুজনে।

ঠিকভাবে পা পড়ে না। কণ্ঠনালী, বুক আর জঠর আবার জলছে। হাত, পা আর দেহের গ্রন্থিগুলো যেন হঠাৎ আল্‌গা হয়ে গেছে, ওরা যেন আর মনের অধীনে নেই, ইচ্ছেমত ভঙ্গী করছে। সমস্ত রক্তস্রোতে, স্নায়ুতে, শিরাতে একটা ঝিম্‌ঝিমানি ভাব, কি যেন শর্‌শর্ করে বার্‌বার উঠছে আর নামছে তা দিয়ে। দৃষ্টি স্তিমিত, চেতনা আচ্ছন্ন, মস্তিষ্ক যেন নেই। নেশা।

"কি রকম লাগছে র‍্যা নন্দ?"

"ভাল—ভাল লাগ্‌ছে বাওয়া।"

"টলছিস্ যে রে?"

"ধ্যেৎ, কে যেন টলাচ্ছে তাই।"

"হাঃ হাঃ হাঃ"—

আখড়া থেকে খোল করতালের তুমুল শব্দ ভেসে আসছে। হোলি হ্যায়।

ললিতার বাড়ী।

বারান্দার সামনে তিনচারজন হল্লা করে গল্প করছিল। ললিতা'র সঙ্গে।

পরেশ আর নন্দকে দেখে ললিতা বলল, "তোমরা এসো বাবা—আমার অতিথি আছে।"

"অতিথি! কেমন অতিথি গো?" একজন হেসে প্রশ্ন করল।

পরেশ নন্দকে বলল, "দাঁড়া—ওরা যাক্!"

"আচ্ছা বাওয়া"—অন্ধকার যেন আরো অন্ধকার হয়ে উঠেছে নন্দর কাছে।

"অত খবরে তোমার দরকার কি মুখপোড়া ? এবার যাও দেখি"—ললিতা লোকগুলিকে বলল।

"আচ্ছা বাবা, রাগ করো না, যাচ্ছি।"

ওরা চলে গেল।

পরেশ নন্দ'র হাত ধরে টান দিল।

"এসো—এসো, তোমারই পথ চেয়ে আমি বসে ছিলাম ওস্তাদ।" ললিতার কণ্ঠে ঈষৎ জড়তা।

নন্দ বারান্দায় উঠল।

পরেশও উঠছিল, ললিতা তার কাছ ঘেষে মৃদুকণ্ঠে হেসে বলল "আজ অমি আর ওস্তাদ পরেশ।"

"বটে!"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা। ওরে নন্দ—তুই থাক্, আমি আসছি, আমার কাজ আছে।"

পরেশ চলে গেল।

"ভিতরে এসো।" ললিতা আহ্বান করল।

"চল।"

নন্দ ভিতরে ঢুকল। ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে ললিতার ঘর। এককোণে ছোট্ট একটি তক্তাপাষের উপর শুভ্র শয্যা। দেওয়ালে তিনচারটা পট আর একটা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির ছবি। আল্‌নাতে কোঁচানো শাড়ী, জামা। এককোণে দুটো বাক্স। সব কিছু নিখুঁত, সুসজ্জিত।

"বোস।"

"তোমার ঘরটা দেখ্‌তে তো বেশ চমৎকার ললিতা।"

"তাই নাকি ? ভাল, এবার বোস দেখি, এই আসনটাতে বোস।"

"কি ব্যাপার—খাওয়াবে ?"

"হ্যাঁ—আজ নেমন্তন্ন যে।"

"ওঃ"—

"ঘেন্না হচ্ছে বেশ্যার হাতে খেতে ?"

"তা থাকলে আসতামই না ললিতা।"

"তবে খাও"—

"খাচ্ছি।"

খাওয়া হোল।

ললিতা মস্‌লা দিল এনে।

"সবই জান দেখছি।" মত্তচক্ষু মেলে নন্দ হাসল, তার স্বর কাঁপছে। নিরুত্তরে ললিতা দরজার কাছে গেল, খিলটা লাগিয়ে দিল।

"দরজা বন্ধ করলে ?" নন্দ ঘাম্‌তে আরম্ভ করল। হঠাৎ এক ঝলক রক্ত যেন তার মাথায় চড়ে গেল। ঝাপসা চোখ মেলে সে ললিতার দিকে তাকাল।

দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল ললিতা।

"তুমি খেলে না ললিতা ?"

"খেয়েছি।"

নন্দ ললিতাকে দেখে। যেন একটা রহস্যময়ী মোহিনীমূর্ত্তি তার সামনে। শয্যাপার্শ্বে পিল্‌সুজের উপর যে প্রদীপটা জ্বলছে তার ক্ষীণ আলোকে আরো রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে ললিতা।

চেতনায় একটা স্তিমিত অনুভূতি। চোখের সামনে একটা কালো মস্‌লিনের পরদা। সেই পরদার উপরে একটা বিদ্যুতের শিখা।

"আমায় দেখছ ওস্তাদ ?" ললিতার কাঁধ থেকে আঁচলটা পড়ে গেল।

"হ্যাঁ।" ললিতার উন্মুক্ত বক্ষদেশ আর সেই উন্নত দুটি মাংসপিণ্ড।

"আমি দেখতে কেমন ওস্তাদ ?"

"ভাষা খুজে পাচ্ছনা।" নন্দ উঠে দাঁড়াল, সমস্ত দেহে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। সে এগিয়ে গেল।

"সেকি! তুমি কবি মানুষ, তুমি ভাষা খুজে পাচ্ছ না!"

"তাইত দেখছি"—নন্দ ললিতা'র সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কয়েকটি মুহূর্ত্ত। ললিতার চোখে এক অদ্ভুত সম্মোহনী দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে এক বিচিত্র হাসি।

হঠাৎ ললিতার স্খলিত বসন ধরে নন্দ একটা টান্ দিল।

নগ্নতা। কিন্তু অপরূপ।

"তুমি পাগল ওস্তাদ।"

"তুমি অপূর্ব্ব ললিতা—তুমি অপরূপ!"

দুহাত বাড়িয়ে ললিতাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল নন্দ।

"দাঁড়াও"—নন্দ'র আলিঙ্গন থেকে একটু মুক্ত হয়ে প্রদীপটাতে ফুঁ দিল ললিতা।

নন্দ'র জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কাজললতা? সে কে?

অন্ধকারে একটা নূতন প্রদীপ জ্বলল ললিতা'র মনে। প্রতিশোধ কামনাটাই শেষ কথা নয়, তার পিছনে আর একটা কামনা ছিল ললিতা'র। নন্দকে জয় করার কামনা। আজ এই অন্ধকারে, নন্দর বাহুর নিষ্পেষণতলে হঠাৎ সে আবিষ্কার করল যে বেশ্যা ললিতারও ভালবাসার সাধ আছে।

শেষ রাতে বাড়ী ফিরল নন্দ।

যেন একটা অনন্ত নরককুণ্ড থেকে সে উঠে এল। তার প্রতি রোমকূপে অপরিসীম গ্লানি আর ক্লেদাক্ত অবসাদ, স্নায়ুতে দুর্ব্বল চেতনা। হঠাৎ ধিক্কার এল তার। একি করেছে সে?

যেন ছুটে সে বাড়ী এল।

"কাজল—" ফিস্‌ফিস্ করে সে ডাকল।

কাজললতা জেগেই ছিল, এক ডাকেই সে দরজা খুলে দিল।

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ?" ভীরুকণ্ঠে কাজললতা প্রশ্ন করল।

"কোথায় আবার থাকব? কোন্ চুলোয় আবার—গানের আড্ডায়।" এমন ভাবে বিরক্ত হয়ে উঠল নন্দ যেন কাজললতা কোনো অন্যায় কথা বলেছে তাকে।

কাজললতা চুপ করে রইল।

"এক ঘটি জল দেখি।" নীরসকণ্ঠে দাবী করল নন্দ।

কাজললতা জল এনে দিল।

খুব ভাল করে মুখ হাত পা ধুল নন্দ। ভিতর থেকে হঠাৎ একটা বিবমিষা যেন ঠেলে উঠ্‌ছে, দেহের উপর অশুচি কিছু যেন জড়িয়ে আছে।

ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছতে লাগল নন্দ।

তারপরে বিছানায় এসে শুল সে।

"তুমি এখনো ঘুমোওনি?" প্রশ্ন করল সে

"না।

হঠাৎ নন্দ কাজললতা'র কাছে সরে এল, বিকারগ্রস্তের মত হঠাৎ সে কাজললতাকে নিবিড় ভাবে বুকে টেনে নিল। পাগলের মত সে কাজললতা'র মুখ চোখ চুম্বনে ভরে তুলল। নিজের আত্মধিক্কারের

জ্বালায় ও প্রথম পাপের অনুতাপবহ্নিকে কমাবার জন্য নন্দ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

"থাম—থাম, পাগল কোথাকার—" কাজললতা আনন্দের চেয়ে ভয় পায় বেশী।

"না"—যেন একটা উন্মাদ কথা বলছে, "না। কাজললতা, তুমি ভারী ভালো মেয়ে, কাজললতা—তোমায় আমি দুঃখ দিই আজকাল, আমার উপর রাগ করো না তুমি—রাগ করোনা।"

কিন্তু উন্মাদের সেই প্রলাপ ও চুম্বনের মধ্য দিয়ে একটা গন্ধ ভেসে এল। কাজললতা নিঃশ্বাস বন্ধ করল। এ কিসের গন্ধ? এই অনুভূতির সঙ্গেই যে কথাটা মনে হল কাজললতা'র তাতে তার বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেল, তার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে এল। চোখ বুজে মড়ার মত পড়ে রইল সে।

দিনের আলোতে মুখ দেখাতে যেন লজ্জা হচ্ছে নন্দর।

কাজললতা'র দিকে সে ভাল করে তাকাতে পাচ্ছে না। একটা আত্মদাহী জ্বালায় তার দেহমন যেন পুড়ে যাচ্ছে। বেশী কথা বলছে না সে, চুপ করে ঘরের কোণে বসে আছে।

পাটকলের বাঁশী বাজল।

নন্দ কারখানায় গেল।

ফিরবার সময় সে আজ অন্য পথ দিয়ে এল। কারখানায় সে ললিতাকে একবার দেখেছিল বটে। ললিতা মৃদু হেসে তার দিকে এগিয়ে আসতেই সে কাজের অছিলায় অন্য দিকে চলে গিয়েছিল, মানে পালিয়েছিল ললিতা'র আবহাওয়া থেকে।

কিন্তু ললিতা'র প্রভাবকে এড়াবার জন্য এই চেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে ললিতা'কে আবার মনে পড়ে। নিদারুণ লজ্জার মধ্যে নন্দ আবিষ্কার করে যে ললিতার অপরূপ দেহস্মৃতি, তার আশ্চর্য্যরকমের আলিঙ্গন আর ভালবাসার কথাগুলি তার মন তারও অজ্ঞাতে রোমন্থন করছে।

বাড়ী ফিরল নন্দ।

সেদিন আর সে বেরোল না। প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে সে বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগল। কাজললতাকে দু'তিনবার আদর করল, কিন্তু সে এমনি অর্থহীন ও উত্তাপহীন আদর যে কাজললতা তার আলিঙ্গন থেকে দূরে সরে গেল, নিশব্দে কাঁদতে কাঁদতে।

আবার নূতন দিনের প্রভাত হল।

দিনটা সেই ভাবেই কাটল।

নন্দ কারখানা থেকে ফিরল, সন্ধ্যা হল।

কিন্তু অন্ধকার হতেই যেন নন্দ দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। ললিতার ছবি ভাসে চোখের সামনে। কে যেন ডাকছে তাকে। বারংবার কে যেন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলছে—চল চল—সময় হয়েছে।

ভূতগ্রস্তের মত সে হঠাৎ বেরোল।

"কোথায় যাচ্ছ?" কজললতার শুষ্ককণ্ঠ ধ্বনিত হল।

"কোথায় আবার—একটু বেড়াব না?"

নিশ্চয়ই, নন্দ বেড়াবে বই কি।

ললিতা ঘরে ছিল।

ঘরের ভিতর দ্রুতপদে ঢুকে দরজাটাকে বন্ধ করে দিল নন্দ। পিছনে কে যেন আসছে।

"এসেছ!" ললিতা হেসে কাছে এল, দু'হাত দিয়ে নন্দ'র কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে ধরল।

"ললিতা-ও ললিতে—" বাইরে থেকে কে যেন দরজায় মৃদু করাঘাত করল।

ললিতা নন্দকে ভিতরের দিকে ঠেলে দিল।

দরজাটা একটু ফাঁক করল সে, "কে?"

"আমি।" যেন ভয় পেয়েছে এমনিভাবে কথা বলছে আগন্তুকটি।

ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল, "ওঃ, নিমাই পণ্ডিত!"

"চুপ্—কি যে বল! নাও, সর দেখি।"

ললিতা মাথা নাড়ল, "উঁহু, আজ হবে না বাড়ুয্যে, আজ আমার নাগর ভিতরে আছে।"

"কে সে হতভাগা?"

"সে জেনে কি হবে—নাও, যাও।"

"বটে! আচ্ছা!"

নিমাই বাঁড়ুয্যের দ্রুত পদশব্দ বাইরে মিলিয়ে গেল।

ললিতা দরজা বন্ধ করল।

"বোস।" নন্দর হাত ধরে সে তাকে তক্তাপোষের উপর নিয়ে বসাল।

নন্দ কাঁপছে। নিজেকে সে দমন করতে পারল না! লজ্জায় সে কাঁপছে। আর কাঁপছে ললিতার অদ্ভুত স্পর্শানুভূতিতে।

"কাল এলে না যে!" ললিতা মুচ্কি হাসল।

"কাজ ছিল।" নন্দ শুষ্কতালুকে সিক্ত করে।

"কাজ! বটে! না বৌয়ের ভয়ে আসতে পারনি?" ললিতা আবার নন্দর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করল।

নন্দ যেন একটা নাগিনীর নাগপাশে জড়িয়ে পড়েছে।

"ধ্যেৎ—বৌকে ভয় করব কেন?" নন্দ বিকৃত হাসি হাসল।

যতই ললিতার আলিঙ্গন দৃঢ় হচ্ছে, যতই তার দেহ নন্দ'র দেহের কাছে আসছে, যতই তার তৃষ্ণার্ত্ত ওষ্ঠদ্বয় নন্দ'র মুখের কাছে এগিয়ে আসছে ততই নন্দ'র দেহমন যেন দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে, ততই তার লজ্জা, ভয় আর নীতির বাঁধ ভেঙ্গে পড়ছে। কাজললতা? সে কে? তার কথা নন্দ'র আর মনে নেই।

সময় কাটতে লাগল।

জ্বলন্ত নরকের একটা অপূর্ব্ব ও অসহ্য স্মৃতি নিয়ে, মদমত্ত অবস্থায় নন্দ বাড়ী ফিরে এল।

আজ আর কাজলতা'র সন্দেহের কিছু নাই।

পাথরের মূর্ত্তির মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে স্বামীর দিকে তাকাল, "তুমি টল্‌ছ?"

"হ্যাঁ—টল্‌ছি, তাতে হয়েছে কি, কি হয়েছে শুনি?"

"তুমি মদ খেয়েছ!" আর্ত্তকণ্ঠে বলল কাজললতা।

"হ্যাঁ, খেয়েছি, তাতে হয়েছে কি? এ্যাঁ?"

"ভগবান—ভগবান—" মাথার উপরকার আকাশটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়েছে কাজললতা'র মাথার উপর। সব যেন অন্ধকার হয়ে গেছে।

নন্দ বিকৃতকণ্ঠে হাসল, যেন মাছি তাড়াচ্ছে এমনিভাবে একটা হাত নেড়ে বলল, "ভগবান? সে আবার কে বাওয়া? ধ্যেৎ, থামাও ও সব মাইরি—আমি ঘুমোব—"

ধপ করে বিছানা'র উপর বসে গড়িয়ে পড়ল নন্দ।

একটুবাদেই তার নাসিকাগর্জ্জন শোনা গেল।

পাথরের মূর্ত্তিতে ক্ষীন চেতনা এল। কাজললতা ঘুরে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে সে দরজা খুলল, ভিতরের বারান্দার গিয়ে বসল। চারদিক

জ্যোৎস্নার আবীর মেখে অপরূপ হয়ে উঠেছে। গ্রাম নিস্তব্ধ। ঈশ্বরে পৃথিবী। অপরূপ শান্তি আর সৌন্দর্য্যে যেন পরিপ্লাবিত হয়ে উঠেছে আঃ। কিন্তু মানুষের মনের ভিতরে কোথায় শান্তি, কোথায় সৌন্দর্য্য ভগবান।

হঠাৎ কাজললতা নিজের গর্ভের উপর হাত রাখল। তার সান্ত্বন তার দুঃখজয়ী মন্ত্র আছে সেখানে। কাজললতা যেন দেখতে পাচ্ছে তার গর্ভান্তরালে এক ফুলের মত শিশু। সে একদিন ভূমিষ্ঠ হবে বড় হবে, কথা বলতে শিখবে, তাকে 'মা' বলে ডাকবে, তাকে ভালবাসবে তার নারীত্বের সমস্ত দুঃখও আক্ষেপ সে একদিন ধুয়ে মুছে ফেলবে কাজললতার ছেলে।

কবে? কাজললতা কেঁদে কেঁদে সেই অজাত শিশুকে প্রশ্ন করে কবে, কবে আসবি তুই? ওরে সোনামাণিক, কবে আসবি?

দিন কেটে চলল। দিনের পর মাস।

হরিচরণের অদৃষ্ট ভাল নয়। মোকদ্দমায় সে হারল। নিকুঞ্জসা'র স্বপ্নই সত্যি হল।

হরিচরণের সংসার ভেঙ্গে পড়ছে। ধীরে ধীরে।

গ্রামের ইতিহাস সেই এক।

শিখা সহরে গেছে। কারাগারের রুদ্ধ দ্বারের দিকে সে কান পেতে রয়েছে—কবে সে লৌহদ্বার খুলবে, কবে প্রবীরের পদধ্বনি শোনা যাবে।

মাধবী'র চেহারা হয়েছে শীর্ণা তপস্বিনী'র মত। সে ভাল করে খায় না, কম কথা বলে, দিনে ছট্‌ফট করে, রাতে ঘুমোয় না। তার সুখ, তার আশা, তার স্বপ্ন এখন লৌহদুর্গের প্রাচীরান্তরালে।

ওদিকে অশরিরী প্রেতের মত অর্জ্জুন ঘুরে বেড়ায়। মাধবীকে একবার দেখবার আশায়, তার সঙ্গে দুটো কথা বলবার লোভে। নিজের দুরাশাকে সে অহরহ সিঞ্চিত করে চলেছে, যতই দিন কাটছে ততই সে বুঝতে পারছে যে মাধবী ছাড়া তার জীবনটা যেন অর্থহীন।

এবার নন্দ ও কাজললতা।

রসাতলের কোন্ অন্ধকার অতলে যে নন্দ তলিয়ে গেছে কাজললতা তার আর খোঁজই পায় না।

স্বামী বদ্‌লে যাচ্ছে, সে তাকে আর আদর করে না, ভালবাসে না; সে আজকাল মদ খায়, রাত করে বাড়ী ফেরে। স্বামী যেন ক্রমশঃই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সে যেন ক্রমশঃই অপরিচিত হয়ে উঠছে, সে যেন দিনরাত কি ভাবে আজকাল।

কার কথা? কাজললতা'র মনে নূতন একটা সন্দেহ ঘনিয়ে এল। কার কথা ভাবে নন্দ? সে কি অন্য কোনও নারী? কাজললতা শিউরে উঠল, বুকে হাত দিয়ে একটা চাপা আর্ত্তনাদ করে মাথা নাড়ল। না, না, তা হবে কেন? স্বামী তার এমন হবে কেন? না, না, এ তার মিথ্যা ভয়, অন্যায় সন্দেহ।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা জানতে পারল কাজললতা। কথা কানাকানি হতে সকলের কানেই কথাটা পৌঁছুল। বড় বড় সহরেও মানুষের কিছুই গোপন থাকে না আর এত ছোট্ট একটা গ্রামের ব্যাপার। সবাই শুনল। হরিচরণ, রাসমণি, মাধবী আর কাজললতা— সবাই জানল যে নন্দ ললিতার ওখানে যায়, বেশ্যা ললিতার প্রেমে পড়ে নন্দ'র মাথার আর ঠিক নেই।

মিথ্যা ভয় নয়, অন্যায় সন্দেহ নয়। কাজললতার মন তাকে ঠিকই বলেছিল। কাজললতা কি করবে? সে কি কাঁদবে? সে কি স্বামীকে কিছু বলবে? সে কি গলায় দড়ি দেবে?

শিউরে উঠল কাজললতা। না—না। সোনামনি, কবে, কবে আসবি তুই? আমি যে আর সইতে পারছি না বাবা!

কিন্তু কিছুই কি করতে পারে না কাজললতা? নিরুপায় বেদনায় সে কি শুধু দেখবে যে তার ঘর থেকে প্রায়ই স্বামী বেরিয়ে যাচ্ছে ঐ বেশ্যাটার কাছে! সে কি শুধু বলির পশুর মত জেগে জেগে বসে থাকবে আর নন্দ যখন অর্দ্ধরাত্রে বা শেষরাত্রে ফিরে আসবে তখন রুদ্ধদ্বারটা খুলে দিয়ে নন্দর মুখের তীব্র মদগন্ধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানবে? শুধুই কি জ্বলবে কাজললতা?

না।

একবার চেষ্টা করবে কাজললতা। একবার—শেষবার।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার আর ভয় বা লজ্জা নেই।

ঘরের মধ্যে নারীমূর্ত্তি দেখে ললিতা বিস্মিত হল, "কে ? কে গা ?"

"আমি"—ঘোম্‌টাটা সরাল কাজললতা।

ললিতা কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়াল।

"ওস্তাদের বৌ !" মূহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হয়ে গেল ললিতা।

"হ্যাঁ।"

"কি চাই ? আমার এখানে কুলবধুরা ত' আসেনা—তুমি কেন ?" ললিতা একটু হাসল।

কাজললতা স্থির দৃষ্টি মেলে ললিতার দিকে তাকাল, "বলব ?"

"বল।"

"এসেছি ভিক্ষে চাইতে।"

ললিতাও কাজললতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল, তার রূপকে বিশ্লেষণ করছিল সে।

"ভিক্ষে চাইতে! আমার কাছে! তুমিও যে ওস্তাদের চেয়ে কথায় কম নও বাপু।" ললিতা'র কণ্ঠে যেন বিষ মেশানো আছে।

নিঃশব্দে সে বিষোদ্গারকে হজম করে শান্তকণ্ঠে কাজললতা বলল, "কম হব কেন বোন—স্বামীর কাছে এতটুকু শিক্ষাও কি পাব না, তবে তার স্ত্রী হয়েছি কেন ?"

"বটে ! কিন্তু ভিক্ষেটা কি শুনি ?"

"আমার স্বামী তোমার কাছে আসে ?"

"আসেই ত', এই দুটো পায়ে প্রায়ই এসে লুটোয়।" ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত কুটিল হয়ে উঠছে ললিতার সুন্দর চোখ দুটো।

"তুমি তাকে আর আসতে দিওনা।"

"মানে ?"

"তুমি আমায় আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও।"

খিলখিল করে হেসে উঠল ললিতা।

"হেসো না বোন। আমার জগতে আর কে আছে, স্বামী ছাড়া স্ত্রীলোকের আর কেউ নেই। আমার সর্ব্বনাশ করো না তুমি।"

"কিন্তু তোমার স্বামীকে যে আমারও ভাল লাগে।"

"তুমি আমায় দয়া কর।"

ললিতার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে, কাজললতার দিকে তাকাল সে। কাজললতা'র গর্ভকে লক্ষ্য করল সে। একটা অপরিচিত জ্বালা, একটা অহেতুক ক্রোধে তার সমস্ত শরীরটা যেন উদ্যত খড়্গের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

"দয়া!"

"হ্যাঁ।

"করব না তোমায় দয়া—তোমার যেমন স্বামী ছাড়া কেউ নেই, আমারও এখন ওস্তাদ ছাড়া আর কেউ নেই। কি ভাবছ? আমি বেশ্যা! কেন বেশ্যারা কি ভালবাসতে পারে না? তাদেরও কি সংসার গড়বার সাধ হতে নেই?"

আকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে কাজললতা শেষ প্রার্থনা জানাল, "আমায় দয়া কর বোন্, অত নিষ্ঠুর হয়ো না।"

"না, আমি তোমায় দয়া করব'না। আমার শেষ কথা এই যে তুমি আমার বাড়ী থেকে এখন দূর হও!"

হঠাৎ কাজললতার রূপান্তর ঘটল। তার চোখে জল আর আগুন—যেন মেঘ আর বিদ্যুৎ।

মর্ম্ম বিদীর্ণ করে সে অভিশাপ দিল, "তুই আমার স্বামীকে কেড়ে নিবি? পারবিনা। তুই আমায় যে কষ্ট দিচ্ছিস তার ফল পাবি—নিশ্চয়ই পাবি"—

খিলখিল করে হাসছে ললিতা, একটা বন্য আবেগে যেন সে আস্থির হয়ে উঠেছে "ওরে আমার সতী সাধ্বীরে, তুই আমায় শাপ্ দিচ্ছিস্!"

"হ্যাঁ দিচ্ছি—তোর যেন মহাব্যাধি হয়, তোর অঙ্গ যেন খসে খসে পড়ে"—কাজললতা উন্মাদিনীর মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

ললিতা এবার ক্ষেপে গেল, সজোরে ছুটে এসে কাজললতার ঘাড় ধরে সে তাকে ঘর থেকে বের করে দিল। আপদটার পায়ের শব্দ যখন মিলিয়ে গেল তখন সে হঠাৎ তুর্ব্বল বোধ করতে লাগল, টলতে টলতে গিয়ে সে বিছানার উপর শুয়ে পড়ল, চালের দিকে তুচোখের অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি মেলে চুপ করে পড়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপরেই সে আবার উঠে বসল, নিজের মনে কি ভেবে বারংবার সে সভয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

না, সে নন্দকে ছাড়তে পারে না, পারবে না। হয়ত কাজললতার সর্ব্বনাশ হবে, হয়ত নন্দ'র নিজেরও সর্ব্বনাশ হবে, তবু না, সে নন্দকে ছাড়বে না।

শান্তি নেই, শান্তি আর সুখ যেন হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে।

তিলে তিলে শুকিয়ে যাচ্ছে মাধবী।

সূর্য্য ওঠে, লাল থালার মত সূর্য্য ওঠে, আকাশকে পর্য্যটণ করে সে সূর্য্য আবার অস্ত যায়, লাল বলের মত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে ডুবে যায়। কিন্তু মাধবীর সে দিকে লক্ষ্য নেই।

বাতাস আসে। দক্ষিণের বাতাস। মূলতানী সুরের আলাপ করে, গাছের পাতায় পাতায় মৃদুকণ্ঠে প্রশংসা ধ্বনিত হয়। আসে পশ্চিমের বাতাস। ধূলো উড়ায়, হুহু করে ডাক ছাড়ে। প্রমত্ত ভৈরবের নৃত্যের সাথে ধলেশ্বরীও নাচে, গর্জ্জায়। কিন্তু মাধবীর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ফুলের গন্ধ আর পাখীর গানও আছে। এই পৃথিবী সুন্দরী, বৈচিত্র্যময়ী। বিচিত্র পৃথিবীতে বিচিত্রতম জীবন-নদীর কল্লোলধ্বনি আকাশের দিকে উঠছে কিন্তু মাধবীর তাতে কি যায় আসে? তার কাছে আকাশের সূর্য্য অন্ধকার, বাতাস জ্বালাময়, জীবন দুর্ব্বহ।

মাঝে মাঝে নির্জ্জন মধ্যাহ্নে সে কোন গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়, দু'চোখের দৃষ্টি মেলে সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথটাকে লেহন করতে থাকে। বুকটা দ্রুতগতিতে উঠানামা করে, শরীরটা কাঁপতে থাকে, মাথাটা ঘুরতে থাকে, চোখের সামনে জলের পরদা সৃষ্ট হয়। তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকিয়ে থাকে।

প্রবীর কি আসছে? প্রবীর কি আসবে না?

আষাঢ় মাসের বর্ষণ-মুখর রাতে একদিন নন্দর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তীব্র, তীক্ষ্ণ একটা আর্ত্তনাদ। আসছে উঠোনের দিক থেকে। কান পেতে শুনল সে, অন্ধকারের পাশে হাৎড়াল। কাজললতা নেই। ও তারি আর্ত্তনাদ।

ভীত, ত্রস্ত পদধ্বনি। সকলের উত্তেজিত কলকণ্ঠ।

পশুর মত চীৎকার করছে কাজললতা।

হঠাৎ আজ যেন সম্বিৎ ফিরে এল নন্দর। কাজললতাকে সে বড় কষ্ট দিয়েছে। তার বৌ কাজললতা। সেই কাজললতা এখন চীৎকার করছে। তার সন্তান হবে।

যদি মরে যায় কাজললতা? না, না কাজললতা যেন মরে না। সে পাপী, সে অনেক পাপ করেছে, কিন্তু তার পাপে যেন কাজললতা না মরে। সে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করবে। ভগবান, কাজললতাকে বাঁচাও তুমি।

তীব্র, তীক্ষ্ণ, একটানা আর্ত্তনাদ।

উঃ।

হঠাৎ সব নিঃশব্দ।

নিঃশব্দতায় শঙ্খধ্বনি। আবার কলকণ্ঠ। হরিচরণের হাসি।

পা টিপে টিপে বাইরে গেল নন্দ।

মাধবী দৌড়ে আসছে। অনেকদিন পরে মাধবীর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য, একটা প্রাণস্পন্দন পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাধবী আজ যেন হঠাৎ খুশী হয়ে উঠেছে।

"দাদা—দাদা—"

"কি? কি?"

"হয়েছে।"

"কি হয়েছে?"

"ছেলে, তোমার ছেলে হয়েছে—রাজপুত্তুরের মত, পুতুলের মত, ননীর মত সুন্দর একটি খোকনমণি হয়েছে।" মাধবী এমনভাবে খবরটা দিল যেন আকাশের চাঁদটা হঠাৎ তাদের বাড়ীতে ছিটকে পড়েছে।

নিজের জীবনকে বিচার করে নন্দ। মুহূর্ত্তে সব মনে পড়ে। পাপ

করেছে সে, কাজললতাকে অপমান করেছে, ললিতার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে, নিজেকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে সে।

তবু একটা নূতন অনুভূতি, অদ্ভুত একটা আকর্ষণ, মমতা, আবার ভাল হবার একটা অত্যুগ্র আকাঙ্খা। নন্দ'র চোখে হঠাৎ জল এল।

আগুন ছড়াচ্ছে। দাবানল বিস্তৃত হচ্ছে।

খবর এল। ভীতিজনক খবর। জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সঙ্গে। জাপান এগিয়ে আসছে। ভারতবর্ষেও কি এবার যুদ্ধ হবে?

গ্রামে উত্তেজিত আলোচনা চলে। কল্কি অবতার এবার বুঝি আবির্ভূত হবেন!

সুব্রত আর যদুপতি বাবু দৌড়াদৌড়ি করছে। সভা করছে।

মৌলানা বসিরুদ্দিন পাকিস্থানের ব্যাখ্যা করছে মুসলমানদের মধ্যে

আবদুল শ্রমিকদের বোঝাচ্ছে যে এবার একটা কিছু হবে।

কিন্তু কোনো দলই এক সঙ্গে বসে কিছু ভাবছে না।

ভারতের ভাগ্যবিধাতারা নীরব। আপোষের জন্য তারা মাথা ঘামাচ্ছেন।

জিনিষের দাম চড়ছে। অতি মৃদুভাবে।

প্রবীর যাঁ.ক্লে প্রশ্ন করত—ভারতবর্ষ, আর কত দেরী? সারা পৃথিবী রণোন্মত্ত হল, শৃঙ্খল ছিন্ন হচ্ছে দেশ বিদেশে, নূতনের, শক্তিমানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, পুরাতন পৃথিবী ভেঙ্গে পড়ছে। ভারতবর্ষ এবার তুমি কি করবে?

প্রান্তরের গান

সুব্রত বক্তৃতা দিচ্ছিল।

"আমাদের দিন এবার ঘনিয়ে এসেছে—এবার ডাক আসবে। ভাইসব, আমরা মানুষ, প্রাচীন ও সুসভ্য দেশের মহৎ জাতির বংশধর আমরা, বিরাট একটি দেশের অধিবাসী। অথচ আমরা পরাধীন। ভাইসব, পরাধীনতাই সমস্ত দুঃখের মূল, ঐ একটি বিষেই আমাদের সমগ্র জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আর নয়, এবার আমরা বোঝাপড়া করব। শুধু আর কিছুদিনের অপেক্ষা। হাজার দুঃখেও আমরা যে মহৎ ও উদার তারি নিদর্শন স্বরূপ আমরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করছি। চেষ্টা ব্যর্থ হলেই আমাদের রণভেরী বাজবে। বন্ধুগণ প্রস্তুত থাক, অপেক্ষা কর।"

ভারতবর্ষ, প্রস্তুত হও।

ঝড়

শূণ্যতাকে বিমথিত করে চলে যাচ্ছে। তিনটে উড়োজাহাজ। একটানা একটা শব্দ নেমে আসছে নীচের দিকে, পাক খেয়ে খেয়ে। পশ্চিম থেকে পূব দিকে যাচ্ছে উড়োজাহাজগুলো। যুদ্ধ নাকি এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ।

সীমানার বাইরে চলে গেল জাহাজগুলো। কিন্তু এখনো কান পাতলে তাদের ক্ষীণ চক্রধ্বনি শোনা যায়। মৌমাছির অস্ফুট গুঞ্জনের মত।

•

মাধবী উড়োজাহাজগুলিকে দেখছিল।

এখন মধ্যাহ্ন। জন বিরল পথ। পথে নেমে, গ্রাম্য কৌতূহলকে চরিতার্থ করছিল মাধবী।

হঠাৎ দৃষ্টিটা তার পথের শেষপ্রান্তে নিবদ্ধ হল। একজন লোক আসছে, খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফে তার মুখ আচ্ছন্ন, মাথার চুলগুলি রুক্ষ, এলোমেলো, হাতে একটা ছোট ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

মাধবীর হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন একলাফে তার কণ্ঠদেশে এসে পৌঁছুল, মাথাটা ঘুরে গেল তার, রক্তের চাপে কাণের দুপাশে যেন পাটকলের ইঞ্জিনের মত দপ্‌ দপ্‌ শব্দ হচ্ছে। কে আসছে? একি চোখের ভুল!

এগিয়ে গেল সে। এগিয়ে নয়, দৌড়ে গেল সে। না, ভুল নয়, ভুল হয়নি তার।

সেই লোকটি থমকে দাঁড়াল।

মাধবী লোকটির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। ধূলো, বালি, কাঁটা, কাঁকর, কি যায় আসে? মাধবী লুটিয়ে পড়ে লোকটির পায়ের উপর প্রণাম করল।

লোকটি প্রবীর।

প্রবীর ক্লিষ্ট হাসি হাসল, গভীর আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, তবু বলল সে, "ওঠ, ওঠ মাধু, লক্ষীটি"—

"না।"—প্রবীরের পায়ের উপর মাথা রেখেই মাথা নাড়ছে মাধবী। তার চোখের জলের ধারায় প্রবীরের পা সিক্ত হয়ে উঠেছে। এতদিন মাধবী শুধু জ্বলেছে, শুধু পুড়েছে আজ সেই জ্বালা যেন চোখের জল হয়ে বেরিয়ে এল।

"তুমি পাগল, একেবারে পাগল মাধু—ছিঃ, ওঠ, লোকেরা দেখলে বলবে কি?"

"বলুক্‌গে",—মাধবীর আর লোকলজ্জা নেই।

"তোমার কথাই ভাবছিলাম মাধু, এই মুহূর্ত্তে তোমাকেই দেখ্‌তে ইচ্ছে করছিল।"

মাধবীর মরে গেলেও আর দুঃখ নেই।

"ওঠ, বাড়ী চল, খুব খিদে পেয়েছে, খাওয়াবে ত?"

মাধবী উঠল, হাসি কান্না মেশানো অশ্রু-ধৌত মুখখানি তুলে অদ্ভুত এক দৃষ্টি মেলে প্রবীরের দিকে তাকাল, হাসল এবং বলল, "খিদে পেয়েছে! চল—চল—শীগগীর এসো।"

প্রবীরও তাকাল মাধবীর দিকে, মাধবীর শীর্ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে তার চোখে গাঢ় একটা ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। অদ্ভুত মেয়ে এই মাধবী!

"মাধু, তুমি বড় রোগা হয়ে গেছ।"

"আর তুমি! চল, আয়নায় মুখ দেখবে।"

প্রবীর হেসে উঠল, "হ্যাঁ, গ্রামের খবর কি? নন্দ কেমন আছে? আর কাকা? বৌঠান্ ভাল ত? কাকীমা? হ্যাঁ, আমার পিসির খবর কি বলত? যুদ্ধের খবর রাখ ত' মাধু?"

মনের সমস্ত কথাগুলোকে যেন এক সঙ্গেই প্রকাশ করতে চাইছে প্রবীর, একসঙ্গেই সমস্ত প্রশ্ন করে সমস্ত উত্তর পেতে চায় সে।

"উঃ—থাম, থাম প্রবীরদা। বাড়ী চল, ধীরে সুস্থে সব শুনবে।"

আবার হাসল প্রবীর, "ঠিক, ঠিক বলেছ। চল—"

নূতন মনে হচ্ছে সব কিছু। প্রবীরের যেন নবজন্ম হয়েছে। নবজাতকের বিস্ময় তার চোখে, নবজাতকের ইন্দ্রিয়ানুভূতি। গ্রামের বাতাস, গ্রামের মাটীর বহু পরিচিত মৃদু সৌরভকে, সে বুকভরে প্রাণভরে গ্রহণ করল। আঃ—আঃ। কারাগার? এখন একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে তার।

গ্রীষ্মের শুষ্ক, অবলুপ্ত মরানদীতে হঠাৎ যেন বর্ষা নেমেছে। উদ্দাম ও বন্য বন্যায় সে নদী যেন আবার উচ্ছৃঙ্খল আর ভীষণ হয়ে উঠেছে। মাধবী হঠাৎ একমুহূর্তে বদলে গেছে। তার চোখে এসেছে শাণিত ঝলক, দেহে এসেছে দুরন্ত নদীর চাঞ্চল্য, কণ্ঠে এসেছে মুখরার ভাষা।

সবাই ভীড় করে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হরিচরণ, রাসমণি আর শিশু ক্রোড়ে কাজললতা।

প্রবীর যেন একটা বিস্ময়!

"উঃ, কতদিন পরে এলে?"

"খুব কষ্ট হত, না বাবা?"

"তোমার শরীর বড় খারাপ হয়ে গেছে।"

"তোমার পিসী প্রায়ই কাঁদেন—কত বোঝাই।"

"আচ্ছা, ওখানে খুব কষ্ট দেয়, না?"

একসঙ্গে বহুপ্রশ্ন। প্রবীর কোনটারই উত্তর দিতে না পেরে কেবল হাসে। মানুষ—মানুষ কি চমৎকার। মানুষের মানুষ ছাড়া কি চলে?

এই স্নেহ, ভালবাসা, মমতা—এ মানুষের হৃদয় ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে? জেলখানায় অজস্র বই পড়েছে প্রবীর; জ্ঞানগর্ভ, সূক্ষ্ম, নানাকথা। কিন্তু কোনো আনন্দই পায়নি সে। অথচ এই মুহূর্তটি! জীবনের পরম সম্পদ এই স্নেহকাকলী।

মাধবী ছুটে এল, তার হাতে একটি রেকাবে নাড়ু মুড়ি!

"খাও দেখি এবার"—মাধবী আদেশ করল।

হরিচরণ মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ বাবা খাও"।

কাজললতা হেসে ঠাট্টা করল, "শুধু নাড়ু মুড়ি ভাই, আর কিছু নেই।"

প্রবীরের চোখে যেন জল আসে, "বৌঠান এ অমৃত।"

"কবে ছাড়া পেলে বাবা?" রাসমণি প্রশ্ন করল।

"আজ সকালে। ছাড়া পেয়েই চলে এসেছি, একদণ্ডও মন টিকল না সেখানে।"

"বেশ করেছ, ঘরের ছেলে ঘর ছেড়ে কোথায় যাবে বাবা?"

প্রবীর খেতে থাকে।

"আপনারা কেমন আছেন কাকা?"

হরিচরণ একটা সুগম্ভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল, "আমরা! ভগবান যেমন রেখেছেন। খুব ভাল নেই বাবা"—

রাসমণি সেখান থেকে চলে গেল।

হরিচরণ বলতে লাগল, "মেয়ের বিয়ের ধার শোধ করতে না পারায় মহাজন ডিক্রিজারী করে সেই দশবিঘা জমি দখল করে নিয়েছে"—

"তাই নাকি?" গভীর সহানুভূতিতে প্রবীরের হৃদয়টা যেন মুচড়ে উঠল। "হ্যাঁ বাবা। মোকদ্দমার জন্য আরো ধার হয়েছে—তাছাড়া এবার ফসলও ভাল হয়নি—হরিচরণের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

ক্ষণিক স্তব্ধতা।

কাথার মোড় ফিরাবার জন্য প্রবীর বলল, "খোকাটি ত' চমৎকার দেখতে হয়েছে ওর নাম কি বৌঠান?"

হরিচরণই জবাব দিল, "ঐ আমার দুঃখের সান্ত্বনা বাবা, ওর নাম রেখেছি গৌরচরণ, ওর দাদামশাইয়ের অর্দ্ধেক নাম আর আমার নামের অর্দ্ধেক এক করে। ডাক নাম গোরা।"

"বেশ বেশ। হ্যাঁ, গোরার বাপের খবর কি? নন্দ কোথায়? ওকি এখনো পাটকলে কাজ করে?"

হরিচরণ নিরুত্তরে কাশল একটু।

কাজললতা হঠাৎ দ্রুতপদে সেখান থেকে চলে গেল। তার স্বামীর কেলেঙ্কারীরর কথা সে আর শুনতে পারে না, তার চোখে জল আসে, মাটীতে পড়ে মাথা কুটতে ইচ্ছে করে সে সব পুরোণো কথা শুনলে।

মাধবী মুখনীচু করল।

"কি ব্যাপার কাকা?"

হরিচরণ আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল, "সে সব কথা বলতে ইচ্ছে করে না বাবা, বৌমার জন্য, আমার লক্ষ্মীর মত বৌমার জন্যই আমি সব সহ্য করছি। আসন্ন অভাবের জন্য যত না ভেঙ্গে পড়ছি তার চেয়েও ভেঙ্গে পড়ছি নন্দর জন্য"—

"কি হয়েছে?"—

"ওর অধঃপতন হয়েছে হারামজাদা আজকাল মদ খায় আর-আর- কয়েকমাস ধরে ঐ ললিতার ওখানে যাতায়াত করে। লজ্জায় মরে যাচ্ছি আমি। বৌমাকে আমি মুখ দেখাতে পারি না। বকুনি? জোয়ান ছেলে বকুনির কি ধার ধারে? ওর রোজগার টোজগার সব আজকাল হাওয়ায় মিলিয়ে যায়—তা যাক্, আমায় কিছুই না হয় সাহায্য না করল, কিন্তু শোধরায় কৈ? ছেলেটা হওয়ার পর দিনকয়েক ভাল

ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে আবার নরকের পথ বেছে নিয়েছে। অথচ কেন তাই ভাবি। আমার বৌমার কি রূপের তুলনা আছে প্রবীর?"

হরিচরণ আবেগের প্রাবল্যে থেমে গেল, কাশ্‌তে শুরু করল।

"এত কাণ্ড হয়ে গেছে! নন্দটা এত বয়ে গেছে!" প্রবীর ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল। সত্যি, এ অন্যায় কথা। হরিচরণের সংসার তাসের বাড়ীর মত ভেঙ্গে যাচ্ছে। দুঃখ হয়।

নিঃশব্দতা।

হরিচরণ উঠে দাঁড়াল, "বোস বাবা, কথা আছে, নন্দকে তোমায় ভাল করে দিতে হবে। দাঁড়াও, আমি একটু তামাক সেজে নিয়ে আসি।

নিঃশব্দতা।

"মাধু"—

"চুপ্‌!"

"কেন?"

"তোমায় দেখতে দাও।"

"কোনদিন কি আমায় দেখনি মাধু?"

"দেখেছি। সে কবে? দে-ড় বছর আগে—অনেক যু-গের কথা তা।"

"হলেই বা, এমন কি নূতন জিনিষ আছে আমার মধ্যে?"

"দাড়ি আর গোঁফ।"

"খারাপ লাগছে?"

"বিশ্রী লাগছে।"

"কেন, বেশ ত সাধুর মত দেখতে হয়েছি।"

"ছাই! গুণ্ডার মত দেখাচ্ছে তোমায়।"

"সে না হয় ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু এত দেখার কি ঐ কারণ?"

"হয়ত অন্য কারণ আছে কিন্তু সে তোমার জেনে লাভ নেই।"

"কেন মাধু?"

"তুমি মানুষ নও, তুমি পাথরের দেবতা প্রবীরদা।"

প্রবীর হাসতে গিয়ে থেমে গেল। সমস্ত পুরানো ছবিগুলো চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল। অদ্ভুত এই মাধবী। মাধবী তাকে ভালবাসে। সে বিষয়ে এতদিন হয়ত অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কিন্তু আজ তা দিনের মত পরিষ্কার। প্রবীর দেখতে পাচ্ছে, অনুভব করতে পাচ্ছে সেই ভালবাসার সুবিপুল গভীরতা।

কিন্তু সে কি করবে? প্রবীর কি মাধবীকে ভালবাসবে? নিজেকে শেষ পর্য্যন্ত হৃদয়ের কাছে সে কি পরাজিত করবে?

না, অপেক্ষা করা যাক্। এখন তার অনেক কাজ।

"আমি যেদিন জেলে গেলাম, তোমার সঙ্গে সে দিন দেখা হলনা।"

"আমার কথা কি সেদিন মনে ছিল তোমার?"

"ছিল বৈকি—সকলের কথাই মনে পড়েছিল।"

"আমার সেদিন যে কি মনে হয়েছিল তা তোমায় কি করে বোঝাই। আমি তোমায় কত কি অন্যায় কথা বলেছিলাম তার কয়েক দিন আগে।"

"কি এমন বলেছিলে? এমনি ছেলেমানুষী কথা—কি হয়েছে তাতে?

"সেদিন ক্ষমা চাইব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমায় ধরে নিয়ে গেল। আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি প্রবীরদা"—

"তুমি পাগল মাধু।"

"হ্যাঁ, আমি পাগল। তবু তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে শুধু আমার ভালটুকুই তুমি মনে রাখো।"

"তোমার চেয়ে ভালো আর কে আছে মাধু?"

মাধবীর চোখে আবার জল এল।

অপরূপ এই মুহূর্ত্তগুলি। অনন্ত কালসমুদ্র থেকে আহরিত অমূল্য মুক্তার মত।

হাটের মাঝখানে, কাছারী আর থানার সামনে ছাউনি পড়েছে। এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ রিক্রুটিং অফিসার এসেছে লোকজন আর রঙীন ইস্তাহার নিয়ে। সৈন্যদলে লোক ভর্ত্তি করাবার জন্য।

সকলেরই খাকী পোষাক আর বুটজুতো পায়ে, কাঁধে ষ্ট্রাপ্ আর ব্যাজ, মাথায় হ্যাট্ আর ফোরেজ ক্যাপ। সব মিলিয়ে প্রায় জন দশেক লোক, সঙ্গে দুজন পুলিশও আছে।

তাঁবুর গায়ে বিভিন্ন ইস্তাহার, হাটের মাঝখানকার তেঁতুল গাছটার গায়ে, কাছারীর গায়ে, থানার বেড়াতে, সর্ব্বত্র ইস্তাহার ঝুলছে। হাসি-মুখে লোকেরা তার ভিতর থেকে কলাতিয়া গ্রামের লোকদের দিকে তাকিয়ে আছে। বলছে 'সৈন্যবাহিনীতে যোগদান কর'। বলছে 'টাকা আর অভিজাত্য—জীবনে আর কি চাই ?' বলছে, 'নিষ্কর্ম্মা বসে থাকার দিন গেছে, এসো নৌবাহিনীতে যোগ দাও।' বলছে 'তোমার দেশ বিপন্ন হতে চলেছে, তুমি কি লড়াইয়ে আসবে না ?' বলছে আরো অনেক কথা। ভাল ভাল, লোভনীয় সব কথা।

রোজ বিকেলে লোকজন খেদিয়ে নিয়ে আসে ইদ্রিস্ খাঁ। চাষাভূষো, নমশূদ্র, তাঁতী আর জেলেদের। রোজ বক্তৃতা হয়। রিক্রুটিং অফিসার হাত নেড়ে, চীৎকার করে, হেসে, গলা কাঁপিয়ে তাদের যুদ্ধের কথা জানায়, বোমার যুদ্ধে কত রকম ভাল চাকরী আছে তার বিশদ বিবরণী আউড়ে যায়, সবাইকে যুদ্ধে যোগদান করতে আহ্বান জানায়।

মাঝে মাঝে অন্যান্য গ্রামে যায় অফিসারটি দালাল সমেত।

লোকেরা সভয়ে শোনে, আড়ালে গিয়ে হাসে আর মাথা নাড়ে :

"হ্যাঃ, যুদ্ধে যাব, ক্যান,ঘরে কি ভাত নেই একমুঠ?"

"শালারা হেরে ভূত হয়ে যাচ্ছে এবার আমাদের মারতে চায়।"

"কিন্তু বেশ টাকা দেয়—না?"

"দূর্, দূর্,—ওসব ভাঁওতা।"

"ওতে নাম লেখানো মানেই চিত্রগুপ্তের খাতায় নাম ওঠানো।"

"উরে বাপ্—হেই বোমা ফাট্‌লে তো হাত পা একজায়গায় আর ধড় একজায়গায়"—

"শুধু তাই নয়, টিপ্‌ছই দিয়ে যেতে হবে, ফিরে আসবার জো নেই আর।"

"কেন? ফিরে আসতে পার—ভূত হয়ে—হাঃ হাঃ হাঃ।"

কিন্তু তবু তাঁবুর চারিদিকে সারাক্ষণ ভীড় থাকে। উলঙ্গ ছেলেমেয়ে আর নিষ্কর্ম্মা লোকেরা কৌতূহলী চোখ মেলে খাকী পোষাকধারী লোক-জনদের চলাফেরা দেখতে থাকে।

ভীড় বাড়ে সকাল সন্ধ্যেবেলায়। লোকগুলো তখন কুচ্‌কাওয়াজ করে। সে এক দেখবার জিনিষ বটে।

আর এই সবের মাঝে, হাজার ভয় আর অবজ্ঞা সত্ত্বেও অনেক লোকজন আসে—নিরন্ন, অভাবগ্রস্তরা। শান্তিহীনেরা আর বৈচিত্র্য-প্রেমিকেরা। এসে তাঁবুর বাইরে খানিকক্ষণ দাঁড়ায়, তেঁতুলগাছটার নীচেও অনেকে বসে। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে তারা, তারপরে সোজা তাঁবুটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

"কি চাই?" একজন খাকী পোষাক ভুঁরু কুঁচ্‌কে প্রশ্ন করে।

"লড়াইয়ে—যাব—আমি।"

"বটে! ে [illegible] শা—"

তারপরে চ [illegible] প্রায় নগ্ন করে দলের ডাক্তার নানারকম ভাবে পরীক্ষা ক [illegible]। ওজন নেয়, মাপ নেয় বুকের আর দৈর্ঘ্যের। কপিং [illegible] দিয়ে সেই সব ওজন মাপ আর বয়সের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তা [illegible] উপর লিখে দেয়। আর এক দফা পরীক্ষা চলে। তাদের শিক্ষ [illegible] কতদূর তা দেখা হয়। তারপরে ফর্ম্মের উপর আর বণ্ডের উপ [illegible] দের বাপ পিতামহ, জাত বর্ণ আর গ্রাম থানার ইতিহাস খু [illegible]। তখন সারি বেঁধে দাঁড় করানো হয় তদের। অফি [illegible] রে, কাগজগুলো পড়ে কে কোন্ কাজের উপযুক্ত [illegible] বয় ভবিষ্যেতের কথা বলে, সোনালী ভবিষ্যতের [illegible] কাজ—ওরা সব সই করে বা টীপ সহি দেয় বণ্ডের উপরে আর [illegible] কণ্ঠে শপথ গ্রহণ করে। ব্যাস্। আজই কিম্বা কাল যেত হবে। সদরে তারপরে ট্রেনিং। তারপরে মেশিনগান আর বোমা, জীবনকে হাতে নিয়ে জুয়াখেলা। সেখেলায় হার হলে সেটা একান্তভাবে তাদের জিত্ হলে তা সরকারের প্রাপ্য, তাদের নয়। অনুগত প্রজার রাজার প্রতি কর্ত্তব্য পালনই বড় কথা। ওরাও অত সব বুঝতে চায় না। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝামাঝি জীবন নামক যে অস্তিত্বটা তার জন্য যা অত্যাবশ্যক—সেই খাদ্য আর পোষাক পেলেই ওদের চলবে।

নির্ম্মল বাবুদের মাঠে যদুপতিবাবু বিকালবেলায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সুব্রত ছিল, তাছাড়া প্রায় শতাধিক শ্রোতাও ছিল।

"তোমরা যুদ্ধে যেও না ভাইসব। এ যুদ্ধ কার জন্য? আমাদের জন্য নয়। আমরা এ যুদ্ধ বাধাইনি। জার্ম্মানী, জাপান আমাদের কিছু করেনি। আমরা কেন যাব এ যুদ্ধে? এ যুদ্ধে কার স্বার্থ বেশী? ইংলণ্ডের। ইংরেজের। কিন্তু মহাপ্রভুরা আমাদের জন্য কি করেছেন? আমাদের দু'শ বছর অন্ধকারে রেখেছেন তাঁরা। আমাদের ক্রীতদাস, পশু করে রেখেছেন। আমাদের রক্তের বিনিময়ে যে জয়লাভ হবে তাতে আমাদের কতটুকু অংশ? কিছুই না। আমরা পরাধীন, আমরা অন্ত্যজ, আমাদের ওতে কোন অধিকার নেই। যদি আমাদের ওরা স্বাধীন বলে স্বীকার করত, যদি ওরা আমাদের মানুষ বলে গণ্য করত, তাহলে আমরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দিতাম। মিত্র ভেবে। কিন্তু সে ঔদার্য্য ওঁদের নেই। তবে কেন আমরা যুদ্ধে যোগদান করব? ভাইসব কথায় ভুলো না, ভেল্‌কীতে বিভ্রান্ত হয়ো না। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে বটে কিন্তু সে এই ইংরেজ সরকারেরই বিরুদ্ধে—আর কারো বিরুদ্ধে নয়।"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই যদুপতিবাবুকে গ্রেপ্তার করা হল। যুদ্ধ বিরোধী বক্তৃতা। রাজদ্রোহ। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্‌।

দমকা ঝড় এলো হরিচরণের সংসারে। আকস্মিক একটা বিপর্য্যয়ে সব কিছু যেন উলটে গেল তার জীবনে।

ব্যাপারটা হল নন্দ'র জন্য। নন্দই তার জন্য দায়ী।

আগের দিন রাত্রে ললিতা'র সঙ্গে মনকষাকষি হয়েছিল।

সহরে যাবে সে। ললিতা বলল। কারণ সেখানে নাকি তার দূর সম্পর্কের কে এক মাসী হাসপাতালে পড়ে রয়েছে তার সঙ্গে সে দেখা করবে।

নন্দ হঠাৎ যেন বিগ্‌ড়ে গেল। ললিতা দিনকয়েকের জন্য তার চোখের আড়ালে যাবে নন্দ সে কথা সহ্য করতে পারল না।

"তুমি যেতে পাবে না ললিতা।" সে বলল।

"কেন?" ললিতা অবাক হয়ে গেল।

ললিতাকে বুকে টেনে নিয়ে মাথা নাড়ল, "আমার কষ্ট হবে।"

ললিতা হাসল, "দূর বোকা, মাত্র দু'তিনদিনের জন্য—দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

"না।" উদ্ধত ভঙ্গীতে নন্দ আবার মাথা নাড়ল।

এই নিয়েই মনকষাকষি হল। নন্দ বলল যে ললিতা যেতে পাবে না। ললিতা নন্দর ছেলেমানুষীতে বিরক্ত হয়ে উঠল। সে বলল যে সে সহরে যাবেই।

নন্দ বলল, "আমার মনে দুঃখু দিও না ললিতা।"

ললিতা বলল, "তুমি ছেলেমানুষী করো না ওস্তাদ।"

"আচ্ছা দেখি কেমন করে যাও তুমি।"

"দেখো।"

ঐ পর্য্যন্তই হয়ে রইল।

পরদিন কারখানা যাবার সময়ে নন্দ দেখ্‌তে পেল যে ললিতা বাড়ীতেই আছে।

নন্দকে দেখে ললিতা মুচ্‌কি হাসল, "যাও, আমিও আসছি একটু বাদে।"

নন্দ আশ্বস্ত হল। ললিতা তাহলে যাবে না, সে কারখানাতেই আসবে তবে। যাক্।

কিন্তু ললিতা এল না।

নন্দ'র মাথায় যেন আগুণ ধরে গেল। কোনমতে বাকী সময়টা কাটিয়ে সে কারখানা থেকে বেরোল।

সোজা ললিতা'র ওখানে গেল সে। মস্ত বড় তালাবন্ধ দরজাটার দিকে দুটো লোহিত নয়ন মেলে সে খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ ঘৃণায়, ক্রোধে তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তার অন্ধ অনুরাগের উল্‌টো পিঠ্‌টা এবার দেখা গেল। মুখ চোখ তার বিকৃত হয়ে উঠল। বেশ্যা মাগী কোথাকার, শেষ পর্য্যন্ত তার কথা উপেক্ষা করে সত্যি সত্যিই শহরে গেল! কেন তার হাতে পায়ে ধরে সে কি মত নিতে পারত না! আর সকাতরে অনুরোধ করলে নন্দই কি অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারত!

নন্দ'র মনের একটা অংশ এখনো অপরিণত রয়ে গেছে। তাই খানিকটা পেয়েই অনেকটা সে কল্পনা করে নেয়। তাই সে আশা করে যে বেশ্যা ললিতা তাকে ভালবেসে তার ক্রীতদাসী হয়ে পড়বে। তাই সে ললিতা চলে যাওয়াতেই এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল।

রাগের চোটে নন্দ কি করবে ঠিক করতে পারে না। খানিকটা শ্মশান বৈরাগ্যের ভাবও তার মাথায় উদিত হল। দুর ছাই, কে যায় বাড়ীতে! দুনিয়া'তে কে কার?

কিন্তু ঠিক কি চায় নন্দ? নন্দ নিজেই তা জানে না, বুঝতে পারে

না। আগুনের ধোঁয়ার মত উত্তপ্ত ধোঁয়ায় ভরা মস্তিষ্ক নিয়ে সে পা বাড়াল। কোথায় যাবে সে? কোথায় যাওয়া যায়।

তার ক্ষুধার্ত্ত জঠর, তার তৃষ্ণার্ত্ত জিহ্বা উত্তর দিল। ভাঁটিখানা।

মজুর বস্তীর শেষপ্রান্তে মহিমসা'র মহিমান্বিত ভাঁটিখানা। বেশ ভীড় জমেছে সেখানে।

এক ঠোঙা ঘুগ্‌নি দানা আর পেঁয়াজ বড়া নিয়ে নন্দ এক কোণে বসে পড়ল।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাট্‌তে লাগল।

পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষিত হল।

উষ্ণ, কম্পিত মুহূর্ত্তগুলো'র পাখায় ভর দিয়ে রাত ঘনিয়ে এল।

স্তিমিত, ঝাপ্‌সা নয়ন মেলে নন্দ চারদিকে তাকায়। সব অন্ধকার। আঃ। চেতনায় কালো আগুনের জ্বালা দেহ গ্রন্থিতে মদির অনুভূতি। আঃ। নেশা জমেছে, নেশা ভয়ঙ্কর জমেছে।

ঠিক মাঝরাতে, যখন অন্ধকারে, নিবিড় ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের মধ্যে প্রেত আর প্রেতিনীদের অভিসার আরম্ভ হয়, ঠিক তেমনি সময়ে নন্দ বাড়ী ফিরল।

সয়ে গেছে সব। সয়ে সয়ে পাথর হয়ে গেছে কাজললতা। আজকাল তাই আর জেগে জেগে প্রতীক্ষা করার মোহ নেই তার। উগ্র বিষের জ্বালায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে সে। হঠাৎ রুদ্ধ দ্বারের উপর যখন মত্ত করাঘাত ধ্বনিত হয় তখন সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, বেদনায় কণ্টকিত ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত দেহটাকে টেনে তুলে দরজার দিকে এগোয়।

আজও তাই হল।

"এ্যাই—দরজা খোল্—এ্যাই মাগী"—জড়িত কণ্ঠে একটা পশু যেন গর্জ্জাচ্ছে দরজার ওপিঠে।

বাড়ীর সবাই জেগে উঠেছে। প্রতিদিনই জাগে। কিন্তু কিছু বলে না আর বলবার মত কথা খুজে পায় না ওরা। কেবল অন্ধকারে, শয্যার উপরে বসে বেদনার আতিশয্যে ওরা বুকে হাত চাপা দেয়।

"এ্যাই কথা শুনছিস্ না?" নন্দ চীৎকার করে ডাকল।

"খুলছি।" কাজললতা উত্তর দিল।

"খুলছি"—মুখ ভেংচাল নন্দ, "এত দেরী হচ্ছে কেন তবে, এ্যাঁ?"

পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত পা টেনে টেনে এগিয়ে গিয়ে দরজাটাকে খুলল কাজললতা। দমকা বাতাসের মত নন্দ ঘরের ভিতর এল। তার সঙ্গে এল একটা অশুচি গ্লানি আর বিষাক্ত বেদনা, এল নূতন একটা আঘাত।

ঘরের মধ্যে আলো ছিল না। অন্ধকারে হোঁচট খেল নন্দ।

অশ্লীল গালি দিয়ে সে বলল, "বাতিটা জালিয়ে রাখলে কি হয়? পাজী মাগী কোথাকার—"

বহুদিনের তিল তিল সঞ্চিত বিরাগ আর জ্বালা অগ্নিগর্ভ বারুদের মত বিস্ফোরণের প্রত্যাশায় নিঃশব্দ হয়ে ছিল। আজ অতি সাধারণ একটা কথায় অতি ক্ষীণ অগ্নিসংযোগের ফলে সেই বহুসংযমের বাঁধ ভেঙ্গে বিস্ফোরণই ঘটল।

বাতিটা জ্বালাতে বসে তিক্তকণ্ঠে বলল কাজললতা, "গাল দিও না—আমি রাস্তার ভিখিরি নই।"

প্রদীপের আলোতে দেখা গেল মত্ত নন্দকে। চোখ দুটো জড়িয়ে

এসেছে, কিন্তু যখন সে জোর করে চোখ মেলছে, তখন তার রক্তাক্ত চোখের আলোকিত চাহনি দেখে ভয় লাগছে।

নন্দ বিকৃতকণ্ঠে আরো কি যেন বলল, বোঝা গেল না। সে তক্তা-পোষের দিকে এগিয়ে গেল। তক্তপোষের মাঝখানে ছেলেটি শুয়েছিল। নেশার ঘোরে টাল সাম্‌লাতে না পেরে এমনভাবে শয্যায় এলিয়ে পড়ল নন্দ যে তার ডান হাতটার ধাক্কা খেয়ে ছেলেটা কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

দুচোখ ফেটে যেন আগুন বেরোবে কাজললতার। সে ছেলের দিকে ছুটে গেল, দুহাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে গভীর ঘৃণায় চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলল, "তুমি কি মানুষ!"

শায়িত নন্দ তড়াক করে সোজা হয়ে বসল, সাপের ফনার মত দুলছে তার দেহটা।

"কেন আমি মানুষ নইত কি?"

"সেইটাই তোমায় জিজ্ঞেস করছি।"

"কি জিজ্ঞেস করছিস?" নন্দ দাঁড়াল।

"ছেলেটার দিকেও কি তোমার নজর নেই? এই একরত্তি ছেলেটাকে কি দয়া হয় না?"

"চোপ্"

"না, চুপ্ করব না। অনেক সয়েছি, অনেক জ্বলেছি, তুমি আমায়—"

"চোপ্—চো—প্"—

"না"—চীৎকার করে কেঁদে উঠল কাজললতা, "না তোমায় আমি একটুও ভয় করি না। যে স্বামী বেশ্যার ঘরে মদ খেয়ে পড়ে থাকে তার চোখ রাঙানি চিরদিন খাওয়া যায় না, বুঝলে?"

"কি ?" উদ্যত বজ্রের ভয়াবহ ইঙ্গিত নন্দর দুচোখে, "কি বললি হারামজাদি ?"

"যা বলেছি ঠিকই বলেছি"—

"বটে !"

ঈষৎ লাফিয়ে পড়ল নন্দ কাজললতার উপর। একটা বন্য পশু যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। দুহাতে চড় কিল বর্ষন করে চলল সে কাজললতার উপর।

আচম্কা ব্যাপারটা ! নন্দ মদ খায়, নন্দ বেশ্যাবাড়ী যায়, সব জানে কাজললতা। কিন্তু সে যে তার গায়ে এমন ভাবে হাত তুলবে তা কোনদিনই আশঙ্কা করেনি সে। ঘটনার অকস্মিকতায় কাজললতা প্রথমটা হতবুদ্ধি ও নির্ব্বাক হয়ে গেল। গভীর বেদনায় দুচোখের সামনেকার সমস্ত পৃথিবী যেন, আজ অন্ধকারে তলিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল। ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে বসে পড়ল মাটীর উপর। নিঃশব্দে সে স্বামীর উন্মত্ত প্রহারকে সহ্য করতে লাগল। একফোঁটা জলও এল না তার চোখে।

ওদিকে পাশের ঘরে চাঞ্চল্য জেগেছে। দরজা খোলার শব্দ হল। ওদের দরজায় করাঘাত হল।

"বৌমা—বৌমা"—রাসমণির কণ্ঠস্বর।

"নন্দ"—হরিচরণ গম্ভীরকণ্ঠে ডাকল।

কে শোনে তা ? নন্দ একবারে ক্ষেপে গেছে। আজ কাজললতাকে শিক্ষা দিতে হবে। নারীকে ভালবাসলেই তার সব কথা সইতে হবে নাকি !

ঘরের ভিতর ধ্বনিত হচ্ছে কিল চড়ের শব্দ আর একটা চাঁপা আওয়াজ।

"বৌমা শিগীর খোল দরজা, বৌমা" রাসমণি চীৎকার করে উঠল।

নন্দ এবার থামল।

কাজললতা ধীরে ধীরে উঠল দরজা খুলে দিল।

হরিচরণ আর রাসমণি দ্রুতপদে ঘরে ঢুকল।

"বৌকে মারছিলি হারামজাদা!" হরিচরণের যেন বুক ভেঙ্গে গিয়েছে।

রাসমণি কাজললতার কোল থেকে ছেলেটাকে টেনে নিল। কাজললতা কাঁপছিল, টলছিল। সে এবার বসে পড়ল মাটীতে।

নন্দ বিকৃতকণ্ঠে উত্তর দিল, "মারব না তো কি টাটে চড়িয়ে পূজো করব। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর, না হলে কি চলে?"

হরিচরণ মুহূর্ত্তকালে স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর বলল, "বৌমার কাছে মাফ চা"—

নন্দ চোখ বড় করল "কি!"

"বৌমার কাছে মাফ চা"

"না।"

"আবার বল্‌ছি"—

"না।"

"তবে বেরিয়ে যা তুই এ বাড়ী থেকে"—হরিচরণের গলা কাঁপছে।

"বাবা"—কাজললতা অস্ফুটকণ্ঠে একবার উচ্চারণ করল।

হরিচরণ মাথা নাড়ল "না মা। ওর বড় বাড় বেড়েছে। এই, তোর কাণে কি কথাটা গেল না?"

নন্দ তার রক্তিম নয়ন দুটো পিতার দিকে ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, "কি?"

"বেরিয়ে যা তুই, এবাড়ীতে তোর জায়গা নেই। নিজের অন্যায়ের জন্য, পাপের জন্য মাফ্ না চাইলে তুই আর এবাড়ীতে থাকতে পাবি না!"

নন্দ হাসল, "চলে গেলে শেষে আপ্‌শোষ হবে না তো?"

"একটুও না।"

"বাবা"—কাজললতা আবার আর্ত্তনাদ করল।

রাসমণি স্থির, নির্ব্বাক।

"যা বেরিয়ে"—হরিচরণ কাঁপছে।

নন্দ উত্তর দিল না, একবার পিতার দিকে তাকাল সে, পরে একবার ঘরের সকলের দিকে তাকাল। মাথা নীচু করে কি যেন ভেবেও নিল সে, তারপরে টল্‌তে টল্‌তে খোলা দরজাটা দিয়ে দ্রুতপদে সে বেরিয়ে গেল।

"নন্দ—নন্দ"—রাসমণি আর থাকতে পারল না।

"ওকে ডেকো না"—হরিচরণ গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিল।

"বাবা, ওযে চলে গেল!"—কাজললতার বুকের ভিতরটা কে যেন উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

"জানি, জানি মা!" হরিচরণ হাসল, "যাক্ না। নেশা কমলেই আবার ফিরে আসবে। তাছাড়া একটু শাস্তি ওর পাওয়া দরকার মা, এত বাড় যে ভাল নয়!"

সব বোঝে কাজললতা, সব বোঝে সে। তবু মন কি মানতে চায়? যদি, যদি নন্দ আর ফিরে না আসে? তবে? উঃ।—মাটীর উপর, শ্বশুর শাশুড়ীর সামনেই সে লুটিয়ে পড়ল। অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে দেহটা তার বারংবার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। কিন্তু মুখ দিয়ে তার একটা আওয়াজও বেরোল না, চোখ দিয়ে তার একফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল না। আগুনে পুড়বার সময় কাঠ থেকে একরকম রস বেরোয়, কিন্তু যখন পুড়ে ছাই হয়ে যায় তখন কি আর তাতে কোনো রস পাওয়া যায়?

প্রান্তরের গান

বাইরে বেশ শীত আছে। শুক্লপক্ষের রাত, কুয়াসা গলে গলে পড়ছে। ভৌতিক কুহেলিকা আর সুগভীর নিস্তব্ধতায় সারা গ্রাম আচ্ছন্ন।

তারি মধ্যে উত্তেজিত ও নেশাগ্রস্ত মস্তিষ্ক নিয়ে উদ্দেশ্যহীন প্রেতের মত নন্দ খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াল।

তারপরে নেশা ক্রমে মন্দীভূত হল, শীত লাগতে লাগল। সব পরিষ্কার মনে পড়তে লাগল। এক এক করে সে সব ঘটনাকে খুঁটিয়ে বিচার করল মনে মনে। কিন্তু নেশা কমলেও মনের উত্তেজনা তার কমল না, বরং সুস্থতা যতই ফিরে আসতে লাগল উত্তেজনাও ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। তার বালকোচিত মন ক্রমেই ক্রোধ আর অভিমানে বেলুনের মত ফুলে উঠতে লাগল। অপমান! সে অপমানিত হয়েছে। অন্যায়? হ্যাঁ, হয়ত সে অন্যায় করেছে। নন্দ এখন সুস্থ, সে এখন পক্ষপাতিত্ব করবে না। সমাজ, সংসার যে নিয়মকানুন মেনে চলে তার মতে সে অন্যায়ই করেছে। কিন্তু তাতেই বা কি? তাই বলে স্ত্রীর সামনেই তাকে অপদস্থ করতে হবে! আর কাজললতাই বা কি রকম মেয়ে মানুষ? সে কি পেছন পেছন ছুটে আসতে পারত না, সে কি তার পায়ে মাথা কুটে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারত না? নাঃ, এ সংসারে, কেউ কারো নয়। না, সে পুরুষ মানুষ। সে হার মানবে না, পদাহত নির্লজ্জ কুকুরের মত আবার বাড়ী গিয়ে সে নূতন করে অপমানকে স্বীকার করে নিতে পারবে না। শীত করছে? বস্তীর কোনো বন্ধুর ওখানে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কাল? না, সে আর এ গ্রামেই থাকবে না। কি করবে সে? সত্যি, কি করবে সে? খুব ভাবল নন্দ। খুব ভাবল সে। হঠাৎ সে মাথা নাড়ল। ঠিক, কেউ কারো না এ পৃথিবীতে। বাপ মা আর বিয়ে-

করা বৌ যখন আপনার নয়, তখন এক নীচ বেশ্যা কি করে তার আপনার হবে! সেই ভাল, এ গ্রামকে সে পরিত্যাগই করবে। নূতন একটা উত্তেজনায়, অভিমানে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর পথই বেছে নিল নন্দ। যা হবার হবে, এজীবনটা ত' একটা জুয়াখেলা। না হয় নরকের আরো খানিকটা সে এবার দেখে নেবে। সেই ভাল, সে আর বাড়ী যাবে না। নন্দ যুদ্ধে যাবে।

তাই হল।

ভোর হতেই সে বেরিয়ে পড়ল। রাত্রিবেলায় ঠিক ঘুমোয় নি সে। উত্তেজনা, চিন্তা আর আসবে অবসাদে তার চোখ দুটো রঙীন, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে।

বন্ধুর ওখানে এককাপ গরম চা গিলেই সে বেরোল। হাটের মাঝখানে, কাছারী আর থানার সামনে যেখানে ছাউনী পড়েছে; তাঁবুর গায়ে, কাছারীর গায়ে যেখানে ইস্তাহারের ছবি থেকে সহাস্য-মুখ সৈনিকেরা ডাক দিয়ে বলছে 'সৈন্যবাহিনীতে যোগদান কর—দাঁড়িয়ে কেন ?'—ঠিক সেখানে গিয়েই সে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

একজন খাকী পোষাক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, সে হঠাৎ কটমট করে নন্দ'র দিকে তাকাল, "কি চাই তোমার, এ্যা ? কেয়া মাংটা ?"

নন্দ একটু থতমত খেল, "আজ্ঞে ?"

"ড্যাম্—কি চাই তোমার ?"

"আজ্ঞে যুদ্ধে যাব।"

"বাই জোভ্—তবে দাঁড়িয়ে কেন এসো এসো"—হঠাৎ যেন অতিমাত্রায় অমায়িক হয়ে গেল লোকটা, যেন শ্বশুরের মত সস্নেহ হয়ে উঠল।

তারপরে সেই একাগ্র মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা। দৈর্ঘ্য আর বুকের মাপ, ওজন আর বয়সের হিসাব নেওয়া হল। তারপরে লেখাপড়ার পরীক্ষা আর সারি বেঁধে দণ্ডায়মান হওয়া। রিক্রুটিং অফিসারের মিষ্টি মিষ্টি কথা। প্রলোভন। তারপরে বণ্ডে সই করে শপথগ্রহণ করা হল। তারা কেউ পালাবে না, প্রাণভয়ে ভীত হবে না, রাজার দেশের সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন দেবে। সর্ব্বশেষকথা আজই অপরাহ্নে সদরে রওনা হতে হবে।

নন্দ সৈনিক হল। রাগ আর অভিমানে প্রথমটা বেশ লাগছিল তার। সে কল্পনা করছিল যে সে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে, হাতে সঙীন-চড়ানো বন্দুক, চোখে কঠোর সঙ্কল্প। বেশ লাগাছিল ভাবতে।

কিন্তু হঠাৎ যেন ফুলে ওঠা বেলুনটা ফেটে গেল। আজই বিকেলে সদরে যেতে হবে। আজই। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই। কিন্তু কি লাভ হল তাতে? হঠাৎ মৃত্যুর কথা মনে পড়ল তার। যে কোনো মুহূর্ত্তে একটি অদৃশ্য গুলির আঘাতে তার প্রাণ যেতে পারে, একটা বোমার ঘায়ে রেণু রেণু হয়ে সে আকাশে উড়তে পারে!

আর সেই সঙ্গেই বাড়ীর কথা মনে পড়ল তার। বাপ মা, বোন, কাজললতা আর ছেলেটার ছবি চোখের সামনে ভীড় করে এল। কাজললতার কান্না আর ছেলেটার ককিয়ে কেঁদে ওঠার কথা তার মনে পড়ল। তারা সব অপরূপ হয়ে উঠে নন্দকে যেন দুর্ণিবার ভাবে টানতে লাগল। নিজের অতীত ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অনুতাপ আর গ্লানির বোঝায় তার শরীর মন যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইল। ছিঃ, একি করেছে সে!

আর কি ফেরা যায় না?

সেই প্রথম খাকী-পোষাক কাছে এল।

"শুনুন ?"

"কি ?"

"আজকেই যেতে হবে ?"

"হ্যাঁ হে। আর পাঁচ ছয় ঘণ্টা বাদেই। যাও, বাড়ী গিয়ে তৈরী হয়ে এসো।"

"আজ্ঞে যাচ্ছি।" নন্দ চুপ হয়ে গেল।

খাকী-পোষাক চলে যাচ্ছিল।

নন্দ আবার আকুলকণ্ঠে ডাকল তাকে, "শুনুন"—

খাকী-পোষাক বিরক্ত হয়ে উঠল, মিলিটারী মেজাজে বলল সে "কি হয়েছে তোমার বলত ?"

"আজ্ঞে একটা কথা ছিল।"

"কি ?"

"আমি যুদ্ধে যাব না ,"

"হোয়াট্ !"—খাকী-পোষাক খাড়া হয়ে দাঁড়ালে, দুচোখে তার ক্রোধ ঘনিয়ে এল, "কি বলছ তুমি ! এ কি ইয়ারকি হচ্ছে, এ্যাঁ ? সাবধান, বণ্ডে সই দিয়েছ তুমি, এ সব ছেলেখেলা নয়। ও সই করার পর আর পাল্‌টানো চলে না, নিজের বিধিলিপিতে সই করেছ তুমি ও আর মেটানো যাবে না। ওসব বাজে কথা ছাড়, তৈরী হয়ে এসো। আর হ্যাঁ, পালাবার চেষ্টা করো না, এখন যুদ্ধে যেতে না চাইলে হয় জেল না তো আরো সাংঘাতিক কিছু শাস্তি পাবে তুমি। বুঝলে ?"

খাকী পোষাক বুটজুতোর আওয়াজ তুলে চলে গেল।

বিধিলিপি ! তাই বটে।

মুহূর্ত্তকাল ভাবল নন্দ। কেন সে উতলা হচ্ছে। ভয় পাচ্ছে ! দূর, এ সংসারে কে কার ! তার যদি কেউ থাকত তাহলে কি আর খুজে বেড়াতে

না, কেউ কি তাকে ডাকতে আসত না ! নাঃ, আর ভয় নয়, ভাবনা নয়, জীবনকে নিয়ে জুয়াই খেলবে সে। সেই ভাল। সে আর বাড়ী যাবে না এখন। কিন্তু তবু চোখে তার জল এল।

কিন্তু নন্দ মিথ্যে অভিমান করছে। তার বিষয়ে সবাই ভাবছিল বৈকি।

নেশা কাটবার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যখন নন্দ বাড়ী ফিরল না, তখন সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সবচেয়ে বেশী ব্যস্ত হল হরিচরণ।

পথ চেয়ে আর অপেক্ষা করে করে ভোর হল। তবু এল না নন্দ। তখন হরিচরণ একবার ঘুরে এল আশপাশ আর নন্দ'র বন্ধুদের বাড়ী থেকে। কেউ বলতে পারল না কিছু। খবর শুনে অর্জ্জুন বেরোল নন্দ'র খোঁজে।

খুঁজতে খুঁজতে ঠিক জায়গাতে গিয়েই হাজির হল অর্জ্জুন।

হাটের মধ্যস্থিত ইস্তাহার-লট্‌কানো তেঁতুল গাছটার নীচে বসে নন্দ বিড়ি ফুকছিল। তার উদাস্ বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত।

সব কথা জানতে পারল অর্জ্জুন।

তার মুখে আর কথা সরে না, তবু সে প্রশ্ন করল, "কিছুই হতে পারে না তাহলে ?"

নন্দ ঘাড় নাড়ল।

"তবে বাড়ী চল্।"

"না।"

"নে, রাগ করিস্ না আর। রাগ করে তো নিজের সর্ব্বনাশ করলিই আর কেন ?"

"না।" দৃঢ়কণ্ঠে মাথা নাড়ল নন্দ।

অর্জ্জুন একটু চিন্তা করল। উহুঁ, প্রবীরকে খবর দেওয়াই ভাল। সে শিক্ষিত লোক, হয়ত অফিসারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে কিছু নিষ্পত্তি করতে পারে। আচ্ছা, আপাততঃ নন্দ এখানেই থাক্।

বাড়ীতে সবাই খবর পেল।

যুদ্ধ! শব্দটাই যেন একটা বোমা বিস্ফোরণের মত ভয়ঙ্কর। যুদ্ধ মানেই ত মৃত্যু।

বাড়ীতে কান্না শুরু হল। ধূলোয় আছড়ে পড়ে কাজললতা মাথা কুট্‌তে লাগল।

হরিচরণ অর্জ্জুনের দিকে তাকাল, বিড় বিড় করে প্রশ্ন করল সে, "কি করি তবে?"

অর্জ্জুন বলল, "প্রবীরকে খবর দিন্।"

ঠিক্।

মাধবী দৌড়োল। বিয়ের বয়স হয়েছে মাধবীর, যখন তখন রাস্তায় বেরোয় না সে। তবু সে আজ দৌড়েই গেল। তার ভাই, তার একটি মাত্র ভাই যুদ্ধে যাচ্ছে! যুদ্ধ মানেই ত' মৃত্যু! তার ভাই, তার একটি মাত্র ভাই আজ সেই যুদ্ধে হয়ত মরতেই চলেছে, মাধবী কি করে স্থির থাকে?

প্রবীর খবর পেল। সে গেল রিক্রুটিং অফিসে, দেখা করল অফিসারের সঙ্গে। সব কথা খুলে বলে নানাভাবে অনুরোধ করল নন্দকে ছেড়ে দেবার জন্য।

কিন্তু কিছুই হল না। প্রবীর ব্যর্থ হল।

নন্দকে যুদ্ধে যেতেই হবে, আজই তাকে সদরে রওনা হতে হবে। যা হয়ে গেছে তার রদ হবে না, বিধিলিপিকে কে খণ্ডাবে বল?

নন্দ বাড়ী গেল।

তাকে আর চেনা যায় না রাতারাতি যেন একটা বিপ্লব হয়ে গেছে তার ভিতরে। রাতারাতি নয়, সৈনিক হওয়ার পর থেকে। সে বাড়ীতে যাওয়ার পর ভীত, দুঃখহত পরিবারে যা ঘটল তা বর্ণনা করে কি হবে। সে বড় বেদনার কাহিনী।

হরিচরণ নিঃশব্দে চোখের জল মুছ্‌তে লাগল ; রাসমণি উন্মাদিনীর মত আবোল তাবোল বক্‌তে লাগল। মাধবী কাঁদল না, চীৎকারও করল না, কিন্তু এঘরে ওঘরে ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াতে লাগল সে। প্রবীর বাইরের দাওয়ায় চুপ করে বসে আছে। যে প্রবীরকে দেখবার জন্য মাধবী প্রবীরের বাড়ীতে গিয়ে পর্য্যন্ত হাজির হয়, সেই প্রবীরই কতক্ষণ ধরে বাইরে বসে আছে। অথচ আজ একটুও আগ্রহ হচ্ছে না বাইরে যেতে বা দরজার আড়াল থেকে উঁকি মারতে। রক্তের টানটা আজ বড় হয়ে উঠেছে।

আর কাজললতা? আলুথালু বেশ, বিপর্য্যস্ত কেশ তার, চোখে জলের ধারা। জ্বলন্ত কাঠের রসধারা আবার দেখা যাচ্ছে।

বারংবার সে নন্দর পায়ে মাথা খুড়তে লাগল আর প্রশ্ন করতে লাগল, "কেন তুমি এ সর্ব্বনাশ করলে গো—কেন, কেন?"

পাথর হয়ে গেছে নন্দ। বুকের ভিতরটা তার মুচড়ে উঠছে, ছুটে কঠিন কিছুর উপর মাথাটা খুড়ে ভেঙ্গে ফেলতে ইচ্ছে করছে তার কিন্তু পারছে না সে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে চীৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছে তার কিন্তু সে অক্ষম। একি বিধিলিপি!

হঠাৎ সে ছেলেটার দিকে তাকাল। কি মায়াময়-দুটি অবোধ চোখের চাহনি! ছেলেকে সে বুকে জড়িয়ে ধরল। কি সুকোমল স্পর্শ! একি করেছিল সে! হঠাৎ যেন প্রথম জন্ম হল নন্দ'র। যেন হঠাৎ সুস্থ হল

সে। একি করেছিল সে! ললিতার আকর্ষণে সে কি সর্ব্বনাশ করেছে ওই হতভাগিনীর আর এই ছেলেটির! যুদ্ধে নাম লিখিয়ে কেন সে আবার নূতন সর্ব্বনাশের দিকে পদক্ষেপ করল? ঠিকই, তার বিধিলিপি।

কাজললতাকে বুকে টেনে নিল সে, তার বুকে মাথা রেখে অকস্মাৎ সে কেঁদে ফেলল আর ভগ্নকণ্ঠে বলল, "আমায় মাফ্ কর, কাজললতা আমায় তুমি মাফ্ কর।"

চোখের জলে সব ধুয়ে মুছে গেল। নন্দ'র গ্লানি আর জ্বালা, কাজললতার দুঃখ আর বেদনা সব চোখের জলের সঙ্গেই ধুয়ে মুছে গেল। আগামী দিনের যুদ্ধ আর মৃত্যুর কথা, বিচ্ছেদ ও শূন্যতার কথা ওরা সব ভুলে গেল। ভুলভ্রান্তি, অন্যায়, অবিচার আর মনকষাকষির পর আসন্ন বিদায়ের প্রাক্কালে বুকে মাথা রেখে এই যে অশ্রুবর্ষণ করল নন্দ তাতে সব পৃথিবী যেন আবার ওদের কাছে আলোয় ঝলমল হয়ে উঠল, আবার বাঁচবার জন্য একটা আকুল পিপাসা যেন ওদের মনে জাগল। ওদের হারানো প্রেম আবার ফিরে এল, ভাঙ্গা কাঁচ যেন আবার জোড়া লাগল।

মধ্যাহ্ন শেষ হলো। সময় হলো যেতে হবে।

প্রবীরও ঘাটে গেল। একটা বড় নৌকা খালঘাটে বাঁধা রয়েছে, তাতে জন বারো লোক, দুজন খাকী পোশাকধারী তাদের নিয়ে যাচ্ছে। নন্দও হাজির হয়েছে আর তার পেছন পেছন চোখের জল ফেলতে ফেলতে গেছে হরিচরণ, রাসমণি আর ছেলে কোলে করে কাজললতা। অর্জ্জুনও আছে। নন্দ যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, মুখে চোখে তার প্রাণের কোনো সাড়া নেই, সৈনিকের খাতায় নাম লিখিয়েই সে যেন মরে গেছে। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে। কলাতিয়ার গাছ-

পালা, নদী নালা, আকাশ বাতাস আর ফুলফলকে সে যেন শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে।

ওদিকে ওরা কাঁদছে।

প্রবীর দূরে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ তার অসহ্য মনে হল এই করুণ দৃশ্যকে। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, পালাতে ইচ্ছে করল তার।

ঘাটে সবাই এসেছে নন্দকে বিদায় দিতে, কেবল মাধবী আসেনি। ইচ্ছে করেই আসেনি সে, ভাই মরতে যাচ্ছে একথাটা সেই সব থেকে বেশী করে বিশ্বাস করেছে বলে।

পা টিপে টিপে প্রবীর সরে পড়ল সেখান থেকে।

"মাধু"—প্রবীর ডাকল।

দরজা খোলাই রয়েছে। মনে হয় বাড়ীটা যেন হঠাৎ পোড়ো হয়ে পড়েছে।

"মাধু"—

বাড়ীর ভিতরে ঢুকল প্রবীর।

ভিতরের দাওয়ায়, বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে মাধবী চুপ করে বসে রয়েছে। তার দৃষ্টি অর্থহীন।

"মাধু"—

মাধবী প্রবীরের দিকে তাকাল।

"দাদা গেছে?" শুষ্ককণ্ঠে সে প্রশ্ন করল।

"এইবার যাবে—সবাই তৈরী"—

মাধবী উত্তর দিল না।

দুজনেই চুপ করে আছে।

হঠাৎ মাধবী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

"মাধু, কাঁদছ!" বেদনায় প্রবীরের বুকটা মুচড়ে উঠল। আশ্চর্য্য!

সে মাধবীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, হাঁটু গেড়ে বসল। মাধবীর চোখের জল যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। মাধবী কাঁদছে কিন্তু কি অপরূপই না দেখাচ্ছে তাকে।

একটা কিছু করতে হবে, মাধবীকে সান্ত্বনা দিতে হবে! প্রবীরের মন বলল।

ডান হাত দিয়ে সে মাধবীর চিবুকটা তুলে ধরল। অশ্রুধৌত মুখ-মণ্ডল। কোঁকড়াঁনো চুলের রাশি, টানা টানা ভুরু, হরিচরণের মত ডাগর ডাগর দুটি চোখে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলের পর্দ্দা। অপরূপ। তার হৃদয়ের মধ্যে মাধবী যে কোন নিভৃত মুহূর্ত্তে এসে নিজের আসনটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে তা প্রবীর এতদিন ঠিকভাবে জানতে পারেনি কিন্তু আজ সে জানতে পারল। ভুল নয়, সে বোধ হয় মাধবীকে ভাল-বাসতে শুরু করেছে।

"কেঁদো না মাধু—ছিঃ"—

সমবেদনা! স্পর্শ! মাধবী তার কল্পনার প্রবীরের সঙ্গে মনের মধ্যে নিরন্তর যে মান অভিমান করে তা যেন এই সমবেদনা আর স্পর্শের ফলে আজ একটা গতিপথ পেল।

সশব্দে কেঁদে উঠল মাধবী। দুহাত বাড়িয়ে প্রবীরের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে, তার কাঁধে মাথা রেখে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

"কেঁদো না মাধু—ছিঃ"—প্রবীরের চেতনা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু একি বিপদ! যদি কেউ এসে পড়ে!

"আমার দিব্যি—কেঁদো না লক্ষ্মীটি"—

মাধবী কান্না চাপতে চেষ্টা করতে লাগল।

দুটি মৃণালভুজের আর একটি ইন্দুমুখের উষ্ণ স্পর্শ। প্রবীরের

মনের মধ্যে হঠাৎ যেন দেবাসুরের সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল। আর সেই প্রচণ্ড সংগ্রামের সংঘাতে সে বেদনায় বিবর্ণ হতে লাগল।

"ছাড়—মাধু"—

"না"—

"ছিঃ"—

"না।"

"কেঁদো না—থামো।"

"থেমেছি।"

"এবার ছাড় তবে"—

"না।"

"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

"এতদিনে টের পেলে তুমি?" মাধবী কান্নার মধ্যেই বিকৃত হাসি হাসছে। আর কাঁদছেই বা কি জন্যে এখন সে? নন্দর জন্য? হ্যা কান্নাটা নন্দর জন্যই শুরু হয়েছিল বটে কিন্তু শেষ হল নিজের জন্য, প্রবীরের জন্য। আশ্চর্য্য মেয়ে এই মাধবী।

কিন্তু না, প্রবীর আর মাথা ঠিক রাখতে পারছে না।

মাধবীর হাত দুটো জোর করে ছাড়িয়ে দিল প্রবীর, হেসে বলল, "অত অবুঝ হলে কি তোমায় সাজে মাধু? নন্দ যুদ্ধে গেছে, তাতে কান্নার কি আছে বলত? দেশ যদি স্বাধীন হয় তবে তো আমরা সবাই যুদ্ধে যাব, যুদ্ধ করব। আর যুদ্ধে গেলেই কি সবাই মরে? তা হলে তো পৃথিবী একদিনেই শেষ হয়ে যেত। কান্না থামাও দেখি। হ্যাঁ এবার চোখ মোছ।"

মাধবী চুপ করল, কেবল প্রবীরের মুখের দিকে তৃষ্ণার্ত্তের মত সে চেয়ে রইল। সব ভুলে গিয়েছে মাধবী।

"আমি যাচ্ছি মাধু" প্রবীর উঠে দাঁড়াল।

"যাবেই?"

"হ্যা, আবার পরে আসব।"

ছুটে পালাল প্রবীর।

মাধবী আবার কাঁদতে বসল।

নন্দ যুদ্ধে গেল।

আরো অনেকেই গেল। তাদের আগেও গিয়েছে অনেকে।

কিন্তু তবু কিছু হলনা। দুর্ব্বার গতিতে প্রচণ্ড বিক্রমে, জাপানীরা এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের বিজয়-পতাকা একের পর এক, নূতন নূতন দেশের নির্জ্জন শ্মশানের মাঝে পত্ পত্ করে উড়তে লাগল। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও গেল। গেল সিঙ্গাপুর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বড় বড় ঘাটিগুলো থেকে ইউনিউন জ্যাক অপসারিত হল। বিজয় গর্ব্বিত জাপ সৈন্যদের পদধ্বনি আর কামানের গর্জ্জন ব্রহ্মদেশের বাতাস কাঁপিয়ে ভারতবর্ষেও পৌছোল।

ভারতবর্ষে তখন আলোড়ন চলছে। ভয়, ভাবনা, আশা, নিরাশা। সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে বেতার মারফৎ। লোকে উত্তেজিত হচ্ছে ইংরাজের বিপদ দেখে, ভয় পাচ্ছে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায়। পরাজয় আর ভারতবর্ষের এই উত্তেজিত অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও শঙ্কিত হল। ভারতীয়দের পোষ মানাবার জন্য একটা চেষ্টা না করলেই নয়। বিলেৎ থেকে দূত এলেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্। ভারতবর্ষের সংবাদ পত্রগুলোতে বড় বড় ছাপার হরফে নানা জল্পনার খোরাক জুটতে

লাগল। দেশময় সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। সাহেব দূত এসে ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। ক্রিপস্ তার ব্যাগের ভিতর থেকে নূতন লাড্ডু বের করলেন, দিল্লী-কা-লাড্ডুকেও লজ্জা দেয়। তিনি বললেন যে ভারতবর্ষ যুদ্ধের পর স্বাধীনতা পাবে বটে কিন্তু আপাতত দেশ শাসনের ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে দেওয়া যেতে পারে না। কংগ্রেসের ইচ্ছামত যুদ্ধের সময়ে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে ইংরাজেরা নিজেদের কবরের ছবি দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেল। দৌত্য ব্যর্থ হল। ভারতবর্ষ অপমানিত হল। নিরাশা ও বিক্ষোভের আগুনে ছাইচাপা আগুনের মত সমস্ত দেশ জ্বলতে লাগল, তার নজর এবার জাপানী আক্রমণের গতির দিকে পড়ল। ভারতবর্ষ জাপানের হাতে যাক্—কোনো ভারতীয়ই তা চাইল না তবে ব্যর্থতায় পীড়িত হয়ে মনে মনে অনেকেই কামনা করল যে ইংরেজেরা যেন জাপানীদের কাছে আরো লাঞ্ছিত হয়। নিরস্ত্র, দুর্ব্বলের এ মনোভাব নিন্দনীয় হলেও অস্বাভাবিক নয়।

মোটকথা ভারতবর্ষের বুকের উপরকার শিলাস্তূপ একইভাবে অনড় রইল, তার শৃঙ্খলে এতটুকুও ক্ষয় দৃষ্ট হল না। আপোষ নয়, সংগ্রামের পথে এবার যে না গেলেই আর নয়—সে কথা দেশের সবাই বুঝল। কিন্তু কংগ্রেস তা এড়াতে চাইল।

শেষ কথা এই যে ভারতবর্ষ শুধু আত্মদাহী অগ্নিজ্বালাতেই জ্বলতে লাগল, ইতিহাসের দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল ঘটনার মাঝে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে অন্ধের মত সে শুধু পথ হাৎড়ে বেড়াতেই লাগল।

প্রান্তরের গান

পৃথিবীর দ্রুত পটপরিবর্ত্তনের মধ্যে নাকি একটা গভীর ইঙ্গিত আছে। ধর্ম্মের দেশ ভারতবর্ষের মানুষেরা তাই নিয়ে আলোচনা করছিল। খালিমুখে মদ খেলে যেমন আনন্দ হয় না তেমনি নিছক তামাকের ধোঁয়ায় নেশা জমে না চাট্ চাই। জাপানীদের অগ্রগতির কথা সেই চাটের খোরাক জোগাচ্ছিল।

মুদ্রিত-নেত্রে অঘোর পণ্ডিত হরিভূষণ গাঙ্গুলীর ওখানে বসে বসে বলছিলেন, "আমরা মানুষ আমাদের বিচার নির্ভুল হতে পারে না। কিন্তু সে যাই হোক্—মায়ের লীলা'র অর্থ এবার বোঝা যাচ্ছে—ম্লেচ্ছদের দিন এবার ঘনিয়ে এসেছে"—

নক্ষত্র আর গ্রহের অবস্থান নিয়ে তিনি রুদ্ধশ্বাস শ্রোতৃমণ্ডলীকে বোঝাতে লাগলেন যে আর দিন নেই, কলির শেষ হল বলে, ধ্বংস আর মৃত্যুর মাঝে কলিযুগের নাভিশ্বাস উঠেছে।

তামাকের ধোঁয়ার মাঝে, নিজেদের প্রাচীন সংস্কারের জীর্ণতার মাঝে, এমনিভাবে জল্পনা করবার নেশা নিয়েই ওরা বুঁদ হয়ে রইল।

সুব্রত মাথা নাড়ল, "উঁহু—এবার সংগ্রাম আসন্ন। কংগ্রেস তার ধৈর্য্যের জন্য প্রশংসার্হ—শেষ চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে—এবার সংগ্রাম আসন্ন।"

প্রবীর মৃদু হাসল, "কিন্তু যুদ্ধের চেহারা যে পাল্‌টে গেছে। রাশিয়া যুদ্ধে নেমেছে, জাপান এগিয়ে এসেছে। আজ সংগ্রাম করা মানে একদিকে মানুষের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নের 'কারখানাকে ভেঙ্গে ফেলা অন্যদিকে নূতন এক বর্ব্বর জাতির হাতে অতি সহজে দেশকে তুলে দেওয়া। তা কি উচিত?"

প্রান্তরের গান

সুব্রত কিছুতেই বুঝবে না অন্য কথা, সে বলল, "তোমার জনযুদ্ধের কথাটা আমি মানি না প্রবীর, রাশিয়াতে যেটা জনযুদ্ধ দাস ভারতবর্ষে তা মোটেই জনযুদ্ধ নয়। আমরা পরাধীন—আমাদের একটি মাত্র কর্ত্তব্য ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে তাড়ানো।"

"তা সত্যি—কিন্তু ফ্যাশিজম্‌ও কি আমাদের শত্রু নয়? সাম্রাজ্যবাদের চরম সংস্করণ হল ফ্যাশিজম্—সেদিক দিয়ে জাপানকে আমাদের বাধা দিতেই হবে। ইংরাজ-বিতাড়ন আর জাপানী-প্রতিরোধ একসঙ্গেই হতে পারে না।"

"তা মানি কিন্তু তোমাদের কম্যুনিষ্টদের জনযুদ্ধ নীতিকে মানতে পারছিনা প্রবীর। আমরা যদি ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়তে পারি তবে জাপানের বিরুদ্ধেও পারব। চল্লিশ কোটী ভারতবাসীর শক্তি কম নয়।"

প্রবীর হাসল, "সে চল্লিশকোটী এক হলে ত' কথাই ছিল না। আমরা ত, সেইটেই চাই। চল্লিশকোটীকে সম্মিলিত করে নূতন শত্রুকে হাটিয়ে দেব এবং তারপরে ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করব।"

সুব্রত অবিশ্বাসের হাসি হাসল, দেশের মধ্যে জাগরণ এসেছে, উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছে—একে অন্যপথে পরিচালিত করলে নিরাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়বে সবাই।

"তা হোক্। তাই পিছনে পরিচালিত করবে দেশকে।"

"তোর সঙ্গে আমার মতে মিলছেনা প্রবীর।"

"তা তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু ভেবে দেখ সুব্রত। ইতিহাস তোর জন্য অপেক্ষা করবে না, করেও না। যে সংগ্রাম গতকাল প্রয়োজন ছিল আজ তার প্রয়োজন গৌণ হয়ে গেছে। এতদিন সবাই যখন সংগ্রামের জন্য ছটফট্ করছিল তখন নেতারা আপোষের পথে গিয়ে

কি ভাল করেছিলেন? সংগ্রামের প্রয়োজন হয়ত আজো আছে কিন্তু তার গতিমুখ এবার অন্য দিকে ফেরাতে হবে।"

"না আমি তোর কথা মান্‌তে পারছি না।"

"সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চল্ সুব্রত, অবস্থানুযায়ী নীতিকে পরিবর্ত্তন কর—আধুনিক রাজনীতির তাই ধর্ম্ম।"

সুব্রত হাসল, "হয়ত তোর যুক্তি আছে তবে আমার যুক্তিও কম নয়। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা প্রবীর—"

"কি?"

"আমাদের মাঝে এবার ব্যবধান গড়ে উঠেছে।"

"তাই মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ। আমাদের পথ এবার বিপরীতমুখী। আমার পথ দক্ষিণে, পরিষ্কার পথে।"

প্রবীর হাসল, "আর আমার পথ বামে—সহজ পথে।

হাসল দুজনে। সে হাসি ইঙ্গিতপূর্ণ।

খানিকটা অন্যমনস্ক হয়েই ফিরছিল প্রবীর। মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়াল। শিখা আসছে।

"আপনি!" প্রবীরের মুখ থেকে উচ্চারিত হল।

মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দে কাটল। তারি মধ্যে দুজনে নিজেদের অভিভূত অবস্থা কাটাবার চেষ্টা করতে লাগল, তারি মধ্যে প্রবীর লক্ষ্য করে দেখল যে শিখা আরো কৃশাঙ্গী হয়েছে, তার দুচোখে একটা বন্য

জ্বালা ফুটে রয়েছে, অযত্ন আর নিরাসক্তিতা দেহের সর্ব্বাঙ্গে প্রকট হয়ে আছে।

"আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম" শিখা যেন একটা টাল সাম্‌নে নিল।

"তাই নাকি? সুস্বাগতম্—চলুন"—শিখার কণ্ঠস্বরকেও লক্ষ্য করল প্রবীর।

প্রাণের কোনো সাড়াই নাই তাতে, জীবন সম্বন্ধে একটা নিদারুণ হতাশা আর ক্লান্তি যেন ধ্বনিত হল তার কণ্ঠস্বরে।

শিখা একটু ইতস্ততঃ করল পরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বলল, "না এমনি বেড়িয়ে আসি চলুন।"

সঙ্কোচবোধ করছে শিখা—প্রবীরের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তার লজ্জা করছে এখন।

"তাই চলুন তবে"—প্রবীর বলল।

কিন্তু বেড়াবার জায়গা কোথায় গ্রাম দেশে?

খানিকক্ষণ নিঃশব্দভাবেই পথ অতিক্রম করল তারা। কোনো কথাই যেন তারা খুঁজে পাচ্ছে না।

প্রবীরের অস্বস্তিবোধ হয় সে বলল, "কবে এলেন?"

"কাল এসেছি আমার দাদার সঙ্গে। আজ খবর পেলাম যে আপনিও এসেছেন।"

"আপনার দাদাও এসেছেন? হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে যে তিনি এম, এ, পাশ করেছেন। যাক সেকথা—আমাদের কিন্তু অনেকদিন পরে দেখা—না?"

"হ্যাঁ। ঢাকা'র জেলে একবার দেখা হয়েছিল—প্রায় বছর খানিকের কথা, তারপরে যে কোথায় গেলেন।"

প্রবীর হাসল, "যাইনি ত'—সরকার বাহাদুর নিয়ে গেলেন যে।"

"কোথায় কোথায় ঘুরলেন ?"

"ফরিদপুর আর রাজসাহী"—

"আপনার স্বাস্থ্য খুব ভাল দেখছি না তো।"

"আপনারটাও অনুরূপ।"

শিখা ম্লান হাসি হাসল।

আবার নিঃশব্দতা।

হঠাৎ শিখা ডাকল, "প্রবীরবাবু"—

"এঁ্যা ?"

"আমায় ক্ষমা করবেন"—

"কেন বলুনত ?" প্রবীর আশ্চর্য্য হল।

"আপনার জেলে যাবার মূলে আমি"—শিখা যেন হাঁপাচ্ছে।

প্রবীর হেসে উঠল।

"হাসি নয়", শিখা মাথা নাড়ল, অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, "আপনি সেদিন আমার নেমন্তন্ন রক্ষা না করাতে আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। বাবা আপনাকে জব্দ করার তোড়জোড় করছিলেন বরাবরই—আমি উত্তেজিত হয়ে তাঁকেও উত্তেজিত করেছিলাম বলেই আপনাকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল। আমিই প্রকৃত দোষী।"

শিখার কথার শেষাংশ অস্ফুট হয়ে এল, রুদ্ধ আবেগে কেঁপে উঠল তা।

প্রবীর ক্ষণকাল চুপ করে রইল, তারপরে হেসে এগিয়ে গিয়ে, শিখার একটি হাত ধরে মৃদুকণ্ঠে বলল, "আসল দোষ কার সে আমি বুঝতে পারছি শিখা দেবী—যতই বলুন—আপনি সে ব্যক্তি নন্। আর আমিই ত' প্রথমে দোষ করেছিলাম—আমি আপনার নিমন্ত্রণকে উপেক্ষা করে

আপনাকে অপমানিত করেছিলাম, দুঃখ দিয়েছিলাম। আমায় ক্ষমা করুন।"

দুচোখ বুজে শিখা টলে উঠল একবার, তার সমস্ত দেহ এক বিচিত্র অনুভূতিতে স্পন্দিত হয়ে উঠল।

মৃদু হেসে, সলজ্জ ভাবে শিখা বলল, "কিন্তু সেদিন কেন যে আপনি আসতে পারেননি তা আমি জানতে পেরেছি, সুতরাং আপনি ক্ষমা চেয়ে আমার মনের বোঝা আর বাড়াবেন না, আসলে আমাকেই আপনার ক্ষমা করা উচিত।"

"তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্।" প্রবীর সহাস্য মুখে বলল।

"কি ?"

"কেউ কাকে ক্ষমা করব না এবং ব্যাপারটা তুচ্ছ বলে দুজনেই তা ভুলে যাব।"

দুজনেই হেসে উঠল।

ঘুরতে ফিরতে শিখার বাড়ীর ফটকের কাছেই দুজনে এসে হাজির হল।

"আপনার বাড়ী।" প্রবীর বলল।

"তাইত দেখ্‌ছি।"

"তাহলে আসি এবার।"

"ভিতরে আসবেন না ?"

প্রবীর উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। মুখের উপর 'না' বলতে আজ যেন বাধল একটু, শিখার পরিবর্ত্তন, তার দৈন্য, তার হতাশা তাকে আজ কঠোর হ'তে নিষেধ করল।

হঠাৎ ফটকের সামনে একজনের ছায়া পড়ল।

শশাঙ্কবাবু।

শিখার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, প্রবীরের কঠিন ও শীতল চোখ দুটোর দিকে তাকাল সে।

প্রবীরও শিখা'র দিকে তাকাল।

শিখা মাথা নাড়ল, "না, আপনি যান্।"

"ঠিক বলেছেন আপনি, ধন্যবাদ। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল শিখা প্রবীর চলে গেল। রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শিখা শুনতে পেল যে তার পিছনে তার বাবার পায়ের জুতোর শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে।

সে শব্দ শিখার কাছে এসে থামল।

"কালকে তুই বাড়ী এসেছিস্ আর আজকেই গিয়ে ওই স্কাউণ্ড্রেল্টার সঙ্গে দেখা করেছিস্!" শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে ভৎর্সনা করলেন শশাঙ্কবাবু।

শিখা চুপ্ করে রইল।

"শিখা"—

"কি?"

"আমার একটা কথা আছে।"

"বল।"

"ওই কম্যুনিষ্টটার সঙ্গে তুই আর মিশিস্ না।"

শিখা ম্লান হাসি হাসলো, "তা আর পারব না বাবা।"

"ও আমার শত্রু"—'শত্রু' কথাটা উচ্চারণ করেই শশাঙ্কবাবু উত্তেজনা বোধ করলেন এবং কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে চড়ালেন তিনি।

"তা হোক্—তবু আর পারব না বাবা।"

"ওর সঙ্গে আবার মিশলে মেয়ে বলেও আমি তোকে ক্ষমা করতে পারব না কিন্তু"—

"আমার দুর্ভাগ্য কিন্তু তবু আমি তোমার কথা রাখতে পারব না বাবা।"

"কিন্তু কেন?" শশাঙ্কবাবু হঠাৎ গর্জ্জে উঠলেন, মাথায় যেন মুহূর্ত্তে রক্ত চড়ে গেল তার, "এমন ভাবে বারবার 'না' বলার কারণটা কি? কোন্ সাহসে তুই আজ আমার মুখের উপর এমন নির্ল্লজের মত কথা বলছিস্ তা কি জানতে পারি?"

"পার।"

"কি সে কথা?"

"আমি প্রবীরকে ভালবাসি।"

"শিখা!"—শশাঙ্কবাবুর কানে যেন কেউ গলিত শীসা ঢেলে দিল।

"মিথ্যে নয়, এই আসল কথা বাবা।"

শিখা দ্রুতপদে ভিতরে চলে গেল!

একি হল! শশাঙ্কবাবু যেন পাথর হয়ে গেলেন। তিনি একদিন যে ভয় করেছিলেন তাই শেষ পর্য্যন্ত সত্য হল। খ্যাতি, ঐশ্বর্য্য আর প্রতিপত্তি আজ শিখার কাছে অর্থহীন হয়ে গেল! শেষপর্য্যন্ত সে ঐ নিষ্কর্ম্মা কম্যুনিষ্টটাকেই ভালবাসল! শুধু তাই নয়, নির্ভয়ে তাই সে আজ ঘোষণা করল! আর কি কোনো উপায় নেই? আর কি কোনো উপায় নেই!

শশাঙ্কবাবুর দুচোখে বাঘের ক্ষুধা। উপায় না থাকলেও খুজে বের করতেই হবে। এত সহজে পাটকলের মালিক আর জমিদার শশাঙ্ক রায় হার মানবেন না।

বিভাবতী সব শুনে প্রশ্ন করলেন, "কি করতে চাও তবে?"

"কি করতে চাই? দাঁড়াও"—ভাবতে লাগলেন শশাঙ্কবাবু, হঠাৎ কি ভেবে নিয়ে তিনি ডাকলেন, "জয়ন্ত—জয়ন্ত"—

সাড়া এল, "যাই বাবা—"

জয়ন্ত এসে দাঁড়াল।

"কি বাবা ?"

"তোর সেই ফ্রেণ্ড—আমাদের প্রমথর ছেলেটির নাম কি রে ?

"হিরন্ময়।"

"ঠিক্। ও এবার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছে না ?"

"হ্যাঁ।"

"অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। আমাদের শহরের বাড়ীতে প্রায়ই ও আসত, ছেলেটি বেশ , না ?"

জয়ন্ত সহাস্যে বলল, "হি ইজ একসেপ্শনালি স্মার্ট এ্যাণ্ড্ হ্যাণ্ড্সাম্ টু"—

"হু—বেশ, তুই কাল্ তাকে একটা চিঠি লিখে দিস্।"

"কেন ?"

"এমনি—বেড়িয়ে যাবার জন্য, আর-আর—শিখাকে দেখবার জন্য।"

"ওঃ"—

"হাউ ডু ইউ লাইক দি আইডিয়া।"

জয়ন্ত গম্ভীর হল, "আমার ত' খুব মত কিন্তু শিখা হতভাগী যে তাকে আমলই দেয় না।"

"বটে ?" শশাঙ্কবাবু যেন আবার অগাধ জলে পড়লেন, একটু ভেবে আবার উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "তা হোক তবু তুমি তাকে চিঠি লেখ। আমি দেখব কেমন করে শিখা আমার বিরুদ্ধে যায়।"

"আচ্ছা।"

জয়ন্ত চলে গেল।

বিভাবতী মৃদুকণ্ঠে বললেন, "শিখার বিয়ে দেবে ?"

"হ্যাঁ।

"জোর করে ?"

"হ্যাঁ।"

"তা কি ভাল হবে ?"

"তবে কি ভাল হবে—প্রবীর চৌধুরীকে জামাই করলে ? তুমি যে মেয়ের দলে তা আমি জানি তাই তোমায় আমি নিষেধ করে দিচ্ছি যে অন্ততঃ তুমি যেন আম্মার মতের বিরুদ্ধে না যাও, বুঝলে ?" শশাঙ্কবাবু উষ্ণকণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

বিভাবতী মাথা নাড়লেন, মৃদু অথচ উত্তপ্তকণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন, "বুঝেছি—সব বুঝেছি। মেয়ের অদৃষ্ট নিয়ে খেলবার জন্য বিধাতা পুরুষ হবার সাধ হয়েছে তোমার। বেশ, তোমার ভয়ের দরকার নেই, আমি একটি কথাও বলব না তোমাকে, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।"

হরিচরণের সংসারে ভাঙ্গন ধরেছে। একটার পর একটা করে ঝড়ের দোলায় তার দরিদ্র সংসারের ভিত্তি দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে উঠছে। উপায় নেই। জীবন পথের আঁকে বাঁকে, পরস্বাপহারী তস্করের মত যে সব অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলী অপেক্ষা করে সেগুলিকে তো জানবার উপায় নেই। তাই অসহায় তৃণখণ্ডের মতই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে হরিচরণ যা হবার হোক্‌গে, কি যায় আসে ?

কাজললতার বাবা মারা গেছে—সন্ন্যাস রোগে। গৌরদাসের অহমিকা বা পিতৃপুরুষের লুপ্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে গৌরব বোধ থাকলেও অবস্থা ভাল ছিল

না। শেষে মারা যাবার পর আরো বোঝা গেল যে তার খারাপ অবস্থা কতদূর খারাপ ছিল। প্রায় পাঁচ ছয়শ টাকার ঋণের বোঝা সে তার বিধবা স্ত্রীর উপর ফেলে গেছে। এর অর্থ কি? অর্থাৎ সে ঋণ শোধ হবে না আর, গৌরদাসের ভিটে জমি ক্রোক্ করে মহাজনেরা অল্প টাকায় মোটা মুনাফা লাভ করবে।

যথাসময়ে খবর এল। স্বামী-বিরহে ছট্‌ফট্‌ করছিল, তাতে আবার নূতন একটা আঘাত। অন্ধকার আকাশ থেকে বাজ পড়ল যেন। মাটিতে লুটিয়ে এত কাঁদল কাজললতা যে মরা মানুষ কেঁদে বাঁচাবার উপায় থাকলে গৌরদাস আবার বেঁচে উঠত। তা হল না, তাই শেষ পর্য্যন্ত থামল কাজললতা।

হরিচরণ তাকে তেতুলঝোরায় নিয়ে রেখে এল।

জমিদার নন্দন জয়ন্ত রায় এম, এ পাশ করে গ্রামে ফিরে এসেছে পিতৃসিংহাসনের সঙ্গে সুপরিচিত হবার জন্য। বয়স পঁচিশেক, উগ্র বিলাতীভাবাপন্ন, রুক্ষ ও নারীমাংস-লোলুপ যুবক সে। গ্রামের ছোট্ট গণ্ডীতে, নিরীহ, বিনীত প্রজামণ্ডলীর মাঝে নিজের ক্ষমতাকে উপলব্ধি করল সে। সে উপলব্ধি তার দুষ্প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করল।

মিলের কর্তৃত্বভার সে প্রায় সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করল। কয়েকদিন পর থেকেই শ্রমিকদের ইউনিয়নকে ধ্বংস করার মৎলব সে মনে মনে আঁটতে লাগল। আবদুল, তাহের, অবিনাশ প্রভৃতি মুখ্য কর্ম্মীরা তার চক্ষুশূল হল। প্রবীরের নামেও তার কানে এল।

প্রায়ই বিকেলের দিকে সে রাইফেল নিয়ে শিকারে বেরোয়। তার

শিকারী চোখ দুটো কিন্তু অন্য সন্ধানে সেই সময়ে ব্যাপৃত থাকে। শিকারের নাম করে সে প্রজাদের অন্দর মহলের দিকে নজর বুলিয়ে নেয়। ইতিমধ্যেই ভাবী শিকারদের একটা লিষ্টও সে মনে মনে তৈরী করে ফেলেছে। এমনি শিকারের সন্ধান বেরিয়েই জয়ন্ত একদিন মাধবীকে দেখল। কামিনী সরকারের টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে কলসী কাঁখে ফিরছিল মাধবী। আর চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরেই তার বাড়ী।

মাধবীকে দেখে জয়ন্তর লিষ্ট শতছিন্ন হয়ে উড়ে গেল। নূতন লিষ্ট্ করতে হবে, তার প্রথমে থাকবে এই মেয়েটির নাম।

"শোন"—জয়ন্ত ডাকল।

মাধবী বন্দুকধারী জয়ন্তকে দেখে একটু ঘাব্ড়ে গেল।

"আমায় তুমি চেন?" মাধবীর কাছ ঘেঁষে, হেসে প্রশ্ন করল জয়ন্ত।

"না।"

"আমি জয়ন্ত রায়—জমিদারের ছেলে—"

"ওঃ"—মাধবী অবাক্ হয়। এত ঘটা করে আত্মপরিচয় দেবার হেতুটা কি? আর জমিদার নন্দনের চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন জ্বলজ্বলে, লোভীর মত চক্‌চকে। কেন?

"তোমার নাম কি?"

"মাধবী।"

"মা-ধ-বীলতা! বেশ নাম ত'—তা তোমার বাবার নাম কি?"

"হরিচরণ দাস।"

"বাড়ী কোথায়?"

"ঐ ত—সামনে।"

"হুঁ—তা বেশ, তা বেশ—কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আসো না কেন তুমি? জমিদার বলে ভয় পাও নাকি?"

মাধবী কথা খুঁজে পায় না। কি সব অর্থহীন কথা বলছে লোকটা

"যেয়ো, বুঝলে ?"

নীরবে যন্ত্রচালিতের মত ঘাড় নেড়ে মাধবী প্রায় ছুট্ দিল।

জয়ন্ত হেসে বলল, "তোমাদের বাড়ী আসব আমি—তোমার বাবাকে বলব, বুঝলে ?"

মাধবী ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রাইফেলটাকে শক্ত করে ধরে জয়ন্ত হাসল। বাই জোভ্ সি ইজ এ্যান এঞ্জেল। এ যে পঙ্কে পদ্মফুল!

মাধবী'র বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। জমিদার পুত্রের কথার অর্থ সে বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু অল্পক্ষণপরেই সে কথা ভুলে যায় মাধবী। প্রবীরের কথা ভাবতে থাকে। মানুষটা যখন জেলে ছিল তখন দিনের পর দিন কাটিয়েছে মাধবী প্রবীরের অদর্শন-জনিত বেদনা বাধ্য হয়ে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু মানুষটা এই গ্রামেই আছে, মাত্র দুতিন মিনিটের পথের ব্যবধান তাদের দুজনের মাঝে অথচ তাকে দুদিন ধরে দেখতে পাওয়া যায় না! মাধবী অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে, তার কোনো কিছুতেই আর মন বসছে না।

একটু বাদেই সে মাকে এড়িয়ে বাইরে বেরোল। সে-ই যাবে প্রবীরদের বাড়ী। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, কেউ লক্ষ্যও করবে না তাকে। বেরোতেই বাইরের দরজার সামনে অর্জ্জুনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

"অর্জ্জুনদা!" অপ্রসন্নচিত্তে বলল মাধবী।

"হ্যাঁ।"মৃদুহাসির প্রয়াস দেখা গেল অর্জ্জুনের ঠোঁটের কোণে।

"কাঁকে চাও?" একটু রুক্ষকণ্ঠেই প্রশ্ন করল মাধবী। প্রবীরের ওখানে যাওয়ার পথে বাধা পেয়ে তার মনটা বিগ্ড়ে গেল।

অর্জ্জুন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। কাকে চায় অর্জ্জুন? অর্জ্জুন কি বলবে সে কথা? কিন্তু কি হবে তা বলে? মাধবী ত তা জানে আর জানে বলেই সে এই বেয়াড়া প্রশ্নটা করছে, না ও থাক্

"কাউকে না—মানে এমনি"—জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলল অর্জ্জুন, যেন শূন্যতার মাঝে পাক খেয়ে, নীচে পড়তে পড়তে, অস্ফুট আর্ত্তনাদ করছে সে।

"ওঃ—"

"তুমি বুঝি—কোথাও—বেরুচ্ছিলে?"

এবার মাধবীর ঘাব্ড়াবার পালা।

"হ্যাঁ—না—মানে—এম্নি—"

"ওঃ!"

মিথ্যে কথা বলল মাধবী কিন্তু অর্জ্জুন সব বুঝল। প্রবীর যখন ছিল না তখন অর্জ্জুনের মনে আশা হয়েছিল যে হয়ত—হয়ত মাধবীকে সে জয় করতে পারবে। তা হয়নি। শিবেশ্বর, অর্জ্জুনের মা পীড়াপীড়ি করেছিল তাকে বিয়ে করবার জন্য অর্জ্জুন তাতে রাজী হয়নি, মাধবীকে সে দুর্লভা জেনেও আশা হারায়নি। কিন্তু, মাধবী যে প্রবীরকে ভালবেসেছে সেই প্রবীর গ্রামে ফিরে এসেছে, এখন মাধবী ত' আরো সুদুর্লভা। না, উপায় নেই, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়টাকে নিয়েই অর্জ্জুনকে জীবনের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। এদিকে জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত,

দিশাহারা হয়ে গেছে অর্জ্জুন। তার দোকান আজকাল ভাল চলে না সংসারে অভাব বাড়ছে অস্বাভাবিক মাত্রায়। তার উপর মাধবীকে হারানো। কিন্তু তবু বেঁচে থাকতে হবে, তবু নিরবলম্ব প্রেতের মত শূন্যতায় ভেসে ভেসে বেড়াতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে, আশাহীন আশার জাল বুনে স্বপ্ন দেখতে হবে! আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য!

উদ্‌ভ্রান্তের মত চলে গেল অর্জ্জুন।

আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাধবী পা বাড়াল।

পিছন থেকে রাসমণির ডাক শোনা গেল, "মাধু রে—মাধু"—

আবার বাধা! মা মুখপুড়ী মরুক। মাধবী সক্রোধে চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

প্রবীরের বাড়ী।

শূন্য ঘর।

"পিস্‌িমা কি করছ গো?"

"রাঁধছি মা—আয় বোস্।"

বসল মাধবী।

এদিকে ওদিকে সতৃষ্ণ ও সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে মাধবী আম্‌তা আম্‌তা করে প্রশ্ন করল। "একা রয়েছ পিসী, না?"

"প্রবীরটা সেই দুপুরে যে কোথায় গেছে তা সেই জানে ফিরতে রাত হবে বলেছিল।"

"ওঃ—ওঃ"—

হঠাৎ অর্জ্জুনের উপর রাগ হয় মাধবীর। হারামজাদা, শুয়োর ঐ অর্জ্জুন। হ্যাংলাটার জন্যই বোধ হয় সে আজ প্রবীরকে দেখতে পেল না। আসলে সে প্রবীরের উপরই রাগ করেছে কিন্তু তবু সে সচেতন মনটার কাছে সাধু সাজতে চায়। তাই তার মনের নিষ্ফল ক্রোধ লক্ষ্য

স্থল এড়িয়ে তির্য্যকগতিতে অর্জ্জুনের উপর গিয়েই পড়ল। বেচারা অর্জ্জুন! মেয়ে মানুষের মনে যে এত জটিলতা তা সে কি করে জানবে?

কাজললতা ফিরে এল। থম্‌থমে মুখ আর ভাঙ্গা মন নিয়ে সে দিনের পর দিন কাটাতে লাগল। রাজকন্যার মত রূপসী কাজললতার অনেক পরিবর্ত্তন হল। বেশভূষা আর সাজসজ্জা সে ভুলে গেল, তার দেহ হল শীর্ণ, তার চোখের কোণে লাগল চিন্তার কজ্জল লেখা। কাজললতাকে আর চেনাই যায় না। দিনরাত গুম্ হয়ে থাকে সে। মাঝে মাঝে অকারণে দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

অনেক দিন নন্দর চিঠি আসেনি। যাওয়ার দিনকয়েক পর একটা চিঠি এসেছিল—নেহাৎই মামুলি, তার বাবাকে লেখা। কাজললতা আশা করেছিল যে নন্দ তাকে একটা চিঠি লিখবে,'প্রাণেশ্বরী' 'প্রিয়তমা' বলে আদর জানিয়ে বিরহ জ্বালাকে কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত করবে, কিন্তু নন্দ তা করেনি। কাজললতা'র পরিবর্ত্তনের বড় একটা কারণ হয়ে ওঠে তা।

কিন্তু সে দিন একটা চিঠি এল নন্দর কাছ থেকে আর কাজললতা'র নামেই। নানা মোহর-যুক্ত খামে ভর্ত্তি চিঠি। 'প্রাণেশ্বরী' বলে সম্বোধন করেনি নন্দ, লিখেছে 'কল্যাণীয়া' বলে। তা হোক্, নন্দ কাজললতাকে যে একটা চিঠি লিখেছে সেইটেই বড় কথা।

বুকের মধ্যে, যেখানে নন্দ কতবার মাথা রেখেছে, প্রণয়োমত্ত মৃদু আলাপ আর উষ্ণ নিঃশ্বাস যেখানে রোমাঞ্চ জাগিয়েছে কতবার ঠিক্

সেইখানেই চিঠিটাকে চেপে ধরল কাজললতা। আঃ—মরুভূমির উপর আকাশ ভেঙ্গে যেন জল পড়ছে।

দুপুরের পর। বাইরের দাওয়ায় বসে একটা ছেঁড়া কাঁথার সংস্কার করছিল কাজললতা। তার ছেলে এখন বছরখানিকের হয়েছে, ঘরের ভিতর ঘুমোচ্ছে ঠাকুরমার সঙ্গে।

অলস মধ্যাহ্ন-মুহূর্ত্তগুলিতে সুন্দরী বিলের স্বপ্ন-কথা মনে পড়ে। কি রোমাঞ্চকর সে দিনগুলি!

কার লঘু পদশব্দ। কাজললতা মুখ তুলে অবাক হয়ে গেল।

ললিতা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। রুক্ষ, চিন্তাক্লিষ্ট আকৃতি তার।

ধীরে ধীরে কাজললতার মুখচোখ কঠিন হয়ে উঠল।

বসতে যাচ্ছিল ললিতা।

কাজললতা বলল, "এখানে বসো না তুমি আমাদের বাড়ীকে অপবিত্র করো না।"

ললিতা থেমে গেল; বিষদন্তোৎপাটিত নাগিনীর মত সে মাথা নীচু করে বলল, "বৌ—"

"কি?"

"একদিন তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি আমায় মাফ্ কর।"

কাজললতা জবাব দিল না।

"আমি অন্যায় করেছি," ললিতা বলতে লাগল, "কিন্তু তবু তোমার সোয়ামীকে—ওস্তাদকে আমি ভালবেসেছিলাম—আর তাকে কে না ভালবেসে পারে?"

কাজললতার হৃদয় জ্বলে যাচ্ছে। তার স্বামীকে এখনো আর একজন, একটা নীচ বেশ্যা ভালবাসে! কিন্তু কেন হবে তা?

"যাবার সময় তার সঙ্গে দেখা হয়নি—দিনরাত আমি চিন্তায়

পুড়ে মরেছি বৌ। সে কেমন আছে কিছু জানি না আমি—আমায় সে কিছুই লেখেনি তাই জানতে এলাম তার কথা। আমি আর তোমায় বিরক্ত করব না কিন্তু সে কেমন আছে শুধু সেই খবরটুকু আমায় দাও। সে কি তোমায় কোন চিঠি লিখেছে ?”

কাজললতার মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নন্দ তাহলে বদ্‌লাচ্ছে। সে ললিতাকে চিঠি লেখেনি, সে আবার সেই পুরোনো নন্দই হয়ে গেছে! বাঁচল, বাঁচল কাজললতা।

“বৌ -”

“হ্যাঁ—লিখেছে—”

“কি—কি লিখেছে ?” ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

হঠাৎ নির্ম্মম হয়ে উঠল কাজললতা বলল “বলব না—”

“বৌ !”

দাওয়ার কোণে একটা ঝাঁটা পড়ে ছিল, সেইটে তুলে নিয়ে আন্দোলিত করল কাজললতা, “বলব না—কিছু বলবনা, আজ আমার দিন। সে দিন তুমি আমায় তাড়িয়েছিলে, আজ আমার পালা। শুনছ ? তুমি বেরিয়ে যাও—”

“বৌ !” বিবর্ণ হয়ে গেল ললিতা।

“বেরো বলছি—নইলে ঝাঁটাপেটা করে তাড়াব তোকে, বুঝলি ?”

ললিতার মুখে কথা সরল না, আজ তার কোন শক্তি নেই। সে যদি জানত যে তার অনুপস্থিতিই এমন ভাবে নন্দকে দূরে টেনে নেবে তাহলে সে নিশ্চয়ই শহরে যেত না। কিন্তু আর উপায় নেই, নিজের হাতেই সে নিজের চিতা রচনা করেছে। দুচোখে তার জল এল। খঞ্জ কুকুরের মত সে পা টেনে টেনে সেখান থেকে চলে গেল।

প্রতিশোধ! অপরিসীম ও বিচিত্র একটা তৃপ্তির ছায়া কজ্জললতা'র মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল। প্রতিশোধ!

হিরন্ময় এসেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারতীয় সংস্করণের দিব্য নিদর্শন সে। মুখে চোখে কথা বলে সে, সর্ব্ববিষয়ে পাণ্ডিত্যের ভাণ করে। তাকে দেখে শশাঙ্কবাবু ভারী খুশী হলেন। খুশী হলেন না বিভাবতী, খুশী হল না শিখা। নেহাৎ অতিথি তাই বাধ্য হয়ে দু' একটা অতি প্রয়োজনীয় মামুলি কথা বলে সে অন্তরালেই আত্মগোপন করে রইল।

বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল। হিরন্ময় পছন্দ করেছে শিখাকে। শ্রাবণ মাসে বিয়ে হবে। সঠিক তারিখ প্রমথবাবুর মত নিয়ে জানানো হবে।

জয়ন্ত আর হিরণ্ময় শিকার করতে বেরোয় মাঝে মাঝে।

আষাঢ় মাস ধলেশ্বরীর ঘোলাটে জলের ধাক্কায় মাটীর বড় বড় চাঙর ধ্বসে পড়ছে, ধলেশ্বরী গর্জ্জাচ্ছে। রাতের বেলাতেও সে শব্দ শোনা যায়, ভয় লাগে।

ধলেশ্বরীর ধারে সে দিন ওরা গেল।

হিরণ্ময় বলল, "বাই দি বাই—জয়ন্ত—"

"এঁ্যা?"

"একটা কথা বলব?"

"বল।"

"তোমার বোনকে আমার পছন্দ হয়েছে—"

"বেশত।"

"কিন্তু দেয়ার ইজ অলওয়েজ দি আদার সাইড অফ দি বিস্কিট; ইউ নো?"

জয়ন্ত হাসল। দূরে ধলেশ্বরীর ধারে, ক্ষিপ্র স্রোতোধারার দিকে তাকিয়ে একটা বক বসেছিল। তাকে লক্ষ্য করে জয়ন্ত রাইফেল ছুঁড়ল। একটা শব্দ। বারুদের ধোঁয়া আর গন্ধ। বকটা লুটিয়ে পড়ল। জয়ন্ত হাসল, "আদার সাইড হিরণ্ময়? কি যায় আসে? সেন্টিমেণ্টাল হওয়ার কোনো অর্থ হয় না মাই ডিয়ার। মেয়েরা, চিরদিনই ভোগের বস্তু, ওদের ভোগ করতে যদি চাও তবে ওদের মনের খোঁজ করো না। ওদের মন বলে কিছু আছে কিনা আমি জানিনা। আমি শুধু এইটুকু জানি যে সত্যিকারের পুরুষ ও ভোগী হতে গেলে শিকারীর মত নির্ব্বিকার ও নিষ্ঠুর হতে হয়। এই যে বকটা মারা গেল ওর মনের কথা জেনে আমার লাভ কি? ও আমার শিকার এবং আমি ওকে শিকার করলাম—এই শেষ কথা।"

হিরণ্ময় একটু হাসল।

মনোরমা এসেছে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছে তার। তার অবস্থাও খুব ভাল নয়। তার স্বামীর চাকুরী নাকি অস্থায়ী ছিল, তা তিন চার মাস হল গেছে। বর্ত্তমানে সে বেকার। অভাব বাড়ল কিন্তু চাহিদা কমেনি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। ওরা আসাতে হরিচরণেরও খরচ বাড়ল। ওদিকে মিয়াদ শেষ হয়েছে। হরিভূষণ গাঙ্গুলী ও নিকুঞ্জসা'র মত তার বন্ধকী জমি গ্রাস করার মৎলবে আছে। ঋণ শোধ করবার সাধ্য নেই হরিচরণের, নন্দও কিছুই পাঠায় না—অর্থাৎ ও জমিও যাবে।

যাক্—যাক্। হরিচরণ আজকাল আর ভাবে না। সে জানে

যে তার সংসার ভেঙ্গে পড়ছে, তাকে বাঁচবার মত আর কোনো উপায়ই আর হরিচরণের জানা নেই।

আখড়ার পিছনে যে আম কাঠালের বাগানটা আছে সেইখানে। বাগানের বুক চিরে অজগরের মত সরু একটা পথ চলে গিয়েছে এঁকে বেঁকে। সেই পথেরই পাশে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

মাধবীর হাতটাকে খপ্ করে ধরে ফেলল জয়ন্ত ঝক্‌ঝকে দাঁতে হেসে বলল, "তুমি যে আমায় না চেনার ভাণ করছ মাধবী—"

ভয় আর ক্রোধে খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে রইল মাধবী। কি করবে, কি করা উচিত কিছুই সে ভেবে ঠিক করতে পারে না।

কণ্ঠস্বর নীচু করে জয়ন্ত বলল, "কি চাই? বল না, কি চাই তোমার?"

"কিছু না—"

"সেকি! তা কি হয়—আর কিছুই না নেবে ত' আমার হৃদয়টাকে নাও—"

"হাত ছাড়ুন—"

"লজ্জা কেন?"

"ভাল হবে না বলছি—"

"তুমি পাগল।"

"ভগবান—"

একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়ে গেল।

"উঃ—ছাড়্—হাত ছাড়্"—চীৎকার করে উঠল মাধবী।

শুক্‌নো পাতা দলে পিষে কারা যেন আসছে।

প্রবীর আর শিখা।

জয়ন্ত মাধবীর হাত ছেড়ে দিল।

"পাজী—বদ্‌মাস্—শয়তান্—"

জয়ন্ত হাসল।

প্রবীর ছুটে এল।

"কি হয়েছে মাধু?"

"প্রবীরদা—প্রবীরদা!" মাধবী যেন প্রাণ পেল, প্রবীরের কাছে ছুটে গিয়ে তার ডানহাতটা দুহাতে চেপে ধরে সে হাঁপাতে লাগল।

"কি হয়েছে?" প্রবীর তাকাল জয়ন্তের দিকে।

শিখা স্তম্ভিত হয়ে গেছে, মাধবীকে দেখে তার চোখের তারায় বাড়বাগ্নির আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

"দাদা—তুমি এখানে কেন?" সে প্রশ্ন করল।

জয়ন্ত হাসল, "মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছিলাম কিন্তু ও এমন ভয় পেল যে কি বলব।"

"কি হয়েছে মাধু?" প্রবীর মাধবীকে আবার প্রশ্ন করল।

"ঐ লোকটা আমার হাত চেপে ধরে খারাপ কথা বলছিল।"

"হুঁ—আচ্ছা, তুমি বাড়ী যাও এখন।"

মাধবী তাকাল শিখা'র দিকে। শিখাও তার দিকে তাকিয়ে আছে; দুজনেই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনতে পারল।

"বাড়ী যাও মাধু—"

"আমার ভয় করছে।"

"ভয়ের আর কিছুই নেই, এবার যাও।"

"আমার পা টলছে প্রবীরদা, সত্যি বলছি।"

"কথা শোন মাধু"

মাধবী চলে গেল।

"এবার?" প্রবীর জয়ন্তের দিকে তাকাল।

"কি?" উদ্ধত ভঙ্গীতে. নির্ভয় দৃষ্টি মেলে জয়ন্ত প্রবীরের দিকে তাকাল।

"আপনি সংযত হবেন এই আমার ইচ্ছা।"

"বটে!"

"হ্যাঁ, আপনি শিখা দেবীর ভাই না হলে আজ আপনাকে শিক্ষা দিতাম।"

জয়ন্ত মৃদুমন্দ হাসতে লাগল, "তুমিই প্রবীর! আই থট এ্যাজ মাচ্।"

শিখা চীৎকার করে ভৎসনার সুরে বলল, "ছিঃ দাদা, তুমি এত নীচে নেমেছ!"

জয়ন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "ধীরে, রজনী ধীরে। তা বেশ, বেশ, আজকেই বাড়ীতে গিয়ে তোর কথা বলব, কেমন? তোর যে একজন ডন্ জুয়ান আছে তা তো আমি আগে জানতাম না।"

"জয়ন্তবাবু!"

"নেভার মাইণ্ড্ প্রবীরবাবু—আচ্ছা চিয়ারিও, আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে আর একদিন।"

মাটী থেকে রাইফেলটাকে তুলে নিয়ে জয়ন্ত চলে গেল।

গভীর স্তব্ধতা।

লজ্জা আর ক্ষোভের প্রাচীরের দুপাশে দুজন।

"চলুন"—প্রবীর বলল।

"আমি লজ্জিত প্রবীরবাবু "

"এ লজ্জা আমারও যে আমারি মত একজন শিক্ষিত পুরুষ এমন নীচ কাজ করতে পারে। কিন্তু কথা থাক্—চলুন—"

"কোথায় যাব ?"

"কোথায় ? আচ্ছা আজ আমার বাড়ীতেই চলুন।"

"আপনার বাড়ীতে ? চলুন।"

কিন্তু শিখা'র মনে আর সুখ নেই, স্বস্তি নেই। প্রবীরের চিত্তকে সে না টলাতে পেরে কারণ খুঁজত মনে মনে, সে কারণকে সে আজ দেখতে পেয়েছে। মাধবী। সন্দেহই সত্য। অতি সাধারণ, গ্রাম্য একটি মেয়ে। প্রবীর তাকে ভালবাসে। কয়েকটি মুহূর্ত্তের ব্যাপার—এরি মধ্যে, প্রবীর আর মাধবীর চোখেমুখে যে উদ্বেগ ও কোমলতাকে সে লক্ষ্য করেছে, যে নির্ভরতার সঙ্গে মাধবীকে সে প্রবীরের হাত চেপে ধরতে দেখেছে তাতেই সে নিঃসন্দেহ হয়েছে যে মাধবী প্রবীরকে ভালবাসে আর প্রবীরও মাধবীকে ভালবাসে।

অথচ একটা অতি সাধারণ গ্রাম্য মেয়ে দরিদ্রের মেয়ে! কিন্তু কি করা যায় ? শিক্ষা আর ঐশ্বর্য্য তো সবই অর্থহীন। নিজেকে পরিবর্ত্তিত করেছে শিখা, তপস্যাও করছে সে প্রবীরকে জয় করার জন্য। কিন্তু সবই ত' আজ নিষ্ফল ও অর্থহীন মনে হচ্ছে। বেঁচে থেকে লাভ কি ?

তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। দেরী নয়, আজকেই।

প্রবীরের ঘর।

"আপনার 'ক্যাপিটাল' বইটি কিন্তু এখনো আমার কাছে।" শিখা হেসে বলল।

"তাই নাকি! আমি ত' একেবারে ভুলে গিয়েছি সে কথা।"

"ভুললেই বা কি, আপনার বই মারা যাবে না।"

প্রবীর হেসে উঠল।

"বইটা পড়েছেন?" সে জিজ্ঞেস করল।

"উঁহু—আমি তো বইটা পড়বার জন্য নিই নি।"

"তবে?"

"দ্বিতীয়বার আপনার সঙ্গে দেখা করার একটা হেতু খুঁজে পাচ্ছিলামনা, ঐটে উপলক্ষ্য করে সে সুযোগ ঘটবে বলেই বইটা নিয়ে গিয়েছিলাম।"

প্রবীর ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে গেল। সে শিখার দিকে তাকাল, শিখাও তার দিকে নির্নিমেষ ও ক্ষুধার্ত্ত নয়নে তাকিয়ে আছে।

শিখা বলল; "অত সূক্ষ্মতত্ত্বের জন্য আমার তো কোনো মাথাব্যথাই নেই—আসলে—"

"আসলে কি?

শিখা চুপ করল কিন্তু দৃষ্টি ফিরাল না।

"অত কি দেখছেন আমার মধ্যে?" বিকৃতভাবে হাসল প্রবীর!

"তোমায়।" শিখা বলল।

"কি বলছেন!"

"ঠিকই বলছি," শিখা উঠে দাঁড়াল, উত্তেজনায় তার কৃশ তনুটি বায়ুতাড়িত লতার মত কেঁপে কেঁপে উঠছে, "ঠিকই বলছি প্রবীর। দোহাই তোমার, আমায় আপনি বলে আর অপমান করোনা তুমি।"

প্রবীর ভয় পেল। এই আগ্নেয় বিস্ফোরণের জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। এমন ঘটনা যে একদিন ঘটতে পারে সে সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরেছিল বলেই সে শিখাকে আমল দিত না, তাকে সে এড়িয়ে চলত। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি, এমন আকস্মিকভাবেই যে সেই ঘটনা ঘটবে তা সে মোটেই ভাবত না।

"আমি কি তোমায় অপমান করি?" বিবর্ণমুখে প্রবীর উচ্চারণ করল।

"কর বৈকি। আর কেন অপমান কর তা শুনবে? কারণ তুমি জান যে আমি তোমায় চাই, তোমায় ভালবাসি"—হঠাৎ নির্লজ্জভাবে মুখরা হয়ে উঠল শিখা।

"শিখা!"

"বলতে দাও, দোহাই তোমার। হ্যাঁ, আমি তোমায় ভালবাসি। কতভাবে তোমায় ইঙ্গিত দিয়েছি, জানিয়েছি, তুমি সাড়া দাও নি, আমায় এড়িয়ে চলেছ বরাবর। তুমি জেলে গেলে, তোমারি প্রতীক্ষায় আমি দিন কাটিয়েছি, তোমার তপস্যা করেছি, নিজের অহঙ্কার আর আভিজাত্যকে ভেঙ্গে ফেলে নিজেকে তোমার মত করার চেষ্টা করেছি আমি"—

"শিখা। থাম"—বিবর্ণ, পাংশু হয়ে গেছে প্রবীর। হঠাৎ ভয় লাগছে তার! শিখাকে যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হয়, অস্বাভাবিক ও উগ্র বলে মনে হয়!

"না, আমি থামব না," শিখা মাথা নাড়ল, ডান চোখের উপর থেকে আনত একগুচ্ছ অলককে সরিয়ে দিয়ে সে বলে চলল, "আজ আমার হৃদয়কে নিঃশেষিত করব আমি। হ্যাঁ, আমি তোমায় জয় করবার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছি, ভিক্ষুকের মত নিজেই উপযাচিকা হয়ে তোমার

পিছনে পিছনে ঘুরেছি। সে বিষয়ে আমার লজ্জা নেই, আমার দুঃখ নেই, থাকলেও তা ভুলতে পারব আমি, আমার সমস্ত বেদনা সার্থকতায় আবার অপরূপ হয়ে উঠবে যদি তুমি—যদি তুমি আমায় গ্রহণ কর”—

“থাম, দোহাই তোমার, তুমি থাম শিখা।”—

প্রবীরের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল শিখা, রুদ্ধ কণ্ঠে, নিজের বেদনা বিদীর্ণ অন্তস্তলের গোপন কথাগুলোকে আজ উজার করে দিয়ে সে বলল “তুমি আমায় গ্রহণ করো, তুমি আমার জীবনকে ধন্য করো—আমায় তোমার ক্রীতদাসী করে নাও”—

একি নাটকীয় ঘটনা! একি অবাঞ্ছিত পরিবেশ! ভয় লাগে প্রবীরের।

হাতে ধরে সে শিখাকে দাঁড় করাতে গেল। শিখা উঠবে না।

“তুমি আজ জবাব দাও—হ্যাঁ কি না—শেষ কথা বল আমায়। আশা নিরাশার মাঝে আমি দিন দিন, তিলে তিলে, পুড়ছি, মরছি,—তার শেষ করে দাও তুমি।”

কি করবে প্রবীর? কোথায় যেন মনটা খচ্‌খচ্‌ করে, দুর্ব্বল বোধ হয়। একটা যন্ত্রণাদায়ক অন্তর্দ্দন্দ্ব। সব ছেড়ে দেবে সে? জমিদার-কন্যাকে বিয়ে করে ড্রয়িংরুমে বসে বসে, শত সহস্র বঞ্চিতের উপর মোড়লী করে সে কি জীবনটাকে আজ গতানুগতিকতার দিকে আলস্যের আর বিলাসের দিকে ঠেলে দেবে? তা নয়, আসল কথা এই যে প্রবীর কি শিখাকে ভালবাসে?

না। প্রবীর শিখাকে ভালবাসে না। সমবেদনা, সহানুভূতি প্রশংসা এর বেশী অন্য কোনো অনুভূতি আর শিখার জন্য তার নেই। না, সে শিখাকে ভালবাসে না।

প্রবীর কি শিখাকে পরে ভালবাসতে পারে? খুব ভাবল প্রবীর

ভাবতে গিয়ে বারংবার মাধবীর মুখটা মনে পড়ে যায়, বারংবার মাধবীর ছোট ছোট কথা মাথার ভিতর টোকা মেরে যায়।

না, সে শিখাকে ভালবাসতে পারবে না।

"জবাব দাও"—শিখা যেন উন্মাদিনী হয়ে গেছে।

"পারবে সহ্য করতে?"

"পারব যদি আকাশের বজ্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়, তবু সহ্য করতে পারব।"

"তুমি আমার বোন, তুমি আমার বন্ধু"—

"বলোনা—বলোনা ওকথা"—আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল শিখা।

"হ্যাঁ, শিখা, তুমি আমার কথা শোন।"

"ভেবে দেখ গো—ভেবে দেখ।"

"এই আমার শেষ কথা শিখা।"

শিখা চুপ করল। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। দু'চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সে প্রবীরের দিকে তাকাল।

"তুমি কি আর কাউকে ভালবাস?" হঠাৎ যেন প্রবীরের উপর কষাঘাত করল শিখা। তার ঠোঁটের কোণে একটা তিক্তমধুর হাসির রেশ,অথচ তার দুচোখ বেয়ে এবার জল নেমেছে।

প্রবীর তার দিকে তাকাল। সে কি মিথ্যা কথা বলবে, সে কি প্রতারণা করবে শিখার সঙ্গে? না! ভেঙ্গে যাক্ শিখা তবু মিথ্যা বলে ওকে আরো দুঃখ দিয়ে লাভ নেই!

প্রবীর কি কাউকে ভালবাসে? উত্তর খুঁজতে গিয়ে মনের কাছে সে পরিস্কার উত্তর পেল। হ্যাঁ, সে আর একজনকে ভালবাসে।

"বাসি—আমি আর একজনকে ভালবাসি"—

শিখার দুচোখ বেয়ে জল নেমেছে। তার চোখের ভিতরকার

স্নায়ুজালের মাঝে কোথায় কি যেন বিগড়ে গেছে তাই অনর্গল দরদর করে জল নামছে তার দুচোখ বেয়ে।

"ওঃ—ওঃ"—যেন অথৈ জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে শিখা। নিমজ্জিত ব্যক্তির অন্তিম আর্ত্তনাদ যেন ধ্বনিত হল তার কণ্ঠস্বরে।

"শিখা, শান্ত হও।"

শিখা খিল্‌খিল্ করে হাসল, "তাই বল, তাইত ভাবি কেন এমন নিষ্ফল হই। ঠিক, আমি যা ভেবেছি তাই ঠিক"—

"কি ?"

"তুমি মাধবীকে ভালবাস।"

"হ্যাঁ।"

শিখা হঠাৎ দ্রুত দরজার দিকে ছুটে গেল।

"শিখা।"

শিখা দাঁড়াল, প্রবীরের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

"কিন্তু শুনে রাখ প্রবীর, আমি তোমার আশা ছাড়তে পারব না—আমার জীবন ব্যর্থ হোক্, যাই হোক্ না কেন, তবু আমি তোমারি জন্য বসে থাকব"—

"শিখা"—

"আমি যাই"—

তীরের মত বেরিয়ে গেল শিখা।

"একা যেয়ো না শিখা—শোন"—ছুটে গেল প্রবীর।

বাইরে অন্ধকার।

শিখা দৌড়ে চলেছে। খোঁপা ভেঙ্গে পিঠের উপর এলিয়ে পড়েছে তার, অশ্রুবর্ষী চোখদুটো জ্বলছে, শাড়ীর আঁচল পিছনে উড়ছে।"

"শিখা—শিখা"—

শিখা দূরে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ দুঃখ হয় প্রবীরের। নিজের জন্য। একি শৃঙ্খলে জড়াচ্ছে সে নিজেকে! কেন সে মানুষের দুঃখের কারণ হচ্ছে? অথচ ভাবলে প'রে সে নিজের কোনো দোষ খুঁজেও পায় না। একি বিপদ!

ভ্রুকুটিকুটিল নেত্রে শশাঙ্কবাবু বললেন, "তোমার জন্যই বসে আছি শিখা।"

শিখা দাঁড়াল, "কেন বাবা?"

"কোথায় গিয়েছিলি তুই?" শশাঙ্কবাবুর কণ্ঠস্বর কর্কশ।

ভগ্নকণ্ঠে, নিস্তেজভাবে শিখা বলল, "বেড়াতে।"

"মিথ্যে কথা বলিস্ না, আমি জানি তুই কোথায় গিয়েছিলি"—গর্জ্জন করে উঠলেন শশাঙ্কবাবু।

"তবে আর জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"তোকে আমি নিষেধ করেছিলাম ঐ লোফার প্রবীরের সঙ্গে মিশতে অথচ তুই তা অগ্রাহ্য করে ওর সঙ্গে এখনো গিয়ে দেখা করিস্!"

"হ্যাঁ করি।"

"আর এমন করতে পারবি না তুই।"

হঠাৎ যেন বেপরোয়া হয়ে উঠল শিখা, রিণরিণে গলায়, উদ্ধত ও ক্রুদ্ধভাবে সে বলল, "নইলে কি করবে?"

"কি! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা হয়েছে যে তুই আমার মুখের উপর কথা বলিস্! শিক্ষা দিয়ে যে তোর সাহস আর নির্ল্লজ্জতাই শুধু লাভ হবে তা যদি আমি জানতাম তবে তোকে বাড়ীর বাইরে আর পা দিতে দিতাম না।"

"এখন কি করবে শুনি ?"

"আর দিন পনেরোর মধ্যেই তোর বিয়ে—সব ঠিক। আমি তোকে শেষবার নিষেধ করে দিচ্ছি যে তুই আর বাইরে বেরোতে পারবিনা।"

"কিন্তু আমি বাইরে যাবই বাবা।"

"শিখা!" ক্রোধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো শশাঙ্কবাবু।

চীৎকার শুনে বিভাবতী আর জয়ন্ত এসে দাঁড়াল।

"হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, আমি বিয়েও করব না।"

জয়ন্ত অমুচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, "এযে রীতিমত নভেল হল বাবা—হাউ ইণ্টারেষ্টিং!"

বিভাবতী ম্লানমুখে স্বামীকে বললেন, "এখন তুমি থাম—পরে হবে ওসব কথা"—

"চুপ!" শশাঙ্কবাবু হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন, "শেষবার বলছি শিখা ছেলেমানুষী করিস্ না।"

"আমি ত' আর ছেলেমানুষ নই বাবা যে তোমার ধম্‌কানিতে ভয় পাব, আমায় তুমি ধম্‌কো না।" মরিয়ার মত কথা বলছে শিখা হিতাহিত জ্ঞান ওর লুপ্ত হয়ে গেছে।

"বটে!" মুহূর্ত্তকাল ক্রোধে নির্ব্বাক হয়ে গিয়ে আবার ফেটে পড়লেন শশাঙ্কবাবু, "তুই তাহলে এম্‌নিতে শুনবি না ?"

"তাইত মনে হচ্ছে।"

শিখার দিকে এগিয়ে ছুটে গেলেন শশাঙ্কবাবু। বজ্রমুষ্টিতে তার ডান হাতটা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন তিনি।

বিভাবতী চেঁচিয়ে উঠলেন, "কি করছ তুমি ? ওগো—"

"চুপ্। আমি ওকে তালাবন্ধ করে রাখব।"

"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

"চুপ্ করো, আমায় বাধা দিয়ো না। একটা একরত্তি মেয়ের কাছে আমি হার মানতে রাজী নই। আমায় বাধা দিয়ো না—বাধা দিলে তোমরা আমার মরা মুখ দেখবে।"

জয়ন্তও এগিয়ে এল, "দিস্ ইজ্ টু মাচ্ বাবা—"

"শাট্ আপ্ ইউ পাপি।"

জয়ন্ত পিছু হটে গেল।

শিখার ঘরে গিয়ে থামলেন শশাঙ্কবাবু।

"এখনো বল্—কথা শুন্‌বি?

"না।" শিখা কাঁদছে।

"তবে থাক্।"

বেরিয়ে গেলেন শশাঙ্কবাবু, বাইরের থেকে ঘরে শিকল বন্ধ করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাতেও খুশী না হয়ে, তালাচাবি এনে লাগালেন তাতে।

"দেখা যাক্—দেখা যাক্ তোমার গোয়ার্তুমি কমে কিনা—" নিজের মনে বিড় বিড় করে বলে শশাঙ্কবাবু চুরুটে টান দিতে লাগলেন।

বিভাবতী পাষাণ-প্রতিমার মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

নিজের জীবনেতিহাসের পাতাগুলোকে অতিদ্রুত উল্‌টে গেল শিখা। কি আছে তার? সব আছে অথচ কিছু নেই। ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি আর প্রতিপত্তির মোহ যতদিন ছিল ততদিন সবই ছিল। কিন্তু সে বদ্‌লেছে। আজ দারিদ্র্যও মহান্ মনে হয়, খ্যাতির চেয়ে অখ্যাতিও কাম্য, প্রতিপত্তির চেয়ে অপ্রতিপত্তিতেও দুঃখ নেই। অথচ যার জন্য সে বদ্‌লাল সে আজ প্রত্যাখান করেছে, সে আর একজনকে ভালবাসে। মানুষ কেন বেঁচে

থাকে? খাওয়া পরা আর বেঁচে থাকা নিয়ে যে জীবন তা তো শিখা আর চায় না। সে যা চায় তা আর পাবার উপায় নেই। তবু বাঁচা যেত, যদি আদর্শ থাকত একটা। যদি একটা কর্ম্মের পথ থাকত তার; না থাকলেও তা খুঁজে বের করা যেত। কিন্তু কি লাভ আর তাতে? প্রবীরকে খুশী করার জন্য, প্রবীরের মনের মত হবার জন্যই সে সব কিছু করতে রাজী ছিল। কিন্তু তা আর হল না। বালির বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে, আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার কথা আজ আকাশ কুসুমের মতই অবাস্তব। আজ শিখা একা। বাপ বিরুদ্ধে, ভাই বিরোধি, মা অসহায়া। বাঁচতে গেলে একটা অবলম্বন চাই। কিন্তু সে অবলম্বন আজ শিখার কোথায়? অতএব শিখার বেঁচে থেকে লাভ কি?

অতি দ্রুত ব্যাপারটা ঘটল। মস্তিষ্কের অন্ধকার গুহায়, অদৃশ্য লেখায়, দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির অমোঘ নির্দ্দেশ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা ঘটল। তারপরে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হয় নি।

টেবিলের উপর একটা চেয়ার রাখলেই কড়িকাঠের রিংটার নাগাল পাওয়া যায়, তাতে একটা শাড়ী বেঁধে একটা ফাঁস তৈরী করতে আর কতক্ষণ লাগবে? তারপরেই যবনিকা পতন।

দু'ঘণ্টা বাদে দেখা গেল, শিখা মরেছে। মরেছে নয়, শিখা আত্মহত্যা করেছে। কার্ল মার্ক্স'এর 'ক্যাপিটাল' বইটা আর প্রবীরকে ফেরৎ দিতে পারল না। তার কথা সে রাখতে পারল না।

ঐ পাঁচ বিঘা জমিও যাবে।

হরিভূষণ গাঙ্গুলি হরিচরণের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেছে। মানুষের বিপদের সময় দয়া দেখালে কি মহাজনী চলে?

টাকা কই? নাই। অতএব মোকদ্দমার বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা নেই আর।

জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে, সংসারে খরচাও বেড়েছে।

এ বছর ফসল মন্দ হয়নি, বৃষ্টিও বেশ হচ্ছে। হরিচরণের ক্ষীণ আশা আছে যে হাতে পায়ে ধরে কারো কাছ থেকে অল্প টাকা নিয়ে তিন চার মাস মোকদ্দমাটাকে ঠেকিয়ে রাখবে সে। তারপর ফসল থেকে কিছু টাকা এলেই ভিতরে ভিতরে আপোষ করে নিয়ে মোকদ্দমাটা খারিজ করিয়ে নেব।

কিন্তু আকাশের দেবতা বাদ সাধল। আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে অশ্রান্ত বর্ষণ শুরু হল। প্রায় দিন সাতেক চলল। বুড়ীগঙ্গা আর খালের জল ছাপিয়ে গ্রামর রাস্তাঘাট ডুবিয়ে দিল, ধলেশ্বরীও গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

সাতদিন বাদে বৃষ্টি থামল বটে কিন্তু আবার দু' তিন দিন বাদেই শুরু হল? আবার তিন চারদিন। অনবরত।

যে ফসল ভাল হয়েছিল তার অর্দ্ধেক পচে গেল।

রিক্ততার, অভাবের কঙ্কালটা হরিচরণের চোখের সামনে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দিল।

নেপথ্যে, রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে, ভারতবর্ষের অদৃষ্ট নিয়ে মারামারি চলেছে।

স্বেচ্ছায় ইংরেজেরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে না, জাতীয় সরকার ও না! সে কথার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, কথার জাল বুনে তাকে লুকোবার চেষ্টা করলেও ইংরেজদের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

আগষ্ট মাসে, বোম্বাইয়ে, নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হল। ওদিকে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের চেষ্টা চলছে। কংগ্রেস প্রস্তাব করল যে ইংরেজেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে চলে যাক্—তাদের জাতীয় দাবী গ্রহণ করুক, আর যদি তা না গৃহীত হয় তবে আন্দোলন শুরু করা হবে। তবে সেই সংগ্রামের পূর্ব্বেও শেষ চেষ্টা করবে কংগ্রেস, সোভিয়েট, চীন ও আমেরিকাকে তাদের দাবী জানিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয় দাবী পূরণ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করবে।

ইংরেজেরা ভয় পেল। যদি কংগ্রেস-লীগ তথা সারা ভারতবর্ষ মিলিত হয় এবং আন্তর্জ্জাতিক সহানুভূতিকে তারা লাভ করতে পারে তবে তো মহাবিপদ ঘটবে।

সে বিপদের সম্ভাবনাকে বন্ধ করার পথ কি? আমলাতন্ত্র অস্থির হয়ে উঠল।

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব তথা কংগ্রেসের সংগ্রামাত্মক প্রস্তাব পাশ হল।

আর দেরী নয়। ৯ই আগষ্ট ইংরেজ সরকার সব নেতাদের বন্দী করল।

তুষের মত যে আগুন জ্বলছিল ধিকি ধিকি করে প্রবল বায়ুর সংস্পর্শে তা এবার যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ভারতবর্ষের কোটী কোটী

লোকের মনে যে আগ্নেয়গিরি জাগ্রত হয়ে অপেক্ষা করছিল তা এবার অগ্ন্যুদ্গার করল।

ওদিকে যুদ্ধের গতিক সুবিধার নয়। ইউরোপে জার্ম্মানরা রাশিয়ান-দের উপর প্রবল চাপ দিয়েছে, আফ্রিকায়ও কোনো নিষ্পত্তি হয়নি, প্রাচ্যদেশে জাপানের অগ্রগতি থামে নি, বর্ম্মাদেশ সম্পূর্ণভাবে তাদের করায়ত্ত, বঙ্গোপসাগরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে জাপানী ঘাঁটির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বোমা আর কামানের শব্দে পৃথিবী কাঁপছে, বারুদের ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস রুদ্ধশ্বাস।

"এবার ?" প্রবীর সুব্রতকে প্রশ্ন করল।

সুব্রত উত্তেজিত।

"এবার ?" আবার প্রশ্ন করল প্রবীর।

"কি ?"

"এবার কি হবে ?"

"সংগ্রাম।"

"কিন্তু কি রকম সংগ্রাম ?"

"অসহযোগিতা—বিপ্লবাত্মক প্রতিরোধ।"

"কিন্তু কংগ্রেস ত' সে বিষয়ে নির্দ্দেশ দেয় নি।"

"না দিলেই বা, ইঙ্গিত আছে, আর নির্দ্দেশ দেবার সময়ই বা কোথায় পাওয়া গেল ?"

"দায়িত্বটা নিজেদের ঘাড়েই নিবি ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু দেশের বিপদে, যুদ্ধের অবস্থা কি দেখ্‌ছিস্‌ না ?"

"কি যায় আসে ? জাপান আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে না। তাছাড়া দেশের নেতাদের এম্‌নিভাবে বন্দী করাতে কি বোঝায় ? তারা অপমান করল আমাদের। সারা দেশকে তারা পদাঘাত করল। তার প্রতিশোধ নিতে হবে।"

"পরাধীন জাতির সে ত' পুরানো কথা। প্রতিশোধ নিতে গেলে তৈরী হতে হবে, সবাইকে মিলিত হতে হবে, সুনির্দ্দিষ্ট পথ ধরে সংগ্রাম করতে হবে।"

"বিপৎকালে নিয়ম বজায় থাকে না। আজ প্রত্যেক মানুষই নিজের নিজের সেনাপতি হবে। সফল হই আর না হই তাতে যায় আসে না, আজ আমরা যুদ্ধে নামবই, অপমান আর অত্যাচারের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবই।"

"তুই কি যুক্তি মানবি না।"

"তোর যুক্তি নয় প্রবীর, আমার রক্তে আজ অন্য ঘোষণা।"

হবে না—সুব্রতকে আর ফেরানো যাবে না। উতরোল রক্তধারা কখনো যুক্তির ধার ধারে না।

সারা দেশ যেন গজরাচ্ছে। নিরুপায় আক্রোশ, নিস্ফল ক্রোধে সারা দেশ যেন ক্ষেপে গেছে। তার ঢেউ এসেছে কলাতিয়া গ্রামে।

সুব্রতর সময় নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই।

সভা হবে। হাটের মাঝখানে। তারি জন্য সুব্রত ব্যস্ত।

ঘরে ঘরে যায় সে, ইস্তাহার বিলি করে, উত্তেজক কথা বলে।

"আর কতদিন অপেক্ষা করবে তোমরা ? সময় কি হয়নি ?"

উত্তেজনায় ছোঁয়াচ লাগে সবার মনে, যে আগুনের জ্বালায় সুব্রত এমন ভয়ঙ্করভাবে উত্তেজিত হয়েছে তা অন্যের মধ্যেও সংক্রামিত হয়।

"সময় কি হয়নি ? বল—"

সবাই মাথা নাড়ে, "হয়েছে।"

"তবে আসবে সবাই—আসতে হবে তোমাদের।"

"যাব, যাব।"

ইদ্রিস্ খাঁর কাজ বাড়ল। মোটাখামে শহর থেকে এস্. পি'র নির্দ্দেশ এসেছে। রিভলভারটা কোমরে নিয়ে সে দিনরাত ঘুরে বেড়াতে লাগল। ধারালো হাসিতে মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার। হোক্ না একটা কিছু, কড়াহাতে শায়েস্তা করবে সে, যত্তসব দেশভক্তদের গারদে পুরে ঠাণ্ডা করে দেব সে, ইন্‌স্পেক্টর হওয়ার পথ করে নেবে অল্প আয়াসে।

জয়ন্তর সঙ্গে দেখা হলো পথে।

"কি খবর দারোগা সাহেব ? সামনে যে অনেক কাজ।"

"তাতে ডর কি মিঃ রায় ?"

"কি করবেন ?"

রিভলবারে হাত দিল ইদ্রিস, "দরকার হলে সবই করব।"

"দ্যাট্ উইল বি ইণ্টারেষ্টিং ইনডিড্"—জয়ন্ত হেসে বলল, "আপনার ওখানে একদিন যাব দারেগা সাহেব—অনেক কথা আছে"

"স্বচ্ছন্দে।"

"গুড্ ডে।"

মনে মনে খস্‌ড়া করে জয়ন্ত। অনেকগুলো কাঁটা আছে তার সামনে। সেগুলোকে সরাতে হবে। কণ্টকেন কণ্টকোৎপাটিতম্।

আবদুল বলল, "কম্‌রেড্‌—ওরা উত্তেজিত।"

প্রবীর শঙ্কিত হল, "কারা ?

"শ্রমিকেরা।"

"কেন ?"

"জয়ন্তবাবু'র অত্যাচার আর কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারে—ওরা আবার ধর্ম্মঘট করতে চায়। তাছাড়া, মজুরীও অরো বেশী চায় তারা —জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে।"

"কিন্তু সব সময় তো এক নিয়মে চললে হবে না আবদুল। দেশের এখন বড় দুর্দ্দিন—শত্রু নিকটস্থ—এখন আমাদের নীতি হবে আত্মরক্ষাত্মক।"

"ওরা মানতে চায় না।"

"উত্তেজনা আর আবেগে সব সময় ভাল কাজ হয় না আবদুল, যুক্তি আর বুদ্ধিকে মানা উচিত। রাজনীতি বড় কঠিন জিনিষ, একটা রাজনৈতিক ভুলে দেশের চরম সর্ব্বনাশও হতে পারে। এখন আমাদের সইতে হবে, মিলিত হতে হবে, অন্য পথে গেল এখন ধ্বংস আর মৃত্যুই হবে আমাদের লাভ। তা কি চায় ওরা ?"

"কি করা যায় তবে ?"

"ওদের বোঝাতে হবে—থামাতে হবে, আজকে মিটিং করো।

সেদিন সন্ধ্যার পরে মিটিং বসল।

আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের কোটী কোটী পরাধীন লোকের বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

ধ্বনি উঠছে—"বন্দে মাতরম্।"

ধ্বনি উঠছে—"মাহাত্মা গান্ধীকি জয়।"

ধ্বনি উঠছে—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।"

আন্দোলন শুরু হয়েছে। অগণন নরনারীর মিছিল চলেছে। তাদের পদক্ষেপে মাটী কাঁপছে। তাদের হস্তধৃত ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা বায়ুভরে সোল্লাসে উড়ছে।

শৃঙ্খল ছিঁড়ছে—তার ঝন্ঝন্ শব্দে শোনা যায়। শৃঙ্খলিতের চোখে ঘনায় স্বাধীন জীবনের দীপ্তি। একজন নয়, দুজন নয়, অগনণ নরনারী'র মর্ম্মস্থল থেকে ধ্বনি উঠল, ঘোষণা উচ্চারিত হল। সময় এসেছে। বহুযুগের শোষক, পরস্বাপহারী, অত্যাচারী বিদেশী শাসকেরা শোন তোমরা যাও—ভারতবর্ষ থেকে বিদায় হও। অনেক জুয়াচুরি আর জালিয়াতি, শঠতা আর প্রবঞ্চনা করেছ তোমরা—পরের দেশে পরের রক্ত চুষে চুষে তোমরা নিজেদের জোঁকের মত শাঁসালো করেছ। সাদা রং আর অস্ত্রের জোরে, বিজ্ঞান আর বাহুর বলে, আমাদের ভেদাভেদ আর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমরা যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছ তার দিন এবার শেষ হল। হে শ্বেতাঙ্গ বণিক প্রভুর দল—তোমরা এবার বিদায় হও।

১৪ই আগষ্ট।

খবর এল যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে জনতা'র উপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। খবর এল যে রক্ত পড়েছে—নিরস্ত্রের আর নির্য্যাতিতের লাল রক্ত দিয়ে ভারতবর্ষ রক্ত-তিলক পরেছে।

সে খবরে রক্ত উতরোল, পেশীতে এল কাঠিন্য, চোখে এল প্রতিজ্ঞা কণ্ঠে এল অভিশাপ।

হাটে সভা বসেছে। চারপাঁচশ লোক এসেছে। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে দূর দূর থেকে লোক এসেছে। উত্তেজনায় উৎকর্ণ হয়ে সবাই সুব্রতর বক্তৃতা শুনছে। সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলেছে।

"কিছু একটা করতে হবে" সুব্রত বলছিল, "সেদিন এসে গেছে। আর দেরী নেই; আর দেরী করলে চলবে না! অনেক চেষ্টা হয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দাবী জানানো হয়েছে। কিন্তু ভাইসব, 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'। আবার আমরা বুঝতে পারছি যে স্বেচ্ছায় তারা কিছু দেবে না—তারা আমাদের পায়ের নীচেই রাখতে চায়। তার প্রমাণ আমাদের নেতাদের কারাভোগ। কিন্তু আর নয়, এবার আমরা সংগ্রাম ঘোষণা করছি—আমরা এবার প্রতিশোধ নেব। প্রতিশোধ কেন? অধিকারকে আদায় করব। অস্ত্র দিয়ে নয় কারণ আমরা নিরস্ত্র, অস্ত্র দিয়ে নয় কারণ অস্ত্রকে জয় করারও বড় অস্ত্র আছে। আমাদের সে অস্ত্র অহিংসা। ভাইসব, সেই অদ্ভুত অস্ত্র দিয়ে আমরা বিদেশী শাসকদের দেশ থেকে তাড়াব।"

এই ত' সময় জাপানীরা চাপ দিয়েছে—ইংরেজ বিপন্ন—সহজে যা দিল না আজ বাধ্য হবে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে তারা।

উত্তেজিত জনতা ধ্বনি তুলল—"বন্দে মাতরম্।"

"মহাত্মা গান্ধীকি জয়"—

"ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্"—

"ইনকিলাব জিন্দাবাদ"—

হঠাৎ বাধা পড়ল। ব্রিটিশ সরকারের দেশী ভৃত্যরা এসে হাজির"

হল। তাদের মাথার লাল পাগড়ী সূর্য্যের আলোকে ঝলমল করে উঠল। দশজন কন্‌ষ্টেবলকে নিয়ে ইদ্রিস খাঁ হাজির হয়েছে।

সুব্রত বলে চলল, "তোমরা কি শুনেছ? গুলি চলেছে কত জায়গায়, পুলিশদের ঐ লাল পাগড়ীর মত কত মানুষের লাল রক্ত মাটিতে শুকিয়েছে? শোননি, তোমরা কি শোননি সে নৃশংস কাহিনীর কথা?"

"সুব্রত বাবু—থামুন—এসভা বন্ধ করুন।" ইদ্রিস খাঁ সগর্জ্জনে হুকুম করল।

"কিন্তু কি যায় আসে? কত রক্তপাত করবে ওরা? ভাইসব আমরা প্রাণ দেব, একের পর একজন আমরা বুক পেতে দাঁড়াব। কত মারবে, কত গুলি চালাবে ওরা?"—

ইদ্রিস খাঁ আবার হুঙ্কার ছাড়ল, "শেষ কথা, শুনুন সুব্রতবাবু—থামুন"—

"শোন' শোন ভাইসব। হুম্‌কী দিয়ে থামাতে চায় ওরা—জোর করে আমাদের দাবিয়ে রাখতে চায় ওরা"—

অসহিষ্ণুভাবে কন্‌ষ্টেবলদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ইদ্রিস, হুকুম দিল—"চার্জ্জ"—

মুহূর্ত্তে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। সেই দশজন কন্‌ষ্টেবল লাঠি নিয়ে জনতার মাঝে লাফিয়ে পড়ল। লাঠির খোঁচা আর আঘাত দিয়ে তারা লোকদের হটিয়ে দিতে লাগল।

চীৎকার করে উঠল সুব্রত, উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে দু'হাত উপরে তুলে সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলল, "ভয় পেয়ো না স্থির হয়ে বসো—পালিয়ো না, হটে যেয়ো না। কত—আর কত অত্যাচার করবে ওরা? শোন"—

কিন্তু ততক্ষণে ঘটনা অনেকদূর এগিয়েছে। লাঠির খোঁচা খেয়ে সবাই চীৎকার করে উঠল, "বন্দে মাতরম্"—

আঘাত পেয়ে অনেকে চীৎকার করে বলল, "এই কজন লোক ত' মাত্র, ওদের লাঠিগুলোকে ছিনেয়ে নাও"—

তখন কনষ্টেবল্‌গুলো বন্ বন্ করে অন্ধের মত লাঠি ঘুরোতে লাগল। ইদ্রিস খাঁ আবার গর্জ্জে উঠল "চার্জ্জ—আরো—আরো"—সেও এগিয়ে গেল, কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভারটাকে বের করে সে ধাক্কা আর ঘুষি মেরে লোকদের সরাতে লাগল।

"পালিয়োনা—এইত' পরীক্ষার সময়—ভাইসব—শোন"—উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠল সুব্রত।

কিন্তু ততক্ষণে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। বিরাট কোলাহল। ক্রোধ, ভয় আর আঘাত জনিত চীৎকার ও আর্ত্তনাদ। যারা রুখে দাঁড়াত তারা ইদ্রিসের রিভলভার দেখে ভয় পেল। হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কি। লাঠির ঘায়ে জর্জ্জর হয়ে সবাই পালাতে শুরু করল।

"কাপুরুষের দল—শোন—ফিরে দাঁড়াও। এত ভয়? এত ভয়?"—লাফিয়ে নীচে নামল সুব্রত, চীৎকার করে গলা চিরে গেছে তার, দু'কসে ফেণা জমেছে, দু'চোখ বেয়ে জল নেমেছে।

"ভাইসব—শোন"—

হঠাৎ কে যেন সুব্রতকে টেনে নিল। সে রাজেন মণ্ডল।

"জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, ভাই—এখন কোনো ফল হবে না। মিছিমিছি চেষ্টা করে লাভ কি, এবার আরো ভালো করে তৈরী হতে হবে। তাছাড়া ভয় কেন—এই ত' সবে শুরু হল। আজ ওরা পালাল বটে কিন্তু দেখো ওরাই আবার কাল লড়াই করবে।"

দুঃখে, ক্রোধে উন্মাদের মত হয়ে গেছে সুব্রত। রাজেন মণ্ডলের কথা

ঠিক কিন্তু তবু সুব্রত না ভেবে পারে না। কেন পালাল ওরা? কেন? ভয়? তবে ওরা কাপুরুষ। কিন্তু কেন এই কাপুরুষতা? অস্ত্র নেই। অহিংসভাবে অস্ত্র না নিয়েও যে যুদ্ধ করা যায় তার মত আত্মিক শক্তি ওদের নেই। তবে? তবে কি আন্দোলন ব্যর্থ হবে? না, কাপুরুষের অহিংসার চেয়ে হিংসা ভাল। কিন্তু নীতি আর আদর্শ যে বদ্‌লে যাচ্ছে! বদ্‌লাক্, উপায় নেই। এ আন্দোলন থামলে চলবে না, আবার দেশ দশ বছর পিছিয়ে পড়বে, এতদিনের প্রস্তুতি সব নিষ্ক্রিয়তার অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। না, তা হবে না। সে অহিংসভাবেই লড়বে বটে কিন্তু যারা পারবে না তারা ইচ্ছেমতই লড়বে। গান্ধীজির সে বিষয়ে নির্দ্দেশ আছে। আসল কথা, লড়তে হবে, সংগ্রামকে চালু রাখতে হবে। যে ভাবেই হোক্, স্বাধীনতাকে এবার আদায় করতেই হবে।

জমিদারের বাড়ীতে ইদ্রিস খাঁ গল্প করছিল। জয়ন্তের সঙ্গে। শশাঙ্কবাবু আজকাল আর বাইরে বেশী বেরোন না। শিখার আত্মহত্যার জেরটা কাটিয়ে এখনো সাম্‌লে উঠ্‌তে পারেন নি তিনি।

ইদ্রিস্ আর জয়ন্ত নিম্নকণ্ঠে আলোচনা করছিল। ভারী গোপন সে সব কথা।

রাত্রিবেলায় কে একজন ডাকল, "সুব্রত বাবু"—

"কে?" সুব্রত বেরিয়ে এল।

গণেশ এসেছে—সে শহরে পড়ে।

"কি গণেশ ?"

"সোশ্যালিষ্ট পার্টির একটা সার্কুলার। এক বাণ্ডিল এনেছি।"

"দাও।"

একটু পরেই এল যতীন। এল তাঁতিপাড়ার নকুল, এল নমঃশূদ্র পাড়ার কার্ত্তিক, এল ইস্‌মাইল আর হারাধন। আর এল অবিনাশ মজুরদের বস্তী থেকে। অবিনাশ নিজেকে সাম্‌লাতে পারেনি, ইউনিয়নের নির্দ্দেশ বরাবরই মেনে চলে সে, তবু উষ্ণ রক্তের ঘোষণাকে সে অগ্রাহ্য করতে পারেনি।

ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে সার্কুলারগুলোকে ভাগ করা হল। এক একজন যাবে এক এক দিকে। পলাশোনা গ্রামেই আগে যেতে হবে।

"মনে রেখো, পরশুদিন—দশটার পরে, ধলেশ্বরীর ধারে সবাই জড় হবে।"

রাতের অন্ধকারে সবাই চারদিকে মিলিয়ে গেল। মাথার উপরে আকাশভরা মেঘের কোলে বিদ্যুৎ খেলা করছে। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে, কিসের ভয় ? ডাক এসেছে, প্রাণে জেগেছে উন্মাদনা, রক্ত হয়েছে উতরোল। এগিয়ে চল।

ঘরে ঘরে যায় ওরা, জনে জনে শোনায় সব কথা, সার্কুলার ছড়িয়ে দেয়।

"পড়ো—এটা পড়ো ভাই, পড়ে আবার আর একজনকে পড়তে দিও"—

"কাল দশটার পরে, ধলেশ্বরীর ধারে জড় হবে, মনে রেখো—ধলেশ্বরীর ধারে"—

ওদের মাথায় তেল নেই, উদরে অন্ন নেই, পায়ে এক হাঁটু ধুলো।

তবু কি যায় আশে। নারীদেরও সে কথা শোনায় ওরা—তারাও আগ্রহে শোনে তাদের কথা।

"পড়ো—পড়ে দেখ—ভাইসব আদায় না করলে কোনো কিছু পাওয়া যায় না।"

"স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার তা কি তুমি চাওনা ভাই ?"

"মনে রেখো, দশটার পরে—ধলেশ্বরীর ধারে এসে সবাই জড় হবে।"

সবাই পড়ে সে সার্কুলার। একজন আর একজনকে পড়তে দেয়। সে আবার তৃতীয় জনকে দেয়। সারা গ্রামে পড়ে, আলোচনা করে। উত্তেজনা আর আবেগ তাদের স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বিদ্যুতের মত ঝিলিক মারে।

নির্দ্দেশ—সংগ্রামের নির্দ্দেশ। সার্কুলারে লেখা আছে কি কি করতে হবে। গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করতে হবে, অমান্য করতে হবে, ইস্কুল কলেজ ছাড়তে হবে। সরকারী কর্ম্মচারী আর সৈন্যদের চাকুরী ছাড়তে বলা হবে। হাজার হাজার লোকের মিছিল নিয়ে সরকারী কার্য্যালয়গুলোকে দখল করে, অস্ত্রাগার ও অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করে, সেগুলোকে ধ্বংস করতে হবে, সরকারী পোষাক পোড়াতে হবে। শুধু তাই নয়—ডাকঘর, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস আর মাদকের দোকান ধ্বংস করতে হবে। টেলিগ্রাফের তার কাটতে হবে, ট্রেণচলাচল বন্ধ করতে হবে, খাজনা দেওয়া স্থগিত হবে। এককথায় সরকারকে অচল করতে হবে কিন্তু সব কিছুই অহিংস ভাবে করতে হবে। শেষ কথা এই যে আন্দোলন ব্যর্থ হলে হয়ত গান্ধীজি আমরণ অনশন করতে পারেন অতএব সফল হতেই হবে। তাছাড়া, দুর্ব্বলের

বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই.......করেঙ্গে ইয়ামরেঙ্গে। সবাই পড়ল। কিন্তু 'অহিংসা' কথাটা সবাই ভাল করে বুঝল না।

দুপুরবেলায় মাধবী এল।

"শোন"—সে এসে পাশে দাঁড়াল।

প্রবীর তখন কি লিখছিল। আবার গ্রামে গ্রামে যেতে হবে, লোকদের বোঝাতে হবে। কংগ্রেস জনসাধারণকে নেতৃত্বহীন অবস্থাতেও সংগ্রাম করার জন্য কোনো নির্দ্দিষ্ট আদেশ দেয়নি। অতএব এ সংগ্রাম যে এখন অস্থায়ীকালের জন্য স্থগিত রাখতে হবে তা লোকদের বোঝাতে হবে।

"প্রবীরদা।"

"কি ?"

"আবার কি সব আরম্ভ হল ?" বেশ বোঝা যায় যে মাধবী ভয় পেয়েছে। গতকল্যকার সভার কাহিনী তাকে যে রীতিমত চিন্তিত ও শঙ্কিত করে তুলেছে তা তার মুখেচোখে লেখা আছে।

"কি আবার হল ?" প্রবীর মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে হাসল।

"এই আন্দোলন ? কিন্তু না তুমি—তুমি ওতে যেয়ো না—দোহাই তোমার"—

হঠাৎ প্রবীরের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল মাধবী।

"আমি তোমার পায়ে ধরছি প্রবীরদা"—

প্রবীর হেসে ফেলল, "তুমি পাগল মাধু"—

"তুমি অন্যকথা বলে আমায় ভোলাতে পারবে না।"

"কিন্তু এসব বলার দরকার নেই যে মাধু"—

"কেন ?"

"আমি এবং আরো অনেকে এই আন্দোলনে যোগ দেব না।"

"সত্যি ? না, তুমি মিথ্যে কথা বলছ, আমায় এমনি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করছ।"

"না, সত্যি বলছি !"

"আমার গা ছুঁয়ে বল।"

"বলছি ."

মাধবীর বাহুকে স্পর্শ করতেই সেই পুরোনো অনুভূতিটা আবার আজ উপলব্ধি করল প্রবীর। তাড়াতাড়ি সে হাত সরিয়ে নিল, যেন আগুনে হাত দিয়েছে সে।

তবু মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আর একজনের কথা মনে পড়ল প্রবীরের। ভিক্ষুকের মত কাঙাল, প্রার্থী একটি মেয়ে। সেই মেয়েটি আজ আর বেঁচে নেই। সেই মেয়েটীর শোচনীয় পরিণামের জন্য পরোক্ষে প্রবীরই দায়ী। ধিক্কার আর আত্মগ্লানিতে প্রবীরের চিত্ত আজকাল প্রতিদিন জ্বলে। মাঝে মাঝে অকস্মাৎ স্মৃতির দরজায় করাঘাত করে সেই মেয়েটি। তার 'ক্যাপিটাল' বইটা সে ফেরৎ দেবে বলেছিল কিন্তু সে আর আসেব না, এ জীবনে না।

সে দিনটা কোনো কিছু হল না শান্তিতেই কাটল। ইদ্রিস্ খাঁ থানায় বসে খুশী মনে সিগারেট টানছিল আর একটা লিষ্ট্ দেখছিল। ভাবী আসামীদের লিষ্ট্।

কিন্তু ইদ্রিস খাঁ জানে না যে আড়ালে আড়ালে তোড়জোড় চলেছে।

সে জানে না যে কাল অনেকে আসবে—অনেকে—অনেক লোকের মিছিল কাল সমুদ্র তরঙ্গের মতো এসে তার উপর আছড়ে পড়বে।

মনোরমা চলে গিয়েছে।

রাসমণি আর মাধবী রান্নাঘরে।

কাজললতা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছিল।

দুষ্টছেলে কিছুতেই ঘুমোবে না।

"ঘুমোও, সোনা মাণিক ঘুমোও"—ছেলের পিঠে মৃদু চাপড় দিতে দিতে সুর করে গাইতে লাগল "আয় ঘুম আয়, সোনার কপালে আমার টিপ্ দিয়ে যা"—

সুরের তালে তালে চাপড় দেয় কাজললতা আর প্রতি চাপড়ে মুদ্রিতচক্ষু বালকটি অর্দ্ধ-তন্দ্রাঘোরে প্রতিধ্বনি তুলে জবাব দেয়—উঁ—উঁ—উঁ—উঁ—

ছেলে ঘুমোল ছেলের কোমল দেহটাকে বুকে চেপে ধরে স্বপ্ন দেখে কাজললতা। কোথায় কোন দূর দেশে, অখ্যাত স্থানের কোন অরণ্যে আর প্রান্তরে কারা যেন অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে। কামান গর্জ্জন করছে, বোমা ফাটছে, বিস্ফোরণের চকিত আলোতে টলমল সেই সব পদাতিকদের আবছা মূর্ত্তি মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

কাজলতা অস্ফুটকণ্ঠে গোঙায়, "ওগো—তুমি কোথায়? কবে আসবে তুমি, ওগো কবে ফিরে আসবে?"

কাজললতার চোখে আর জল নেই।

প্রান্তরের গান

"বন্দে মাতরম্!"

ধলেশ্বরীর ধার থেকে, গ্রামের দক্ষিণদিক থেকে সমুদ্র গর্জ্জনের মত একটা গম্ভীর ধ্বনি ভেসে এল।

থানার ভিতরে ইদ্রিস খাঁ লাফিয়ে উঠল।

"কলিমুদ্দিন"—হাঁক দিল সে।

"হুজুর?"

"তৈরী থাক সবাই আবার মিছিল আসছে।"

আবার ধ্বনি শোনা গেল—"বন্দে মাতরম্।"

ক্রমে আরো নিকটে ঘনিয়ে এল সেই উত্তেজিত ধ্বনি।

একটা কিছু ঘটবে আজ। ইদ্রিস্ খাঁ বারংবার রিভলভারের উপর হাত রাখে।

চার পাঁচশ লোকের জনতাকে দূরে দেখা গেল। পুরোভাগে সুব্রত, যতীন, কার্ত্তিক আর লতিফ। তাদের হাতে রয়েছে বড় বড় দুটো ত্রিবর্ণ পতাকা। ছেলে বুড়ো সবাই আছে দলে। শুধু পুরুষ নয়, জন ত্রিশেক স্ত্রীলোকও আছে মিছিলে। তাদের পুরোভাগে কার্ত্তিকের মা তরঙ্গিনী। তাদেরও হাতে আছে জাতীয় পতকা। ওদের সবার চোখে ধারালো ছুরির ভয়াবহ ইঙ্গিত, ওদের ললাটে রয়েছে সুকঠোর প্রতিজ্ঞার লেখা। ওরা আজ আর পালাবে না। আজ ওরা প্রাণ দেবে তবু মান দেবে না, ওরা আজ লড়বে।

"বন্দে মাতরম্"

আকাশ কাঁপল।

"মাহাত্মা গান্ধীকি জয়—"

বাতাস কাঁপল।

"বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক্—"

পাঁচশ নরনারীর পদক্ষেপে ধূলো উড়লো।

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্—"

অভিশাপ ঘোষিত হল।

"ইংরেজেরা ভারত ছাড়—"

দাবী।

মিছিল কাছে এল, এল হাটের মাঝে।

গ্রামের পূর্ব্বদিক থেকে প্রবীর এল। সে ব্যর্থ হয়েছে—অধিকাংশ লোকই তার কথায় কর্ণপাত করেনি। উষ্ণ রক্ত আজ তাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে।

সে এসে দূরে দাঁড়াল। কি করা যায়?

সুব্রত চীৎকার করে উঠল, "ভাইসব, দাঁড়িয়ে কেন? এ দেশ আমাদের—তবে ভয় কেন? এসো—থানার উপর আমাদের পতাকা উড়িয়ে দাও—"

ইদ্রিস্ গর্জ্জে উঠল—"সাবধান—"

জনতা সগর্জ্জে ধ্বনি তুলল—"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্—"

ইদ্রিস্ বলল—"পিছু হটে যাও—কথা শোন—"

জনতা উত্তর দিল—"বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক্—"

ইদ্রিস্ বল্‌ল—"খবরদার—কেউ এগিয়ো না—"

জনতা দৌড়ে গেল থানার দিকে, মুহূর্ত্তে তারা থানাকে ঘিরে ফেলল।

ইদ্রিস্ হুকুম দিল—"কলিমুদ্দিন তোমরা চার্জ্জ করো।"

দশটা লাঠি ঘুরতে লাগল।

কিন্তু আজ ভয় নেই।

"বন্দে মাতরম্—"

থানার চালে তখন জাতীয় পতাকা উড়ছে।

জনতা তখন ক্ষেপে গেছে। প্রতিটি পুলিশকে ঘিরে ফেলল তারা,-তার উপর লাফিয়ে পড়ে তার লাঠি কেড়ে নিল, তাকে চেপে ধরল।

প্রবীর দৌড়ে এল। একি হচ্ছে সব!

"সুব্রত—"

সুব্রতর জ্ঞান নেই।

ইদ্রিস্ চীৎকার করছে—"সরে যাও—সরে যাও বল্ছি—"

যতীন চীৎকার করে উঠল, "পুলিশদের ইউনিফর্ম্ম ছিঁড়ে ফেল ভাই সব—"

মূহূর্ত্তে সব লাল পাগড়ী আর খাকী জামা ছিন্ন হল।

"বন্দে মাতরম্—"

"ওদের ছেড়ো না—ধরে রাখ"—কার্ত্তিক সঙ্গীদের আদেশ করল।

"সুব্রত, একি হচ্ছে! সুব্রত"—প্রবীর উত্তেজিত কণ্ঠে ডাক দিল।

সুব্রত ফিরে তাকাল,—"আমায় ডাকিস্ না প্রবীর—আমাকে ফেরাবার আজ আর কোনো অধিকার নেই তোর।"

"দারোগাকেও ধর হে"—কে একজন বলল।

মন্দ কথা নয়। হঠাৎ পরম উৎসাহ বোধ করল সবাই। একদল ছুটে গেল ইদ্রিসের দিকে।

করমচার মত লালচোখ মেলে, কর্কশ চীৎকার করে, পিছু হটে পালাবার পথ খুঁজতে খুঁজতে ইদ্রিস্ বলল—"খবরদার ভাল হবে না।"

"দারোগা সাহেব, তোমার পোষাক খুলে ফেল—"

"দারোগা সাহেব, বল বন্দে মাতরম্—"

জনতা এগোচ্ছে তার দিকে।

রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে ইদ্রিস পিছু হটছে আর বলছে—"সাবধান্ এবার এগোলে গুলি ছুঁড়ব"—

প্রবীর ডাক্‌ল—"সুব্রত ভুল করিস্ না, আন্দোলনকে ভুলপথে নিয়ে যাস্ না"—

"তুই ফিরে যা প্রবীর—তুই দেশদ্রোহী—"

দেশদ্রোহী ! নিজের মতানুযায়ী, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সর্ব্বনাশ আর বিশৃঙ্খলাকে বন্ধ করার চেষ্টা করায় সে দেশদ্রোহী ! হঠাৎ চোখে জ্বালা বোধ হয় প্রবীরের, নিজেকে বড় দুর্ব্বল ও অসহায় মনে হয়, বড় ছোট মনে হয়।

কারা যেন হাসল, "কাপুরুষ ! বিশ্বাস ঘাতক—"

টলতে টলতে দূরে সরে গেল প্রবীর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল উন্মত্ত জনতার বিক্ষোভ।

"ধরো দারোগাকে"—নকুল চীৎকার করে বলল।

পিছু হট্‌তে হট্‌তে শেষবার বলল ইদ্রিস—"এবার গুলি ছুটবে—"

"হাঃ হাঃ হাঃ—কে ভয় করে ?"

ছুটে গেল সবাই।

গুড়ুম্—গুড়ুম্—

যতীন, নকুল এবং আর একজন পড়ল।

রক্ত !

হঠাৎ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল সবাই।

"বন্দে মাতরম্"—

আবার এগোল কয়েকজন।

আবার গুলি ছুটল।

লতিফ পড়ল।

আবার রক্ত।

শেষ নিঃশ্বাস ফেলে লতিফ বলল—"বন্দে মাতরম্"

নকুলও মরল।

বাকী দুজন আহত।

ইদ্রিস পালাল। কোলাহল, দৌড়াদৌড়ি—জল আর ডাক্তারের জন্য ছুটোছুটি।

"বন্দেমাতরম্—"

রক্ত পড়ল, মানুষ মরল। তবু আজ আর কেউ পালাল না; রোমাঞ্চিত, উত্তেজিত, উষ্ণ দেহ মন নিয়ে সবাই আজ বহুযুগের নিষ্ক্রিয়তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

কনস্টেবলেরা মিনতি জানাতে লাগাল—"আমাদের ছেড়ে দাও—"

"ছেড়ে দেব? হাঃ হাঃ হাঃ"—ইস্‌মাইল হাসল।

সুব্রত এগিয়ে এল, "না, ওদের ছেড়েই দাও—"

"ছেড়ে দেব?"

"দাও—কিন্তু ওদের বল যে সরকারী চাকরী ছাড়তে হবে।"

সবাই ঘাড় নাড়ল, দ্রুতকণ্ঠে কি বলল তা বোঝা গেল না।

"বল—বন্দে মাতরম্—"

শুষ্ক তালুকে লেহন করে পুলিশেরা ভগ্নকণ্ঠে বলল, "বন্দে মাতরম্"—

কিন্তু রক্ত পড়েছে, মানুষ মরেছে। তার কি হবে? কি করে শোধ নেওয়া যায়?

দশ বারজন লোককে নিয়ে রাজেন মণ্ডল মৃত ও আহতদের সরিয়ে নিয়ে গেল।

সুব্রত বলল, "ভাইসব শোন—আমরা আজ থেকে স্বাধীন। সরকারী যা কিছু এ গাঁয়ে আছে সব আজ নষ্ট করো, ভেঙ্গে ফেলো সবাই। আজ থেকে এই গ্রাম আমাদের—তোমাদের—"

"বন্দে মাতরম্—"

প্রান্তরের গান

"সাম্রাজ্যবাদ নাশ হোক্—"

"বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক্—"

"থানাতে আগুন লাগাও—"

চালের খড় টেনে নিয়ে মশাল করল কয়েকজন। তারপরে থানার গায়ে অগ্নিসংযোগ করল। খানিক পরেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, চট্‌পট্‌ শব্দ হতে লাগল, দিনের আলোয় আগুনের কুণ্ডলী সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত পাক্ খেয়ে খেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল।

সেই অগ্নিকুণ্ড দেখে সেই অগ্নিদগ্ধ থানাকে দেখে সে কি উল্লাস জনতার! সে কি উন্মত্ত হর্ষধ্বনি! সেই অগ্নিকুণ্ড যেন একটা বিরাট প্রতীক তাদের কাছে। ওটা যেন কলাতিয়া গ্রামের থানা নয়। ওটা যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ্ পুড়ছে, ভাঙ্গছে, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আর সেই ভস্ম রাশির ভিতর থেকে নূতন ভারতবর্ষ বেরিয়ে আসছে—স্বাধীন ভারতবর্ষ।

সেই অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে জনতা গাইল। যেন যজ্ঞ-কুণ্ডের সামনে মন্ত্রোচ্চারণ করছে সবাই।

জনতা গাইল, "বন্দে মাতরম্—

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং

শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

বন্দে মাতরম্।"

সমুদ্রের গম্ভীর নির্ঘোষের মত শ্রাবণমেঘের ডম্বরু-নিনাদের মত রুদ্রমধুর সে সঙ্গীত।

শুধু থানা নয়। সাব-রেজিষ্ট্রেশন আফিস, ডাকঘর আর মহিমসার মদের দোকানও পুড়েছে।

জয়ন্ত সব শুনল, ইদ্রিস্‌কে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলল, "নেভার মাইণ্ড্‌ আপনি আপনার ডিউটি করেছেন মাত্র—একা অতগুলো লোকের সঙ্গে লড়েছেন আপনি—ইউ আর এ হিরো। তারপর? কি করবেন এখন?"

"শহরে লোক পাঠাব—আর্ম্মড্‌ ফোর্স আনাতে হবে।"

"ঠিক বলেছেন—তাই করুন"—গলার স্বরটা বদ্‌লে, তরল কণ্ঠে একটু হেসে জয়ন্ত আবার বলল, "তাহলে কালকেই ওদের অ্যারেষ্ট করবেন?

"হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।"

"রাইট্‌। নিন্‌—এ সিগারেট প্লীজ্‌—"

সেখানে বসেই আসামীদের লিষ্ট্‌ করল ইদ্রিস্‌ খাঁ। কালকে ফোর্স আসার সঙ্গে সঙ্গেই সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে। ভুল করেছে সে। সেদিন সেই হাটের সভাতেই ওকাজটা শেষ করা উচিত ছিল। অবশ্য ক্ষতি হবে না, তার উন্নতির পথে এসব ঘটনা সহায়তাই করবে। হ্যাঁ অনেককে গ্রেপ্তার করতে হবে। সুব্রত, হারাধন, অবিনাশ, কার্ত্তিক, ইস্‌মাইল, রামকান্ত, বেণী, তাহের, আবদুল আর প্রবীর। দশজন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই ছিল ঐ মিছিলে।

পরদিন বিকেল নাগাদ আর্ম্মড্‌ ফোর্স এসে হাজির হল। দশজন। ঝক্‌ঝকে রাইফেল কাঁধে সারি বেঁধে এল তারা। তাদের ভারী বুটের মস্‌মস্‌ আওয়াজ গ্রামের পথে ধ্বনিত হল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত গা-ঢাকা দিয়ে ছিল ইদ্রিস্‌, এইবার সে বেরিয়ে এল।

সময় হয়েছে।

হারাধন, ইস্‌মাইল, রামকান্ত, বেণী সন্ধ্যার আগেই চারজন ধরা পড়ল।

প্রবীর পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে ছিল।

গত কল্যকার আন্দোলনকে সে দেখেছে। সারা ভারতবর্ষে ঐ একই ইতিহাস। হয়ত স্থানে স্থানে আরো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। জনসাধারণ জেগেছে। কিন্তু যদি শৃঙ্খলা থাকত, নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্রম থাকত, আর নেতারা থাকতেন! অথচ কি হল! যুক্তি আর বুদ্ধিকে সে বড় করে দেখে। মানুষের হৃদয়টা সবচেয়ে আদিম বস্তু—শুধু ওর উপর নির্ভর করলেই বড় কাজ হয় না। সে এবং তার দল তাই বুঝেছে। কিন্তু গতকাল সুব্রত তাকে দেশদ্রোহী বলেছে, আগামীকাল হয়ত সবাই বলবে। কিন্তু তাতে কি সে ভয় পাবে, পিছু হটবে? না, হোক তাই লাঞ্ছনা অপমান আর আঘাত ত' কর্ম্মীর জীবনে আসবেই। স্বাধীনতা আর সাম্যের পথে ত' ফুল থাকে না, কাঁটা থাকে। ইতিহাস পরে বিচার করবে কাদের কথা ঠিক। কিন্তু এটাও ঠিক তারা আগামী কালের সৈনিক—তাদের মতই আগামী কালের জনমত। ইতিহাস এবং পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা সেই অনিবার্য্য পরিণতিরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবু দুঃখ হয়। এক হওয়া কি যায় না? কিছুতেই কি সবাই মিলে একবার রুখে দাঁড়ানো যায় না? যায়—তাছাড়া যে উপায় নেই আর।

"প্রবীরদা"—দৌড়ে ঘরে এল মাধবী।

"এঁ্যা!" প্রবীরের চমক ভাঙ্‌ল।

"শিগ্‌গীর—শিগ্‌গীর"—হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মাধবী।

"কি হয়েছে?"

"বন্দুকধারী পুলিশ এসেছে গাঁয়ে—সবাইকে গ্রেপ্তার করছে—"

"তাতে হয়েছে কি—আর কি-ইবা করব আমি ?"

"না—না"—আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে মাধবী মাথা নাড়ল, "তোমাকে—তোমাকেও ধরতে আসছে। দোহাই তোমার আমার কথা বিশ্বাস করো তুমি, তুমি ওঠো, ওগো, তুমি ওঠো—"

প্রবীর উঠে দাঁড়াল, "পালাব ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমি ত' কিছু করিনি—আমায় ধরবে কেন ?"

"তা আমি কি করে বলব—শুনলাম বস্তীতে গিয়ে তাহের আর আবদুলকেও নাকি এইমাত্র ধরল—"

"এ্যাঁ !"

হঠাৎ সন্দেহ হল প্রবীরের। একটা ষড়যন্ত্রও আছে—সরকার পক্ষ ছাড়া অপর একটি পক্ষের।

মুহূর্ত্তে মনস্থির করে ফেলল প্রবীর। হ্যাঁ সে পালাবে, সে ধরা দেবে না। দেশময় অশান্তি এখন, অসন্তোষ আর উদ্দেশ্যহীন বিদ্রোহের আগুন সারা দেশে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। এখন যে তার অনেক কাজ। তাকে সুব্রত 'দেশদ্রোহী'—বল্লেই বা কি ? তার কাজ থেকে সে বিরত হবে কেন ?

"যাও—"

"হ্যাঁ—আমি পালাবই মাধু—"

"তবে চল——"

প্রবীর পা বাড়াল।

হঠাৎ মাধবী তার হাতে ধরে টানল, "একটা শব্দ পাচ্ছ ?"

"না তো।"

"কান পেতে শোন।

দুজনে উৎকর্ণ হল।

কিছু না।

"মাধু—"

"কি ?"

"যাই—"

মাধবী জবাব দিল না, সতৃষ্ণ-নয়নে সে প্রবীরের দিকে তাকল। কি যেন বলতে চায় সে, তার স্ফুরিত অধরের কোণে কোন কথা যেন এসে এসে ফিরে যায়।

প্রবীর তাকালে। গরীবের ঘরের সাধারণ, গ্রাম্য একটি মেয়ে। অথচ তবু তার ভালবাসা তুচ্ছ কিসে ? আজ এখন বিদায় নেবার সময় আর আত্মপ্রতারণা করে লাভ কি ? আজত' মনে প্রাণে জানে, আজত' সে স্বীকার করে যে সে মাধবীকে ভালবাসে।

একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রবীর ডাকল "মাধু, কাছে এসো—"

মাধবী সেই প্রসারিত হাতটাকে দু'হাত দিয়ে ধরল কিন্তু এগোল না। শুধু কাঁপতে লাগল সে, যেন হঠাৎ তার জ্বর এসেছে।

প্রবীর একটু অপেক্ষা করল, একপা এগিয়ে এল তারপরেই হঠাৎ অসহিষ্ণুভাবে সে মাধবীকে বুকে টেনে নিল। বহুদিনের অন্তর্দ্বন্দ্ব আজ শেষ হল। আবছা কথা আর স্পর্শ, স্মৃতি আর স্বপ্ন দিয়ে তারা পরস্পরকে যা বলতে চেয়েছিল আজ তার প্রকাশ হয়ে গেল।

সমস্ত দেহ যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। কিন্তু মাধবীর হঠাৎ লজ্জা এল কেন ? মাধবী কি আর মুখ তুলবে না ?

"মাধু—মাধবী—মুখ তোল"—ফিস্‌ফিস করে বলল প্রবীর।

মুখ তুলল মাধবী। তার দুটো পাৎলা ঠোঁট যেন দুটো প্রবাল পদ্মের পাঁপড়ি। তৃষ্ণার্ত্ত, অপেক্ষমান।

বুটের মৃদু শব্দ শোনা গেল।

মাধবী কেঁপে উঠল।

"তোমায় আমি ভালবাসি মাধবী—"

অতি সন্তর্পণে কারা যেন বাড়ীটার চারদিক ঘেরাও করেছে।

"আবার বল।" মাধবী যেন স্বপ্ন দেখছে।

"তোমায় আমি ভালবাসি।"

কিন্তু আর একজনের মুখ মনে পড়ে প্রবীরের। এক অতৃপ্তা প্রেতিনীর মুখ।

ভারী বুটের শব্দ। দরজার গোড়ায়।

"পালাও"—ছিটকে সরে দাঁড়াল মাধবী—"একি করলাম আমি! ওগো পালাও—পালাও এবার—"

দরজটা খুলে গেল। ইদ্রিস্ খাঁ ঘরে এল, পিছনে দুজন রাইফেলধারী পুলিস।

"আর পালাতে হবে না প্রবীরবাবু—আসুন।" মাধবীর দিকে একবার তীক্ষ্ণ ও কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে ইদ্রিস্ হেসে বলল, "এসেছি একটু আগেই—আপনারা ব্যস্ত ছিলেন—"

প্রবীর সেদিকে কর্ণপাত করল না, মাধবীর দিকে তাকাল, হেসে বলল, "পালানো হল না মাধবী—"

মাধবী কাঁদছে, তবু বলল, "পিসীকে খবর দেব?"

"পাগল, বুড়ী কেঁদে আকুল হবে। পিসীকে তুমি দেখো, কেমন?"

"আচ্ছা।"

"তবে আসি—"

জবাব দিল না মাধবী, ঘাড় নাড়ল।

ইদ্রিস্ খাঁ হাসছে।

"চলুন—"

ক্লক্ করে একটা শব্দ হল। হাতকড়ি।

বাইরে গেল ওরা।

মাধবীও পিছন পিছন গেল।

"মাধবী ফিরে যাও—"

"না।"

"কথা শোন—"

"না।"

"ছিঃ—"

"আমায় নিয়ে যাও"—হঠাৎ আকুলভাবে, সশব্দে কেঁদে উঠল মাধবী—"ওগো আমাকেও সঙ্গে নাও তুমি—"

"মাধবী, ছেলেমানুষী করো না। আমি তো আবার ফিরে আসবই—আমার জন্য অপেক্ষা করো। যে দিন ছাড়া পাব—সেদিন আমি তোমার কাছেই প্রথমে আসব। যাও লক্ষীটি, কথা শোন—"

"চলুন, চলুন মশাই—দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

"চলুন।

মাধবী মাথা নাড়ল, দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটকণ্ঠে বলল সে "না—তুমি যেয়ো না—যেয়ো না। এতদিন পেরেছি, আরো হয়ত পারতাম—কিন্তু আজ যে তুমি আমায় দুর্ব্বল করে দিলে। তুমি আমায় নিয়ে যাওগো, নিয়ে যাও—শুনছ? শুনছ—?"

কাঁপতে কাঁপতে মাটীর উপর বসে পড়ল মাধবী। রাত হয়েছে, অন্ধকার চারিদিকে, তারি মাঝে প্রবীর ওরা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে পুলিসদের বুটের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে শেষে একেবারেই থেমে গেল। গেল আবার মাধবী প্রবীরকে হারালো! প্রবীর আবার তার জীবনে অন্ধকার আর বিরহ দিয়ে গেল। আবার পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই দিন কাটাতে হবে—রাত কাটাতে হবে। কতদিন আর কত রাত কে জানে। হয়ত বহুদিন, হয়ত বহুবছর হয়ত বহুযুগ পরে আবার দেখা হবে। কিংবা—কিংবা হয়ত এ জীবনেই আর দেখা হবে না। কি করে বাঁচবে মাধবী? মাধবী কি বেঁচে থাকতে পারবে, এই দুঃসহ বিরহ বেদনায় কি মাধবী মরবে না?

না' মাধবী মরবে না। এত দুঃখেও সে বেঁচে থাকবে এত দুঃখেও সে আর নিরাশ হবে না। কারণ আর সন্দেহ নেই, আর ভয় নেই। কারণ আজ প্রবীর বলেছে যে সে মাধবীকে ভালবাসে। এর পর আর কি চায় মাধবী? এখন তার মরতেও ভয় নেই।

রাতারাতিই সদরে চ'লান হল তারা।

নৌকোর মধ্যে আবদুল আর তাহেরও ছিল। তারা বুঝতে পেরেছে কেন তাদের ধরা হয়েছে, কিন্তু উপায় নেই। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা নিঃশব্দে হাসল শুধু।

ভরা খালের ঘোলাটে জল অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে। শুধু নৌকোর গায়ে আছড়ে পড়ে সশব্দে আত্মপরিচয় দেয়। দুলে দুলে নৌকো চলে। কলাতিয়া পিছনে সরে যেতে থাকে।

অন্ধকারেয় মাঝে অজস্র জোনাকির স্পন্দমান জ্যোতি। অপস্রিয়মান গ্রামের দিকে চেয়ে প্রবীরের বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস ওঠে। কি অবস্থাতে

সে গ্রামকে ফেলে যাচ্ছে, দেশকে ছেড়ে যাচ্ছে! যেদিন থেকে যুদ্ধ লেগেছে সেদিন থেকেই গ্রামের অবস্থা অতি দ্রুত পরিবর্ত্তিত হয়েছে। অভাব, ভেদাভেদ হয়ত সবই ছিল কিন্তু এমন ছিল না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনও যেন বদ্‌লে গেছে। আগের মত সে যাত্রার আসর বসে না, কবির পালা গীত হয় না। আগের মত হিন্দু মুসলমানে আর কোলাকুলি নেই, পারিবারিক সম্বন্ধ নেই, ব্যক্তিগত জীবনে সুখ নেই। মনে শান্তি নেই। সারা পৃথিবীতে যুদ্ধের যে দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে তা থেকে কেউই রেহাই পাচ্ছে না, পাবে না। কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক, সাধারণ মানুষের সমাজ আর পরিবার অভাব আর প্রাচুর্য্য, সুখ আর দুঃখ, ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম, সবই রাজনৈতিক পটভূমির উপর গড়ে ওঠে। পৃথিবীর পটভূমি বদলে যাচ্ছে, ধ্বংস আর শোষণের পটভূমিতে মানুষের জীবন ভেঙ্গে যাচ্ছে, মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। আজ ভারতবর্ষেও সেই দুর্দ্দিন এসেছে। অথচ সেই দুর্দ্দিনেই প্রবীরকে আজ অন্ধকারে বসে থাকতে হবে! একি অত্যাচার!

নিরুপায় আক্রোশে প্রবীর হাত দুটোকে তুলতে গেল, তুলতে গিয়ে নিজের হাতকড়িটার দিকে নজর পড়ায় সে তিক্ত হাসি হাসল।

কিন্তু তবু ভয় নেই, দুঃখ নেই তার। চরম আর পরম মন্ত্রকে তারা জানতে পেরেছে, সিদ্ধিলাভ তাদের হবেই। অগ্নিদগ্ধ দেশের ভস্মরাশি থেকেই নবজীবনের অঙ্কুরোদ্গম হবে। মিথ্যা আশ্বাস নয়, রূপকথা আর স্বপ্ন নয়, তাদের সাধনা সার্থক হবেই।

বেঁচে থাক কোন মতে বেঁচে থাক কলাতিয়া গ্রাম। সুখের দিন এবার আসবে।

হঠাৎ গ্রামের মধ্যস্থলে, উপরকার আকাশে একটা রক্তবর্ণ আভা

দেখা গেল। আগুন লেগেছে না লাগিয়েছে? সঙ্গে সঙ্গেই গুলির আওয়াজ ভেসে এল। আবার কে মরল?

প্রবীর তাকাল। স্ফুলিঙ্গ উড়ছে। গ্রামে আগুন জ্বলছে, দেশে আগুন জ্বলেছে, সারা পৃথিবীতে আগুন জ্বলেছে! পুড়ুক। ভয় কি?

ধলেশ্বরীর ধার দিয়ে ওরা যাচ্ছিল।

সুব্রত, কার্ত্তিক আর অবিনাশ।

হঠাৎ দুটো গুলির শব্দে ওরা পিছন ফিরে তাকাল। তাকিয়ে থেমে গেল। গ্রামের মধ্যবর্ত্তী গাছপালার উপরকার আকাশ রক্তবর্ণ। কুণ্ডলায়িত অগ্নিশিখা লেলিহান হয়ে আকাশের দিকে উঠেছে।

"ও কিসের গুলি?" অবিনাশ প্রশ্ন করল।

"তা কি বোঝো না?" সুব্রত গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

"কারো বাড়ীতে আগুন লাগিয়েছে।"

"আমাদেরি কারো হবে"—

নিঃস্তব্ধতা।

"এবার কি করবেন?" কার্ত্তিক প্রশ্ন করল।

সুব্রত হাসল "যা করেছি, যা করছি। আবার কাল অন্যত্র সভা হবে, মিছিল বেরোবে, রাবণের চিতার মতই এই আন্দোলনকে অনির্বাণ রাখতে হবে। অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণুর মোহনিদ্রা এবার ভেঙেছে—দেশ জেগেছে—ও আগুন নিভলে ত' চলবে না। চল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল"—

সন্তর্পণে চলতে থাকে ওরা। ডানদিকে ধলেশ্বরী। ভাদ্রের ভরা নদী ডাক ছেড়ে ভৈরবী রাগিণী গাইছে। মাঝে মাঝে ঝুপ ঝাপ

করে মাটির চাঙর ভেঙ্গে পড়ে। তার শব্দটা ক্রমে আবার মিলিয়ে যায়। তখন শুধু ধলেশ্বরীর একটানা জলকল্লোলের শব্দটাই শোনা যায়।

এদিকে রাত হয়েছে। অন্ধকার রাত। মাথার উপরকার নক্ষত্রহীন আকাশে মেঘের সমারোহ। হয়ত অচমকা মেঘগর্জ্জন হবে, বিদ্যুৎ চমকাবে, বৃষ্টি নামবে, ঝড় উঠবে। উঠুক্ ওদের ভয় নেই।

সন্তর্পণে এগিয়ে চলল ওরা। ওদের এবার অনেক কাজ প্রতি গ্রামে, প্রতি ঘরে এগিয়ে আজ সবাইকে তাদের ডাকতে হবে। সবাইকে আজ বলতে হবে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে।

চলতে চলতে আর একবার পিছন ফিরে তাকাল তারা। কলাতিয়া গ্রাম কালো অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে, মিশে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু তবু তাকে সহজেই ঠাহর করা যায়। আগুন তখনো নেভেনি। ক্ষুধার্ত্ত অজগরের মত লকলকে শতজিহ্বা মেলে শূন্যতাকে লেহন করে, স্তম্ভের মত বিরাট অগ্নিকুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে আকাশের দিকে উঠছে। পতাকার মত উড়ছে।

আর সেই রক্তের মত লাল আগুনের আভায় আলোকিত অন্ধকার যেন কাঁপছে। ফুৎকারে ফুৎকারে অজস্র স্ফুলিঙ্গ উড়িয়ে, ছড়িয়ে সে ভয়াবহ অগ্নিরাশি যেন সোল্লাসে করতালি দিয়ে নাচছে

জ্বলুক, পুড়ুক। কি যায় আসে? ভয় কি?

সামনে এগিয়ে চল।

সমাপ্ত